"বই মনের খাদ্য। বেশি বেশি বই পড়ুন, মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

॥ দশম বার্ষিক সংকলন, তেরশ' আটাত্তর ॥

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ
মনোমোহন ঘোষ

প্রচ্ছদ
রথীন দাস

॥ আমাদের সমিতির লক্ষ্য ॥

★ ভারতের যে কোনও প্রান্তে পর্যটন ও অভিযানকে সংগঠিত করা এবং উৎসাহ দেওয়া —

★ সমিতির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্যদের মধ্যে পর্যটন সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা —

★ পর্যটন সম্বন্ধে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং সভা ও সম্মেলন আহ্বান করা —

★ সদস্যবৃন্দ, শুভাকাঙ্খী ও জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ভাব-বিনিময় ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা —

★ পর্যটনে উৎসাহদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যয়ের পর্যটক নিবাস নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা —

★ ভারতে পর্যটন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও মত বিনিময় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুশীলন করা। এ কাজে পর্যটক, বিভিন্ন ভ্রমণ-রসিক ও সম-গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা —

★ সমিতির সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করা —

★ দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থাপনা এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা —

মুখভাষণ

দীর্ঘ ন' বছরের পদচারণার শেষে দশ বছরের দুয়ার প্রান্তে এসে দাঁড়ালো—যাত্রী। তার এই প্রকাশ শুধু অবসর কাটানোর সঙ্গী হিসেবে নয়। আদিম মানুষের সেই ঘরছাড়া, বাউণ্ডুলে নেশা যা আজও সভ্য মানুষের মনে সুপ্ত হয়ে আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ অথবা বলা যায় সেই আদিম নেশাকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা ; কিন্তু এ নেশা মানুষকে কোনওদিন সর্ব্বস্বান্ত করেনি পরন্তু ভরিয়ে দিয়েছে তার নিঃস্ব মনের রিক্ত ডালিকে।

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা অথবা নদী-জপমালা-ধৃত-প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়েই ত' মানুষ নিজেকে দেখল, জানল আর বুঝলো। অসীম বিশ্ব-প্রকৃতির হাতছানি যে একবার প্রত্যক্ষ করলো, সে আর ঐ বন্ধ দুয়ারেব আড়ালে নিজেকে রাখতে পারলো না, ছুটে গেল ঐ মোহময়ীর দিকে — মনে মনে বলে উঠলো, —'আমি যাই, আমি আছি, আমি থাকবো,—তোমারই কাছে'!

আজ, বাঙালী অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের সামনে স্বল্প ব্যয়ে সুস্থ আনন্দের কথা বোধহয় বাতুলতা বলে গণ্য হবে। অনেকে হয়তো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে অসহায়তা প্রকাশ করবেন ; কিন্তু 'দিন যাপনের তরে প্রাণ ধারণের গ্লানি'র মাঝেও ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন কিছুটা যেন আশার ইঙ্গিত দিয়েছে—দিয়েছে এজন্যই বলা যায় যে, যদি আলোর ইশারা না

দিত তবে হয়তো এতদিনে সে কিশলয় থেকে মহীরূহের দিকে বেড়ে উঠতো না। অকালেই শুকিয়ে যেত রুক্ষ মাটির বুকে। আর এই এগিয়ে চলার মাঝেই তার সুলক্ষণ পরিস্ফুটিত। — বিগত দিনের প্রায় সবক'টি সুষ্ঠু ভ্রমণই তার সত্যতা বহন করে। কিন্তু এই সাফল্য শুধুমাত্র গুটিকয়েক কর্ম্মকর্তার নয় — এই সাফল্যকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন সমিতির অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী সভ্যবৃন্দ এবং তাঁদের অতিথিবর্গ। এঁরা শুধু ভ্রমণেই সন্তুষ্ট থাকেননি পাঠক্রমেরও প্রচেষ্টা আছে। তারই প্রকাশ ঘটল পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এটিও আজ ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তের পথে। সকলের দূরত্বের অসুবিধা আজও হয়তো দূর হলনা তবে নতুন পথের সন্ধান অবশ্যই চলছে। যাত্রীর এই বার্ষিক সংকলনের ডালি যাঁরা সাজালেন তাঁরা সকলেই অনামী লেখক কিন্তু ভ্রমণ-পিপাসু—পিপাসার্ত'র কাছেই পানীয়ের মূল্য থাকে, পানীয়ের মালিন্য তাকে আহত করেনা। সুতরাং এ থেকে যাঁরা কেবল সাহিত্য-রসাস্বাদন করতে চাইবেন তাঁরা হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন। তবে ভ্রমণরস যাঁরা চাইবেন তাঁরা আশাকরি তৃপ্তি বোধ করবেন। যেহেতু এ ধরনের রসের পত্রিকা বা 'ট্র্যাভেলোগ্' বাঙলা তথা ভারতে বিরল।

পরিশেষে, 'যাত্রী'র চলার পথে যাঁরা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে অন্য জগতের যাত্রী হলেন তাঁদের জন্য রইল বিষাদ-অশ্রু জড়ানো হাহাকারের এক অব্যক্ত বেদনাময় অনুভূতি—সব যাত্রার ইতি যাঁর দুয়ারে তাঁর কাছে এঁদের অমর আত্মার চিরশান্তির জন্য রইল আমাদের সম্মিলিত অশ্রুসজল-প্রার্থনা।
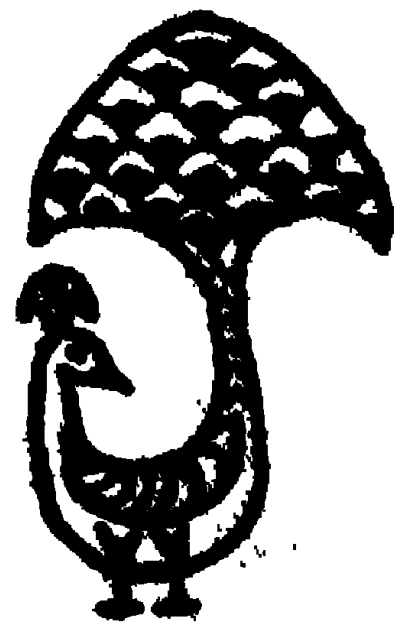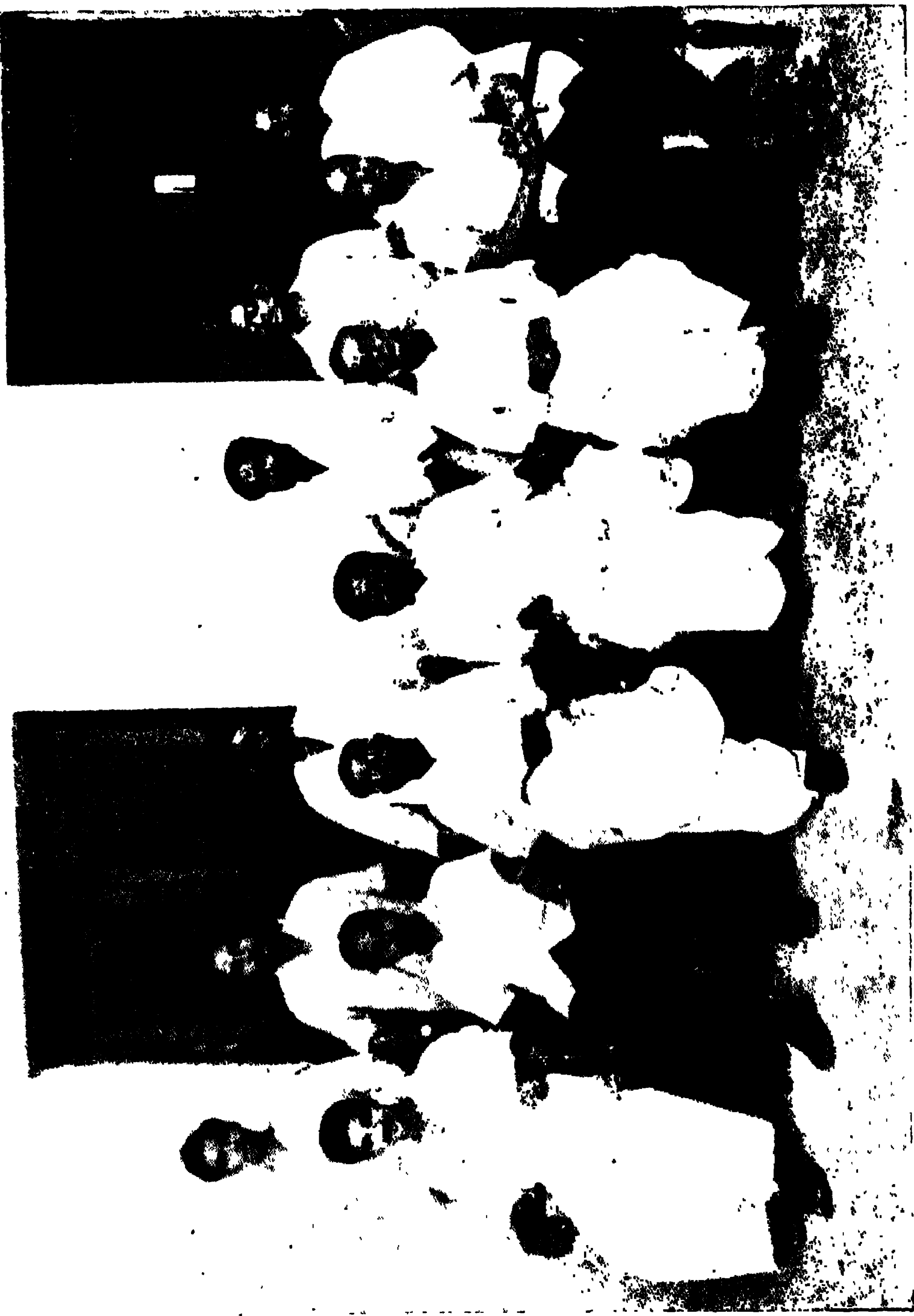
১৯৭০ — '৭১ সালের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ

বাঁ দিক থেকে (বসে) — সর্ব্বশ্রী সমরেশ চট্টোপাধ্যায় (সহঃ সম্পাদক), অনিল ঘোষাল (সম্পাদক), শম্ভুনাথ মুন্সী (সহঃ সভাপতি), তরুণ কুমার রায় (সভাপতি), হিমাংশু লাল নন্দী (সহঃ সভাপতি), শিবনাথ পাজী (কোষাধ্যক্ষ)।

বাঁ দিক থেকে (দাঁড়িয়ে) — সর্ব্বশ্রী সৌম্যেন বন্দোপাধ্যায়, দেবদাস লাহিড়ী, প্রসূন দেব, কুমার মুখোপাধ্যায়, কালীপদ দাশ, বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়।

স্তব্ধ মহাকাল
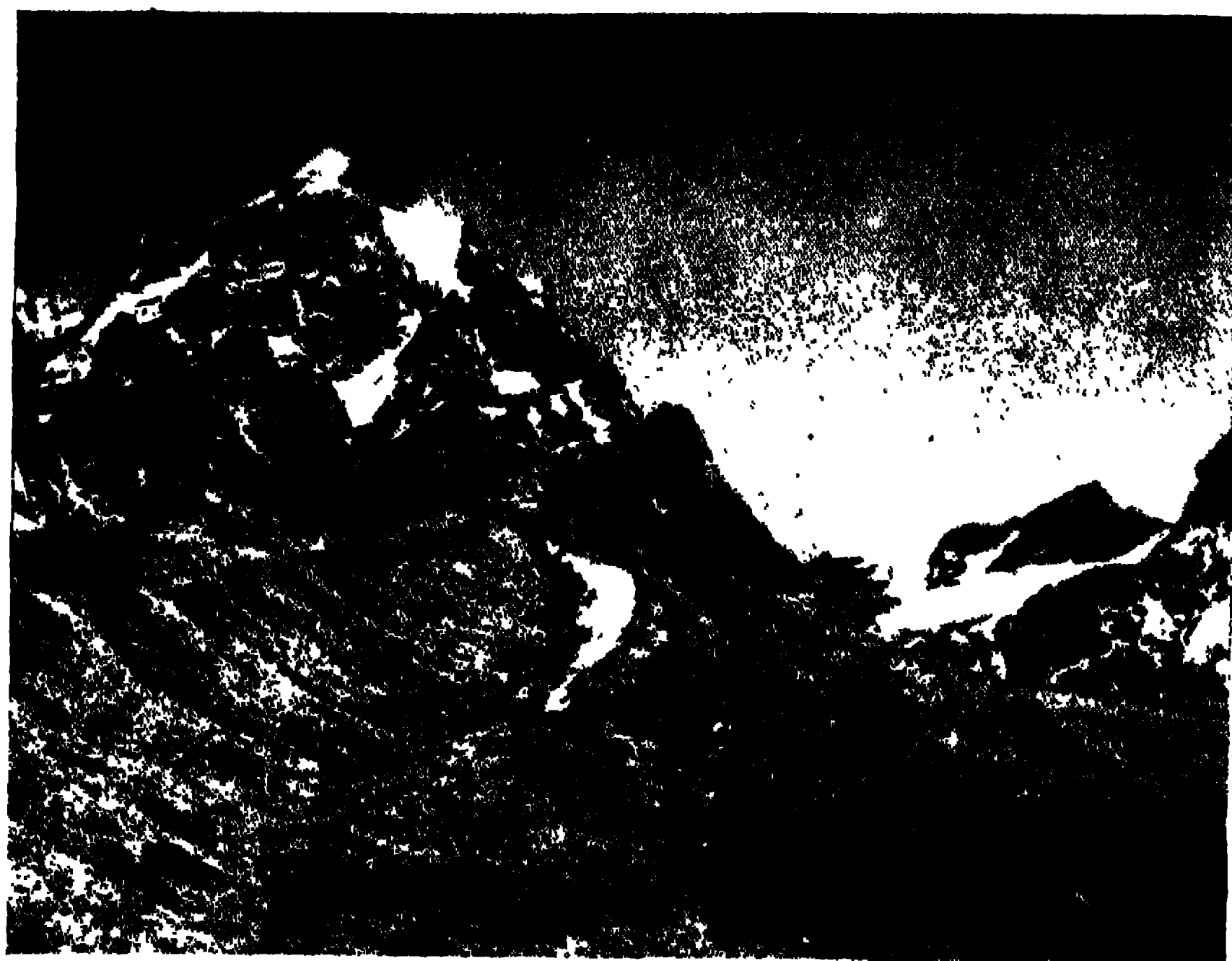
মণিমহেশ — কৈলাশ।

কমলা মুখোপাধ্যায় ॥

মাটির কবিতা

টেরাকোটা — বিষ্ণুপুর।

রাম রাঘব মৈত্র ॥

কোলহাই হিমবাহের পথে

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

আবার নিমন্ত্রণ এসেছে। হিমালয়ের নিমন্ত্রণ। রুকস্যাক কাঁধে গহন-গিরি-কন্দরের মধ্যে দিয়ে সর্পিল পথে আলোয় ভরা গিরিচূড়া উত্তরণের নিমন্ত্রণ। পথ এবার কাশ্মীর হিমালয়ের পশ্চিম লীডার উপত্যকার পথ ধরে কোলহাই হিমবাহের দিকে।

কোলহাই হিমবাহের হাঁটা পথ ধরতে গেলে প্রথমেই আমাদের শ্রীনগর থেকে বাসে চড়ে আসতে হবে লীডার উপত্যকায় ভ্রমণ-পিপাসুদের মিলনক্ষেত্র উপলাহত লীডার নদীর কুলুকুলু ধ্বনি-সুধা-মাখা পর্বতমেখলা মনোরমা পাহালগামে (৭,২০০´)। চিরহরিৎ উইলো-পপলারের আনন্দ-নিকেতনে এসে আর হিমমুকুট শৈলশ্রেণীর মোহনরূপ দর্শনে সহজেই আমরা নিজের অজান্তেই হিমবন্ত হিমালয়ের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি পশ্চিম লীডার উপত্যকার পথে। মনে-প্রাণে উপলব্ধি করি কোলহাই হিমবাহের ডাক।

ভূতাত্ত্বিকগণ বলেন প্রাগৈতিহাসিক পুরাপ্রস্তর যুগে সমগ্র কাশ্মীর হিমালয়ের তীব্র হিমপ্রবাহের ফলে বন্ধুর ভূত্বক মসৃণ আকার ধারণ করে। সমগ্র উপত্যকা বিরাট গ্রাবরেখাদ্বারা অর্দ্ধ-গোলাকৃতি আকার ধারণ করে। পরবর্তী কালে মাটি, বালি ও গণ্ডশিলার সংমিশ্রণে গ্রাবরেখাগুলি পরিপূর্ণ হয়ে বড় বড় ময়দানের আকার ধারণ করে এবং পরিশেষে সেগুলি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত হয়ে আজকের মনোরম তৃণভূমির রূপ ধারণ করেছে। এই উপত্যকা ও ময়দানগুলোর মাঝে মাঝে জলে ভরা ছোট বড় হ্রদ আর তার কোলে ঘিরে থাকা সবুজ বনাঞ্চল ও ধ্যানগম্ভীর পর্বতমালার সৌন্দর্য্য সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে করেছে নয়নাভিরাম। সুন্দরী উপত্যকার মাঝে এসে চারি-দিকের ভুবনমোহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে মুগ্ধনয়নে চেয়ে প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ দেখেছে এর মধ্যে স্বর্গের সুষমা বলেছে কাশ্মীর "ভূস্বর্গ"।

পথের বাঁদিকে লীডার বা নীলগংগার নীল জলধারার কুল-কুল ধ্বনি আর ডাইনের পাইনবনের মর্মরধ্বনি শুনতে শুনতে কোলহাই হিমবাহের পথ ধরি। সেটা ছিল আগষ্ট মাসের এক রোদ ঝলমলে সকাল। পাহালগাম থেকে কোলহাই হিমবাহের দূরত্ব ২৬ মাইল। প্রথম দিনে চলতে শুরু করি উঁচু নিচু পাইনঘেরা বনপথের মধ্যে দিয়ে। ভাল লাগছে খুব। সঙ্গীদের সঙ্গে অল্প দু' একটি কথা। মাঝে মাঝে সামনের সবুজ ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ের দিকে চাওয়া। রূপসী

॥ যাত্রী ॥ — ॥ দুই ॥

উচ্ছল নদী লিডারের চঞ্চল জলধারার কলভাষ, বিপুল-বিস্তীর্ণ পাইনবনের মৃদু মর্মরধ্বনি সর্ব্বদেহ ও মনে জাগায় এক অভিনব রোমাঞ্চের আবেশ হিল্লোল। বড় ভাল লাগে এ নম্র বনপথ চলা। সুন্দরী ধরিত্রীদেবীর একটা স্নেহসুধামাখা আবেগ-চুম্বন। ভুলিয়ে দেয় আমার নিজস্ব সত্বাকে। পৌঁছে দেয় জরা, মৃত্যু, বেদনা, ভয়, জয়োল্লাসের অতীত এক স্বপ্নলোকে।

এমনি এক আবেশের ঘোরে অতি সহজেই, বিজন পথে, পায়ে পায়ে অতিক্রম করে ফেলেছি সাত মাইল অরণ্যপথ। সামনেই এ পথের শেষ গ্রাম আরু—লীডারের কূলে সবুজ দোলনায় একটা ঘুমন্ত শিশুমুখ। দেখলেই একবার আদর করে নিতে ইচ্ছে জাগে মনে। গ্রামের শুরুতেই বিস্তৃত সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তরের মাঝে ছোট্ট ডাকবাংলোটা আমাদের ডাকছে রাতের অতিথি হবার জন্যে। প্রিয়জনের আদরের সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পালাবার পথ কোথায়?

ছবির মত সুন্দর পাহাড়ী গ্রামটি। ছ'টি দোকান আর কিছু কাঠের বাড়ী নিয়ে আরু গ্রাম। গ্রামের পুরুষ ও মেয়েরা সকলেই ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। আলু, মেজ আর ধানের চাষই প্রধান। ডাকবাংলোর সামনে এই দোকানগুলিতে চাল, ডাল, নুন, তেল, চা, মোমবাতি, গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিছু কিছু পাওয়া যায়। পুরুষদের চেহারার মধ্যে মোগল ও পাঠান রক্তের ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মেয়েরা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের।

ডাকবাংলোর সামনে সবুজ ঘাসের বুক চিরে দূরের পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে একটা পাহাড়ী নালা। ও যাবে নীচে লীডার নদীর দিকে। আত্মবিসর্জন দিতে। আরুর উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৯,০০০´ ফিট। এখানকার বাংলোটি মনে করিয়ে দেয় পিণ্ডারী হিমবাহের পথে ঢাকুরী বাংলোর কথা। তবে ঢাকুরীর তুলনায় এখানে আরও বিস্তৃত সবুজ ময়দান বেশী চমৎকার কিন্তু ঢাকুরী থেকে সামনের হিমালয়ের শুভ্র হিমমুকুটের দৃশ্য আরও নয়নাভিরাম। সেদিনের শান্ত বিকেল আর জ্যোৎস্না ভরা রাত কাটলো যে সুমধুর শান্ত পরিবেশে তা মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে অনেক অনেক দিন।

দ্বিতীয় দিনের পথ চলা আবার শুরু হোল সকাল ছ'টায়। লীডার নদীকে বাঁ দিকে রেখে কখনও নদীকে নিচে ফেলে চড়াই পথে আবার কখনও নদীকে পাশে নিয়ে উৎরাই পথে চলেছি এগিয়ে লিডারওয়াটের দিকে। পথে নেই কোন লোকালয়। মানুষের আনাগোনা তাই এ পথে দেখি না। ঝির্‌ঝির্‌ বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা ফলে পথ হয়ে গেল অসম্ভব রকমের পিচ্ছিল। ধীরে ধীরে পা ফেলতে হচ্ছে। পথের দু'ধারে প্রাণ-চঞ্চল বনানী। প্রফুল্ল সজীবতায় ঘেরা। বেলা ১২টার মধ্যেই সকলে পৌঁছে গেলাম আরু থেকে ৯ মাইল দূরে লিডারওয়াট ডাকবাংলোর (১১,০০০´ ফিট)

শান্ত কোলে। এখানেও বিস্তৃত গোলাকৃতি উপত্যকা। আজ এখানে হিমবাহ নেই কিন্তু একদিন যে এখান দিয়ে বয়ে গেছে হিমপ্রবাহ তার নিদর্শন বেশ সহজেই চোখে পড়ে। ডাকবাংলোর নীচে বাঁদিক থেকে কোলহাই নদী আর ডানদিক থেকে তারসার নদী এসে মিলে নাম নিয়েছে নীলগংগা বা লীডার নদী। আগামী কাল আমরা ডানদিকের কোলহাই নদীর ধার ধার দিয়ে এগিয়ে যাব এখান থেকে ১০ মাইল দূরে কোলহাই হিমবাহ দর্শনে। আজকের মত বিশ্রাম নেয়া গেল এ পথের শেষ ডাকবাংলোতে। শান্ত ও সবুজ নম্রতামাখা ধরিত্রীদেবীর কোলে।

আজ ১৬ই আগষ্ট ১৯৭০ সাল। ঘুম ভেঙ্গেছে খুব ভোরে। আজকে আমার বহু আকাঙ্খিত কাশ্মীর হিমালয়ের সম্রাট দীর্ঘতম এই কোলহাই হিমবাহ দর্শনের দিন। তাই ভোর থেকেই প্রাণে জেগেছে এক বিচিত্র অনুভূতির হিল্লোল। তাড়াতাড়ি আমরা দলের সকলে প্রস্তুত হয়ে পথে নামি দলপতির নির্দ্দেশে। অতি ভোরেই আজ যাত্রা শুরু করতে হবে কারণ ১০ মাইল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে হিমবাহ দর্শনান্তে আমাদের আবার ১০ মাইল ফিরতি পথে এখানেই রাতের আশ্রয় নিতে হবে। মাঝ পথে কোন আশ্রয়ের অবকাশ নেই। বাংলোর সামনে ঘন ও বিরাট সবুজ গালচের মত ময়দানকে অতিক্রম করে আমরা নেমে এলাম একেবারে কোলহাই নদীর তীরে। নদীর ধারে ধারে পথ। নদী ছিল এ দুদিন আমাদের বাঁদিকে। আর আজ সারা পথ নদী থাকবে আমাদের ডান দিকে। ধীরে ধীরে গাছপালা শেষ হয়ে আসছে। সবুজ ঘাসের রাজ্য ক্রমশ অপসৃয়মান। তৃণশূন্য নগ্ন পাহাড় গাত্রের দীর্ঘ প্রাচীর সমূহ এগিয়ে এসে আমাদের পথকে রুদ্ধ করতে চায়। তারই ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি রুক্ষ, নগ্ন পার্বত্য পথে। এখানে হিমালয়ের রূপ কঠোর-কঠিন, বিরস-শুষ্ক। আমরা পথ হারিয়ে ফেলছি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি নানা আকারের ও বর্ণের পাথরের মাঝে আমাদের আজকের পথকে। তবুও চলতে হচ্ছে কোনক্রমে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে পা ফেলে পথ চিনে চিনে। এগিয়ে চলেছি উৎসাহ ও মনোবলকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের অন্দরমহলের দিকে। বেশ কিছুটা পথ এমনি ভাবে এগিয়ে যাবার পর সমগ্র উপত্যকা হঠাৎ মোড় নিয়েছে পূর্বদিকে। এই বাঁকের কাছে আসতেই উপত্যকার শীর্ষদেশে প্রথম দর্শন পাওয়া গেল হিমবাহের। নদীর দিকে চেয়ে দেখি ময়দাগোলা জলের বর্ণ। হাত দিয়ে দেখি হিমশীতল বরফ-জল। হাতের আঙ্গুল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে অসাড়। বড় বড় পাথরের চাঙ্গর ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে কখনও তার ওপর পা রেখে রেখে এগিয়ে চলেছি আমরা হিমালয়ের রুক্ষ ও কঠিন পথে। দুদিকের পর্বতস্তূপের মধ্যে দিয়ে ক্ষীণকায়া প্রমত্তা তুষার-নদী বয়ে চলেছে। বিরাট এক প্রকৃতির রুদ্রলীলার ভেতর দিয়ে আমরাও এগিয়ে চলেছি নদীর ধারাকে লক্ষ্য করে, রহস্যময় হিমালয়ের অন্তরদেশের দিকে। আশে পাশে পাহাড়ের গা বেয়ে হিমবাহ-বিধ্বস্ত প্রস্তর সশব্দে নীচে গড়িয়ে পড়ছে আমাদের পথের এদিকে ওদিকে। মনে পড়ছে গোমুখীর পথের কথা। এও সেই হিমালয়ের আর এক দিক।

॥ যাত্রী ॥ — ॥ চার ॥

আরো কিছুটা প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর আমরা উপস্থিত হলাম বিরাট এক তুষারক্ষেত্রের মুখোমুখি। হিমবান মহাশৈল। অপরূপ তার রূপ। বেলা তখন প্রায় ১২টা হবে। একেবারে সামনে আসতেই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হোল গগনস্পর্শী কোলহাই পর্বতশৃঙ্গ (১৮০০০´ ফিট) আর তারই পাদদেশে বিস্তৃত এক তুষারক্ষেত্রের মধ্যেই বিরাট এক বরফ-গুহা আর তার ভেতর থেকে জলধারার সঙ্গে অবিরাম সশব্দে সামনে এগিয়ে আসছে বিরাট বিরাট কঠিন বরফের চাঙর। এই জলধারায় সতলঞ্জন/সপ্তশাখা বা কোলহাই নদীর উৎপত্তিস্থল। সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১৪,০০০´ উচ্চতায় এই বিরাট আকার বরফ-গুহাটি বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। আশে পাশে ছোট বড় ফাটলে ভর্ত্তি। হিমবাহ থেকে ইতঃস্তত সশব্দে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রস্তরখণ্ড, গণ্ডশিলা আর রাশি রাশি উপলখণ্ড। ফলে হিমবাহের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু ভূকম্পন অনুভব করছি। হিমবাহের আরও কাছে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ভালভাবে দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করি তুষার-গহ্বরের দিকে। গহ্বরের সামনে সৃষ্টি হয়েছে একটি অতিকায় শুভ্র বরফ-তোরণ আর তার তলা থেকেই নদীর প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছে। অপূর্ব্ব অদ্ভুত সে দৃশ্য। কোলহাই হিমবাহের সৌন্দর্য্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছি। প্রকৃতির রূপের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি সবাই। বিরাট এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চায় মন। হঠাৎ এক ঝলক কুয়াশার মধ্যে আত্মগোপন করল কোলহাই পর্বতশৃঙ্গ ও হিমবাহ। আবার পরক্ষণেই সরে গেল সেই কুয়াশা। অন্তরঙ্গের সঙ্গে যেন এক অভিনব লুকোচুরি খেলা চলছে অনাদি ও অনন্ত কাল ধরে।

হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত জমাট বরফের স্তূপ পাহাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে নিম্নমুখী হয়ে পাহাড়ের ঢাল ধরে সশব্দে নামতে গিয়ে গতিবেগকে করেছে সংযত। দূর থেকে হিমবাহকে দেখলে মনে হয় যেন সোপানশ্রেণীর ধাপ নেমেছে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে। হিমবাহের শেষ আর নদীর আরম্ভ। তাই হিমবাহের বন্ধন থেকে জলধারা পেয়েছে আজ মুক্তির সন্ধান। বিরাট ও বিস্তীর্ণ এই তুষারক্ষেত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে জাগে বিচিত্র এক অনুভূতি। মনে হয়, তুচ্ছ জীবন-মৃত্যুর পরপারে অনন্তকালের এক তুষার রাজ্যে এসে পৌঁছিয়েছি আমরা এই কটি নগণ্য মানব-শিশু। অনির্বচনীয় সে অনুভূতি।

প্রায় ৪৫ মিনিট এখানে কাটানো গেল। কোনক্রমে গ্লাভস্ থেকে হাত বার করে ছবি তুলেছি কয়েকটা। সূর্য্যালোক স্তিমিত হয়ে আসছে। এবার আমাদের রাতের আশ্রয়ের আশায় ফেরার পালা লিডারওয়াট ডাকবাংলোর দিকে। শেষবারের মত কপালে হাত দুটো তুলে বিদায় নিলাম কোলহাই হিমবাহের কাছে। আজও বেশ মনে পড়ছে তখন আমার দু-চোখ বেয়ে শুধু অঝোরে ঝরছিল আনন্দাশ্রু।

জয়দেব কেঁদুলি

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

পৌষ শেষের শীতের হাওয়া, আমলকি গাছের পাতা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। খুঁজে ফিরছিলাম সেই মনের মানুষকে যাকে খোঁজার শেষ আজও হ'ল না। অবসাদ আর বিষন্নতা মনকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। সময় কাটছিল হ্যাণ্ডবুক আর গেজেটিয়ার উল্‌টে। কি জানি হঠাৎ কেমন করে সেই পৌষ শেষের শন্‌শনে কন্‌কনে হাওয়ার মাঝেই কোন কিছু সম্বল না করে বেরিয়ে পড়লাম জয়দেবের মেলায়—সেইখানে, যেখানে—

> কত এস্‌বে সাধু,
> এস্‌বে যাদু,
> কত ছেশের এস্‌বে বাউল,
> জয়দেবের মেলাতে।

নানা পূজা পার্ব্বন কেন্দ্র করে, গ্রাম বাংলার বুকে এমন কতনা মেলা আর উৎসব চলে আসছে, সেই কোন অতীতকাল থেকে, মিলন হচ্ছে আজকের নবীনের সংগে সেই পুরান প্রাচীনের, পরিচয় গড়ে উঠছে গ্রামবাসীর সংগে শহরবাসীর, বিনিময় হচ্ছে নানা ভাব আর সংস্কৃতির।

বোলপুর থেকে বাসে পাকা পিচঢালা রাস্তা ধরে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌছে গেলাম কেঁদুলি—পোষাকী নাম যার কিন্দুবিল্ব। ছোট গ্রাম কেঁদুলি, বীরভূমের এক প্রান্তে। নির্জন শান্ত এবং নিঃস্ব। সারা বছর এদিকে কেউ বড় আসে না। ঘুমিয়ে থাকে ছোট্ট গ্রাম। কিন্তু আজ পৌষ সংক্রান্তির দিনে মকর স্নানের উৎসব লেগেছে, অজয়ের ধারে কদমখণ্ডীর ঘাটে। স্নানে এসেছে ভিন গাঁ থেকে কত মানুষ, ভীড় জমে উঠেছে, মেলাও বসেছে। বাউলও এসেছে।

এপারে বীরভূম জেলা আর ওপার বর্দ্ধমান। মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে অজয় — ঝির্‌ঝির্ জলের ধারায় সাদা চিক্‌চিক্ বালি সরিয়ে মকরের পুণ্য স্নানে নেমেছে ভিন গাঁ থেকে আসা সেই সব মানুষ, এই কদমখণ্ডীর ঘাটে। এখানেই জয়দেব কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতা রাধামাধব। কত কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার রাঙামাটিতে। জয়দেব রোজ স্নান করতে যেতেন কাটোয়ায়। মকর বাহিনী গঙ্গা একদিন দেখা দিয়ে বললেন — রোজ স্নানে যেতে

॥ যাত্রী ॥ — ॥ ছয় ॥

তোর কষ্ট হয়—এবার থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিনে আমি মিলব অজয়ে, উজানী বইব, পুণ্য হ'বে অজয়ের জল। সেই থেকে কেঁদুলি হ'য়ে উঠল মহাতীর্থ, আর জয়দেব মিশে গেলেন বাংলার মানুষের সঙ্গে।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন জয়দেব মিশ্র। হিসাব করলে দেখা যাবে সে প্রায় আটশো বছরের পিছনে ফেলে আসা দিন। নানা কাহিনীর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যদিও আজ এমন কিছু নেই যা দিয়ে কেঁদুলির সংগে জয়দেবের স্মৃতিকে আরও জোরাল করা যায়। অজয়ের ধারে রয়েছে জয়দেবের সিদ্ধিলাভের সেই জায়গা—সিদ্ধাসন মন্দির, আছে পদ্মাসন—পায়ের ছাপ। আছে মনোহর ক্ষেপার আখড়া, নাম শোনা যাবে দামোদর ব্রজবাসী, হরিকান্ত শরণ দেব, কোটর বাবার আখড়া। তবুও সবার আগে নিবিড়ভাবে কাছে টানে রাধাবিনোদের মন্দির। নবরত্ন মন্দির যা নাকি জয়দেবের বাস্তুভিটার উপর তৈরী করে দেন বর্দ্ধমানের রাণী নৈরানী দেবী ১৬১৪ শকাব্দে। পোড়ামাটির নানা কারুকার্য্য ছড়িয়ে রয়েছে মন্দিরের সামনের দেওয়ালে। এখানেই জয়দেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধামাধব, কিন্তু বৃন্দাবন যাবার সময় সংগে নিয়ে গেলেন সে বিগ্রহ। নতুন মন্দির যখন হ'ল তখন শ্যামরূপার গড় থেকে বর্দ্ধমান রাজ আনিয়ে নিলেন ওখানকার বিগ্রহ—যুগল বিগ্রহ রাধাবিনোদ।

কিন্তু আমি কোথায় পেলাম তারে—আমার সেই মনের মানুষ। সেই খুঁজতেই তো এখানে আসা। বাউলের সংগে জয়দেবের একটা যোগ আছে, সে ইতিহাস আজ থাক। কিন্তু সেই অতীত থেকে তারা আজও আসছে, কিসের টানে? শুধু কি সাধনা?

বাউল গৌরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেই গুরুবাদের কথা। গান গেয়ে সে তত্ত্বের কথা শুনিয়েছিল—

মাঝে মাঝে ডাক মিলাইয়া দেখি,
নাও আমার সহজ ধারায় চলছে নাকি।
—আর এতেও যদি বুঝতে না পার, —তবে—
ভাল করে পড়গে যা ইস্কুলে,
নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে।

হেঁসে বলেছিলাম—এ সব তোমারি থাক—চল্‌লুম আমি গানের আখড়ায়। পরপর আখড়ায় চলেছে গান। হ্যাজাক আলোর দপাদপি। বটগাছের তলায় বড় আখড়া, মাটির উপর শুধু খড় পাতা। মাথায় সামান্য চটের আস্তরণ। এক এক করে বাউলরা আসছে, গেয়ে চলেছে,

আর তার সঙ্গে নাচ। দরাজ, সুরেলা মিঠে কণ্ঠ। না শুনলে এর গভীরতা আর ব্যাপকত্তা যে কত তা বোঝা যাবে না। সংগে রয়েছেন আরও সংগতিয়ারা, ঢোল, মাদল, আর একতারা তো আছেই। মহিলারাও এতে রয়েছেন। কণ্ঠ তাদেরও সুরেলা, মিঠে। হাল ফ্যাশানের বাউলও চোখে পড়বে। পায়জামা পরা, চোখে কাল চশমা। তিন রাত ধরে চলবে এ বাউল গানের উৎসব।

আর এই উৎসব উপলক্ষ্য করে বসেছে বিরাট মেলা। মিষ্টির দোকানই বেশী। আরও টুকি-টাকি কত জিনিষ। গ্রামের লোকের আছে এতে পরম আগ্রহ। বেচা কেনা বেশ জমে উঠেছে।

তারপর ?

তারপর এ মেলা ভেঙে যাবে, শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে নিঃসঙ্গ জীর্ণ ফাটল ধরা মন্দির। সারা বছর আবার ধূধূ করবে এই উৎসব প্রাঙ্গণ, নিস্তব্ধ নির্জন। অপেক্ষা করবে আবার আগামী দিনের। ঠিক সেই নিশ্চিন্দপুরের চড়কের মেলার মতন। হরিহরের হাত ধরে আসবে অপু, অপুর হাত ধরে আসবে কাজল। আবার সেই কাজলের হাত ধরে ভবিষ্যতের আর এক কাজল। নতুন করে ভাঙা আবার নতুন করে গড়া। এই ভাঙা হাটের মেলায়, আরও কতনা আসিবে তার হিসাব নাই। কেউ কাঁদবে, আর কেউ বিকি কিনি চুকিয়ে গাঁটে কড়ি বেঁধে ঘরে ফিরে যাবে। শুধু বাঙালীর সমাজ জীবনে থাকবে তার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা।

কামরূপ কামাখ্যার দেশে

দেবু লাহিড়ী
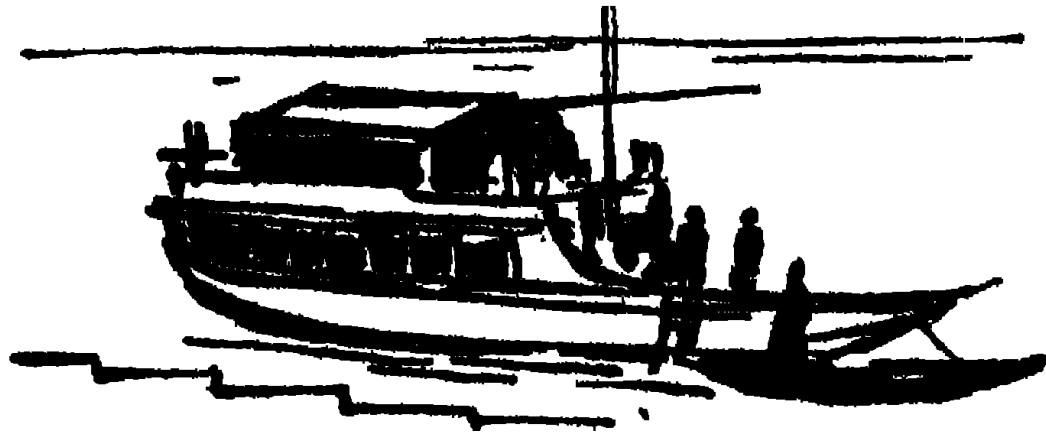
বরাহরূপী বিষ্ণুর পুত্র নরক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদের সঙ্গেই ছিল তার অভিশাপ "যতদিন দেবদ্বিজে ভক্তি মনুষ্যভাবে থাকবে ততদিনই তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে, কিন্তু যেদিন থেকে অসুর ভাবাপন্ন হবে তখনই তোমার বিনাশ হবে"।

নরকাসুরের অত্যাচারে স্বর্গের দেবতারা অস্থির হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। আবার শক্তি গর্বে গর্বিত নরকাসুর বশিষ্ঠ মুনিকে কামাখ্যা দেবী দর্শন করতে না দেওয়ায়, মুনি অভিশাপ দিলেন "তুই যতদিন বেঁচে থাকবি, ততদিন দেবী আর অধিষ্ঠান থাকবে না"।

সেই সময় মহাদেব ছিলেন কঠোর তপস্যায় মগ্ন। অথচ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। তিনজনের একজন উদাসীন হলে এই বিশ্বসংসার অচল। সতীর দেহত্যাগের পর শিব শোক-বিহ্বল। তাঁকে সংসারী করা একান্ত প্রয়োজন। গিরিরাজ-কন্যা দেবী-শ্রেষ্ঠা পার্ব্বতী ভিন্ন কেহই তাঁকে সংসারী করতে পারবে না।

কিন্তু শিবের ধ্যান ভঙ্গ করবে কে?

ব্রহ্মা শিবের ধ্যান ভাঙ্গার জন্য কামদেবকে পাঠালেন। মদন ফুলশর নিক্ষেপ করে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিনয়ন মেলে মদনকে ভস্ম করে দিলেন।

মদন ভস্মের পর তাঁর স্ত্রী রতির কাতর অনুনয় বিনয়ে শিব সন্তুষ্ট—তাঁর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু পূর্বরূপ ফিরে পেলেন না। পূর্বরূপ ফিরে পাবার জন্য মদনদম্পতি আবার শিবের তপস্যা শুরু করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ভারতবর্ষের ঈশান কোণে নীলাচল পর্বতে সতীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবয়বের মহামূল্য অংশ পড়ে রয়েছে, তা আবিষ্কার করে, সেখানে তাঁর স্তবস্তুতি ও পূজার আয়োজন কর ও দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার কর। তাহলেই পূর্বরূপ ফিরে পাবে। কামদেব মদন এখানে পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছিলেন বলে এই স্থানের নাম "কামরূপ"।

এদিকে দেবদ্বিজে ভক্তির অভাবে ও ভগবতীর ছলনায় ও কৌশলে নরকাসুর পতন ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় নি।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত বল্লেন, কি হল দাঁড়িয়ে রইলেন যে চলুন দেখিয়ে দি মন্দিরের চারিধার আর এই সময়ে পূজাটাও সেরে নিন। দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক নির্ম্মিত দেবীর ক্রীড়া পুষ্করিণী, এর নাম সৌভাগ্য কুণ্ড। সম্মুখে সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্ত্তি বিশ্বকর্মা তৈরী করেছিলেন। এখানে স্নান, তর্পন, শ্রাদ্ধ ও মুণ্ডন করা বিধেয়। এবার আসুন মন্দিরে, মন্দিরটাকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা ডিম ঠুকে বসান হয়েছে। নজরে পড়লো দ্বাদশস্তম্ভের মধ্যে হরগৌরীর ভোগমূর্ত্তি। এখানে বলে চলন্তামূর্ত্তি। পাথরের সিংহাসনে অষ্টধাতুর হরগৌরী মূর্ত্তি। বৃষভবাহন কামেশ্বর শিবের পঞ্চবক্ত্র ও দশভুজ। সিংহ-শিব-পদ্মাসনা দেবী মহামায়ার ষড়ানন্ ও দ্বাদশবাহু। পদ্ম, সিংহ ও শব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। শক্তিশালিনী মহামায়াকে তাঁরাই ধারণ করে আছেন। দেবীকে এই মূর্ত্তিতে পূজা করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করা হয়।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে এবার স্বল্পালোকিত গর্ভগৃহের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কয়েক ধাপ নামলাম। ঘন অন্ধকারে আবৃত গুহা। এর নাম মনোভব গুহা। একটা প্রদীপ জ্বলছে, পূজারী ব্রাহ্মণেরা জোরে মন্ত্র পড়ছে। কোন বিগ্রহ নেই। একটা শিলাপিঠকে মাতৃঅঙ্গ বলে, উহার অর্ধভাগ সোনার টোপরের ওপর কাপড় দিয়ে ঢাকা, তার ওপর ফুলের মালা। সামনের একটা ধার উন্মুক্ত, পাতাল থেকে জলের ধারা বয়ে চলেছে। ব্রাহ্মণ বল্লেন, ভাবছেন কি দেবীকে প্রণাম করুন। ব্রাহ্মণের কথায় যেন চোখের সামনে আবার জমাট বাঁধা অন্ধকার দেখলাম। পুরানো গল্প থেকে হঠাৎ যেন আধুনিক জীবনের অনুভূতিতে চলে এলাম। বলুন—

কামাখ্যা বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তুতে॥

স্পর্শ করুন—

মনোভব গুহামধ্যে রক্ত-পাষাণরূপিনী
তস্যাঃ স্পর্শণ মাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

চরণামৃত দিয়ে বললেন : পান করুন—

শুকদীনাঞ্চ যজ্‌জ্ঞানং যমাদিপরিশোধিতম্।
তদেব দ্রবরূপেণ কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে॥

মায়ের পূজা সারা হ'ল। ব্রাহ্মণ বল্লেন, মাতৃঅঙ্গের মহামুদ্রা যোনিপীঠ দর্শন করলেন। সতীর একান্ন পীঠের এক মহামূল্য অংশ। পাণ্ডার কথা শুনে আমার মনে পড়ল কামরূপের কথা, মদন ভস্মের কথা। দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা দেখালেন। মহাতীর্থ কামাখ্যায় মহামায়া কুমারীরূপে বিরাজিতা।

যাত্রীরা এখানে দেবীজ্ঞানে কুমারী পূজা করেন। কামাখ্যাদেবীর নিত্য পূজার উপকরণ হিসাবে ছাগ বলি দেওয়া হয়। যাত্রীদের ইচ্ছানুসারে পশুপক্ষী মায়ের নামে উৎসর্গিকৃত করা হয়, বলি দেওয়া হয় না। নিকটেই বশিষ্ঠাশ্রম। কামাখ্যা থেকে দশ মাইল দূরে। চতুর্দ্দিকে পাহাড়, নীরব, নিঃস্তব্ধ জায়গা। ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠদেব জীবনে দু'বার অভিশাপ দিয়েছিলেন, নরকাসুর ও রাজর্ষি নিমিকে। রাজর্ষি নিমির শাপে বশিষ্ঠদেব দেহহীন হন। বশিষ্ঠদেব এখানে বিষ্ণুর তপস্যা করেন। মহর্ষির তপস্যার প্রভাবে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা এই ত্রি-ধারা গঙ্গা প্রবাহিতা। এই ত্রি-ধারার সঙ্গমস্থান বশিষ্ঠ গঙ্গা নামে অভিহিত। বশিষ্ঠদেব প্রতিদিন এই ত্রি-ধারা গঙ্গাজলে ত্রি-সন্ধ্যা করতেন। পাশেই বশিষ্ঠদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে তাঁর পদচিহ্ন বিরাজিত। বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন শেষে চলে এলাম ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে।

লক্ষ্য আমার উমানন্দ ভৈরব দর্শন। নৌকা পেরিয়ে এলাম নির্জন দ্বীপে, চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের ওপর ঘনবনরাজি। সোপান বেয়ে উঠলাম ভৈরব দর্শনে। কামাখ্যা দর্শন করতে এলে উমানন্দ ভৈরব দর্শন করতে হয়। স্বয়ং শিব সতীর প্রতি অনুরাগবশত লিঙ্গ মূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন। মন্দির মধ্যে অনাদি শিবলিঙ্গ ও একটি রৌপ্য নির্ম্মিত বৃষভবাহন পঞ্চবক্ত্র দশভূজ বিশিষ্ট উমানন্দের চলন্তা প্রতিমূর্ত্তি। এবার আমার গন্তব্যস্থল ভুবনেশ্বরী দর্শন।

কামাখ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে দেবী মহাগৌরী "ভুবনেশ্বরী" মন্দির মধ্যে অবস্থিতা। এখান থেকে বিজলী বাতিতে সাজান গৌহাটি শহরের দৃশ্য অপূর্ব। এবার ফেরার পালা। কটা দিনের দৌড় ঝাঁপের কিছু দিনের মত সাঙ্গ, আবার ফিরে যেতে হবে সেই চির পরিচিত কার্য্যক্রমে, অফিসে। বিদায়ের করুণ বেদনা নিয়ে কামরূপ কামাখ্যার স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম বাস্তবে।

হিমালয়ের মিছিল

অমিয়কুমার হাটি

হিমালয়ে যাই, সেকি শুধুই তার রূপরাশি দেখতে? দেখি বটে দু'চোখ ভরে বরফ ঢাকা থরে থরে সাজানো আকাশ ছোঁয়া তুষারচূড়ার ঢেউ, শুনি বটে ছোট বড় রূপালি ঝোরা আর পাহাড়ী নদীর সুরের আলাপন, অনুভব করি বটে ভয়ানক গভীর বিশাল কুহেলী ঘেরা পাইন বনের শিহরণ! তবে এই কি সব? এখানেই কি শেষ? ভেসে ওঠে মানুষের মুখ। মিছিল। পাহাড়ের পথে পথে কত মুখের আনাগোনা, কত মনের সমারোহ। ঐ মিছিলের সব মুখ আঁকা যায়, এমন কুশলী লিপিকার যদি হতে পারতাম!

সিনেমার মত একের পর এক ছবি ভাসে।

১৬ বছর আগে। কলেজে পড়ি। মে মাস। দার্জিলিং হয়ে 'ঘুম' এসেছি। উঠেছি সবাই মিলে কাঠের এক ঘরে: ঘরের ভেতর উনুন। তখনই কী শীত!

— 'কাঠ নিয়ে এসো, পোলা, আরও কাঠ নিয়ে এসো, উনুনে দাও, আরো আগুন হোক, তাপ হোক', — সবাই মিলে ফরমাশ করি বুড়োকে। তার ছেলেবেলাতেই সে তিব্বত ছেড়ে এসেছে, ফাইফরমাস খাটার কাজই করে চলেছে আজও, এই ষাট বছর বয়সে। 'সুদিন তার আর এলো না। সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে গেল। সংসারে কেউ নেই, বৌ আর একমাত্র ছেলে পরপর নিউমোনিয়াতে মারা গেছে বছর দশেক আগে। তারপর কিছুদিন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এক বৌদ্ধমঠে গিয়েছিল, ভাল লাগেনি সেখানেও। এখন একটা ইস্কুলে জলতোলা, ফাইফরমাস খাটা এইসব কাজ করে। ফোকলা দাঁত, অমায়িক হাসি। আমরা তরুণ হলেও শীতে কাবু, সোয়েটার কম্বল জড়িয়ে, আগুন চাইছি, তাপ চাইছি। ওর গায়ে শুধু ছেঁড়া একটা জামা:

কার্সিয়াংএ রেলগাড়ী এসে দাঁড়ালে ভুটিয়া মেয়েরা ছোলা, দুধ বেচাকেনা করতে আসে। কত দাম এক পোয়া দুধ এর? চার আনা। দাওতো দুসের। নেবার পর পয়সা দিলে না গুনেই, হিসেব না করেই রেখে দিত ঝোলায়। অবাক লাগত বৈকি দেখে! এখন আর এই সরলতার দেখা মিলবে না। ঠেকে ওরাও শিখছে!

সেই লেপচা ভিখারী শিশুটি! জলজলে চোখ। ফুলের মত মুখ। চাওয়াটা যেন তার দাবি— ভয় পায়না চাইতে। কারা একে ভিখিরী করল? কী অপরাধে সে ভিখিরী? কেন আমাদের দেশে একটি লোকও ভিখিরী থাকবে?

'ভালুককুরে' সরদার। দার্জিলিং হয়ে সন্দকফু যেতে মানাইভঞ্জন এর কাছে তাঁর বাড়ী। ভালুক নাকি বনে হঠাৎ এসে গালে থাবা বসিয়ে মাংস তুলে নেয়। ছিলেন তখন একা। ভয় পাননি, অসহায় বোধ করেন নি, পিছপা হননি। শুরু হয়েছিল মানুষে ভালুকে লড়াই। হাতে ছিল টাঙি। জয়ী হয়েছিলেন সরদার — টাঙির আঘাতে খতম হয়েছিল ভালুক। সরদার এই এলাকার মানী লোক। দশজন ছেলেকে নিজের বাড়ী থেকে নিয়ে গেছেন, খুব ভাল চা তৈরী করে খাইয়েছেন।

লেখক হঠাৎই বলে ফেলেছিল, হরিণের চামড়ার তার খুব শখ। হেসেছিলেন সরদার। বলে-ছিলেন, ফেরার পথে দেখা করতে চেও বাবুর সঙ্গে।

চিত্তবাবু ছিলেন 'ভঞ্জনে'। 'ঘুম' এর আরো একটু ওপরে। বন বিভাগের লোক। বাঙালী। তবে, পাহাড়ীই হয়ে গেছেন। খাতির করেছিলেন অহেতুক। তাঁর বাড়ীতে ডিমের ডালনা, লুচি খাইয়ে দশজনকে নিয়ে ঢুকতেন পাইন-ওক-রডোডেনড্রন এর বনে, চেনাতেন পাহাড়ী গাছ-গাছড়া, লতাপাতা, শুনিয়ে অবাক করে দিতেন হরেক রকম পাহাড়ী ফুলের দেশিবিদেশি বিকট বিকট নাম। সন্দকফু থেকে ফেরার পথে দেখা মেলেনি সরদার এর। কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন শিকার করতে। হরিণের চামড়ার কথা কি তাঁর মনে আছে? না থাকারই কথা। অথচ, ভয়ানক লোভ! দেখা করতে বলেছিলেন, সবাই বলল, 'যাওনা একবার চিত্তবাবুর কাছে, যেতে দোষ কি?' না, দোষ নেই। ভয় ছিল, আবার যদি লুচি খাওয়ানোর পর বনে ঢোকেন গাছগাছড়া চেনাতে! বনপাগল মানুষ চিত্তবাবুর ঐ পাগলামীর কিছুতেই শেষ হতে চাইত না। দুরুদুরু বুকে হেঁটে হেঁটে গেলাম ঘুম থেকে ভঞ্জন একা একা। হাজির হতেই, লেখককে দেখেই মাচার ওপর থেকে চিত্তবাবু আগে নামালেন হরিণের চামড়া! সাপের মাথার মণির চেয়েও দামী তখন ওটি লেখকের কাছে! না — এবার আর বনে নিয়ে যাননি। আর আর সহপাঠীর আপশোস, তারাও কেন একটি করে হরিণের চামড়া চায়নি!

ভঞ্জনে নিজেরাই রাঁধবো ঠিক করেছি। অসিত আর নিশীথ দুজনেই খুব ভাল রাঁধতে জানে। তবে, উনুনটা ধরাতে হবেতো। ওটাতো জানা নেই! আমরা হিমশিম সকলেই। আমাদের উনুন ধরানোর বহর বাইরে থেকে দেখে দু'টি নেপালী মেয়ে হেসেই খুন। এগিয়ে এল ওরা, "দাদা দাও উনুন ধরিয়ে দি তোমাদের। সারাদিনেও অমন করলে তোমরা ও উনুন ধরাতে

পারবে না।" ছুটে গেল বনে। কাঠকুঠো আনল। দশ মিনিটে ধরালো উনুন। আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বিদায় নিল।

অবনীবাবু। আমাদের থেকে বছর চারেকের বড়। কোথায় যেন তাঁর হৃদয়ে কী এক বেদনা লুকিয়ে আছে, জানতে পারিনি, জানতে দেননি। মানাইভঞ্জনে একলা থাকেন, কাজ করেন বনবিভাগে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, শেকলবাঁধা পাগলা-ঝোরাকে। আগে এই পাগলাঝোরা আনত বান। এখন বাঁধিয়ে তার দামালপনা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিনের বেলা দেখিয়েও শখ মেটেনি অবনীবাবুর, চাঁদনীরাতে, শীতে আবার বের করে নিয়ে গেছেন সকলকে পাহাড়-বনের রাতের রূপ দেখাতে। ভালুকের ভয়ে আধমরা হয়ে দেখেছি সে রূপ। মনে গেঁথে না নিয়ে উপায় ছিলনা কোনই। আনিয়েছেন দুধ, ঘি, তৈরী করেছেন পোলাও, মুর্গীর মাংস, পায়েস। কঠিন চড়াই ভেঙে আমাদের পৌঁছে দিয়ে এসেছেন টংলুতে। টংলু মানে আগুনের পাহাড়। ১০,০০০´ ফিট উঁচু। শীত খুব বেশী। ফেরার পর আমরা তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলাম 'ঘুম' এ। সেদিন আকাশ ভাঙা বাদল। ধস নেমেছে। জীপ আসবে না, গাড়ী চলবে না। ছাতি মাথায় পায়ে হেঁটে ভিজতে ভিজতে এসেছেন ১৪ মাইল পথ—মানাই থেকে ঘুম। বিদায় নেবার সময় কেঁদেছেন আমাদের জড়িয়ে ধরে। কোথায় আছেন সেই ষোল বছর আগের অবনীবাবু? হৃদয়ে যে বেদনা বইছিলেন তিনি, লাঘব হয়েছে কি তার?

দু' টুকরো রুটি রোজগার করতে কঠিন লড়াই করে এখানকার পাহাড়ীরা—লেপচা, ভুটিয়া বা নেপালীরা। কঠিন চড়াই ভেঙে পিঠে একমণেরও বেশী বোঝা নিয়ে উঠছিল আমাদের ভুটিয়া মালবাহক, দুর্জয় সিং। আমরা ত' কিছু কিছু জিনিষ নিজেরাও বহন করলে পারতাম! আমাদের ছিল ঝাড়া হাত-পা। কারুকে বলেও কিছু লাভ হয়নি। চড়াইএ এক টুকরো খড়েরওত' ওজন আছে। ওদের কাছে বুঝি নেই। মালবাহক ওর সখের কথা জানিয়েছিল — ও একবার উড়োজাহাজে চাপতে চায়! কোনদিন কি তার সে শখ পূরণ হবে?

একটি পাহাড়ী গাঁ। পথের মাঝে পাকড়ালো অসিত এক বুড়োকে, এসো তোমার ফটো তুলি। মাথায় শোলার টুপি, হাতে রূপার বালা, কানে মাকড়ি, গায়ে ছেঁড়া কোট। ইয়া বড় এক বিড়ি টানছে। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল বীরের মত, দাঁড়াল দারুণ 'পোজ' নিয়ে। যেন কোন সিনেমার নায়ক! অসিত নাম ঠিকানা নিয়েছিল তার, পাঠিয়েও দিয়েছিল তাকে ফটোটি। পাহাড়ী ঝোরা বা ফুলের চেয়ে কম সুন্দর হয়নি ওটি।

পাহাড়ে 'ডালভাঙা' মাইল। কোন্ জায়গা কতটা দূর, শুধালেই বলে, বেশি দূরতো নেই আর, এসে পড়েছ—এগিয়ে যাও। মানাইভঞ্জনের কাছে এক জায়গায় নেপালের সীমানার ভেতর ঢুকছি। নেপালে এলেই মনে পড়ে পশুপতিনাথের কথা। পাশেই চলেছে এক নেপালী।

তাকে শুধালাম, কত দূরগো, পশুপতিনাথ? সে বলল, বেশিদূরত' নয়, দমাদম পা ফেললে পৌঁছে যাবে তাড়াতাড়িই। তাই নাকি! তাহলেত' এ সুযোগ ছাড়া ভুল হবে। চলতে থাকি। আসল ভুলটা ভাঙতে বেশি দেরি হয় না! আরো পাঁচজনকে শুধাই। দমাদম পা ফেললে পৌঁছে যেতে কম করে ৮।৯ দিন লাগবে! ফিরে চলি তাই আবার নিজেদের পথে, সন্দকফুর দিকে।

গাঁগুলো, গাঁয়ের মানুষ আর পরিবেশ দেখলে অনেক সময় মনে হয়, অতীত যুগে ঘুরছি। ১৬ বছর পরে আজও যদি যাই, দেখব সেই একই অবস্থা! কোন পরিবর্তন আসেনি হতভাগ্যদের জীবনে। গতি কম, বেগ নেই যেন। নিজেদের সুখ-দুঃখ, ভাল-খারাপও ঠিকমত বোঝে না বোধ হয়। জানেই না অনেকে, দুনিয়ার কোথায় কী ঘটছে!

নেপাল-ভারত সীমানা। এক বুড়ো নেপালী কাঠুরিয়া এক মনে কাজ করছিল। তাকে শুধানো গেল সীমানার কথা। সে হাত দেখিয়ে দিল — 'এটা নেপাল রাজার সীমানা, আর ওটা ইংরাজ বাহাদুরের সীমানা'। ইংরাজ বাহাদুর বিদায় নিয়েছে কি না নিয়েছে, তাই নিয়ে তার কিছু যায় আসে না! যে তিমিরে সে ছিল, সেই তিমিরেই আছে সে আজও।

সন্দকফু, পশ্চিম বাংলার সব থেকে উঁচু জায়গা এটি (১২,০০০´ ফিট)। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমানী শোভা অনুপম। মনে হয়, হাত বাড়িয়ে দিলেই ছোঁয়া যাবে। দেখা যায় এভারেষ্ট শিখর, নাৎসে, লোপসে। মে মাসেও সন্দকফুতে সময় সময় তুষারপাত হয়, ঝিরঝির, ঝিরঝির!

টংলু থেকে সন্দকফু ১৪ মাইল। কঠিন চড়াই। দম ফুরিয়ে যায় একেবারে। পথে পড়ে কালাপুখরী। গলা কাঠ। জল যা ছিল, বোতলে, সব শেষ। আর চলতে পারবনা বুঝি। —'জল দেবে মা, জল? জল খেতে চাই।' মুখ আঁজলা করে দেখাই। মোটা মোটা রূপার চুড়ি হাতে, পায়ে রূপার মল, কানে মাকড়ি, গলায় পুঁতির একগোছা মালা। জননীর মত করুণাধারা দুটি চোখে। বাড়ীর ভেতর বসালেন, জল আনলেন। ঘোলা, তবে, গরম করা। এঁরা বলেন 'তাতোপানি'। এ যেন অমিয় পান! 'ওকি! ওকি! উঠছ কেন বাছারা? খুব হাঁপিয়ে পড়েছ, জলত' খেলে, এবার একটু চা করি, খাও, তারপর যেয়ো— তাড়া কি? বেশি দূরতো নয় — "আলি কত তারছৈ", ঠিক পৌঁছে যাবে' —

পাহাড়ী দেশে সুপেয় চা মানেই সবলতা। মায়ের আদর মানেই সফলতা।

ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে—

হিরণ্ময় ভাদুড়ী

হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাত্র ৩ ঘণ্টার পথ ঝাড়গ্রাম। মেদিনীপুরের একটি প্রাচীন স্বাস্থ্যকর স্থান। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। সহরের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও গ্রামীন পরিবেশে একটি পরিচ্ছন্ন সহর। শাল বৃক্ষ ঘেরা সুন্দর বীথি পথ। সরল সুদীর্ঘ। অবসর যাপনের একটি প্রশস্ত স্থান। ঝাড়গ্রামকে ঘিরে আছে বহু দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক কীর্তি ও স্মৃতি। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি স্থাপত্যশিল্পের একটি নিদর্শন। এছাড়া রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত সুপ্রাচীন সাবিত্রী মন্দির, কেচোন্দার বাঁধ। তপোবন পদ্ধতিতে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ। বহু উৎসব ও পার্ব্বণে ভরা এখানকার জনজীবন। তবে বর্ত্তমানে সে উৎসব অনুষ্ঠানে কিছুটা মন্থরতা এসেছে। পৌষ পার্ব্বণে টুসু উৎসব এখনও প্রাণবন্ত।

ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে তার আশেপাশে বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। প্রথমেই যাওয়া যাক চিল্‌কিগড়। আমরা 'মা শীতলা' বাসে চড়ে চিলকিগড় রাজবাড়ির সামনে নামলাম। কখনও লাল মাটীর, কখনও পীচের রাস্তার ওপর দিয়ে ছায়াঘন শালবীথির মধ্য দিয়ে রাস্তা। পথের পাশে কোথাও উঁচু আধুনিক অট্টালিকা, কোথাও গ্রাম বাংলার মাটির বাড়ি খড় দিয়ে ঢাকা, কোথাও অশেষ প্রান্তর। চিলকিগড়ের রাজবাড়ি। একসময় হয়ত কত রোমান্সের সাক্ষী, বর্ত্তমানে খাঁ খাঁ করছে। কয়েকটা ছবি প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাসাদের সামনে বিরাট প্রাঙ্গণ। গেটে ঢুকতেই ঘণ্টাফটক। কতকগুলি পুরান মন্দির রয়েছে যার এখনও পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমে শিব মন্দির, পরে রাস মন্দির, জগন্নাথ ও কালাচাঁদের মন্দির রয়েছে। রাস মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে প্রাচীন প্রথানুযায়ী মাটির কাজ করা রয়েছে। যথা, উত্তরে গোবর্দ্ধন ধারণ ও কংসবধ মূর্তি, দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, পূর্বে কালিয়াদমন ও পশ্চিমে কৃষ্ণকলি ও গোচারণ মূর্তি। এই সমস্ত মন্দির গাত্রে শিল্পীর নাম লেখা আছে শ্রীহারাধন মিস্তৗ (মিস্ত্রী)। এই রাজবাড়ির রাজার সঙ্গে ধলভূমগড় ও ঝাড়গ্রাম রাজবংশের আত্মীয়তা আছে।

রাজবাড়ি ছাড়িয়ে আর একটু দূরে ডুলুং নদী। বর্ষাকালে ভয়ঙ্করী কিন্তু শীতে ঝর্ণার মত ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে উপলখণ্ড মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। নদীর পাশে গভীর বনানী তীরভূমি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্জন নিশব্দ। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺কনকদুর্গা মন্দির। বকুল গাছের ছায়ায় পুরান মন্দিরটি জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে নতুন মন্দির নির্মিত,

তাতে উৎকীর্ণ, শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দেও ধবল দেব। ৯ই পৌষ ১৩৪৪ সাল। পুরাতন মন্দিরটি পাঁচ চূড়াবিশিষ্ট, মাথায় কলস চক্র। মন্দিরটি দেখে ফিরে আসুন আবার রাজবাড়ির সামনে হয়ত দেখতে পাবেন 'মা শীতলা' আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। আপনি যদি চিলকিগড়ের পথে না ফিরে অন্যপথে যেতে চান ঝাড়গ্রাম, তো হেঁটে 'জাম্বনী' চলে আসুন। প্রায় দুই মাইল। সেখান থেকেও ঝাড়গ্রামের বাস পাবেন।

ঝাড়গ্রাম থেকে আপনি ঘাটশিলা যাদুগুড়া যেতে পারেন। ঝাড়গ্রামে ফেরবার পথে একবার ধলভূমগড়েও নেমে যেতে পারেন। সুন্দর লাগবে। ভোরের ট্রেনে ঘাটশিলায় চলে আসুন। সেখান থেকে P.W.D.-'র বাংলোর কাছে চলে আসুন। মালভূমির ওপর বাংলো। চারিদিকে শালবন। তার মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ। এক সময় আসবে যখন আপনি একেবারে মালভূমির চূড়ায় পৌছবেন কিন্তু একেবারে অজান্তে। ছোট নুড়ি পাথরে ভরা পথ, শালের ভেতর দিয়ে আলো আঁধারি দিয়ে। বহু দূরে টাটা যাবার সর্পিল পথরেখা দৃশ্যমান। এই পথ আততায়ীর ছুরির চেয়ে উজ্জ্বল কিন্তু স্থির নির্দিষ্ট গম্য স্থানের দিশারী। চারদিকটা একবার অবলোকন করে চলে আসুন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ৺বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। পুরাতন জীর্ণ। একটা স্মৃতি ফলক দেখতে পাবেন। আপনি যদি বাঙালী হন ও আপনার নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ওপর বিশ্বাস থাকে তা'হলে দু'দণ্ড শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন। এর অল্প দূরে প্রায় গা ঘেঁসে পাহাড়ী নদী সুবর্ণরেখা প্রবাহিত। তীরের দৃশ্য অপূর্ব। দূরে মৌভাণ্ডে রাখা মাইন্‌সের ওয়্যার রোপ্ দেখতে পাবেন। একবার একটু থেমে খোঁজ নিয়ে নিন কোথায় পঞ্চপাণ্ডব প্রস্তর স্তম্ভটি রয়েছে। হয়ত বা দেখবেন তারই ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘাটশিলায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ ও রঙ্কিনী দেবীর মন্দির দেখে পরের ট্রেনে রাখা মাইন্‌স চলে এসে যাদুগুড়াটা দেখে নিন। এখানেও রঙ্কিনী দেবীর মন্দির আছে। স্থানীয় লোকের ধারণা এটাই আদি মূর্তি।

যাদুগুড়া থেকে ফেরবার সময় ধলভূমগড়ে নেমে পড়ুন। ধলভূমগড়ের রাজবাড়ির অবস্থা খুবই শোচনীয়! এক কালের কি বিরাট ঐশ্বর্য্য, আজ ধ্বংসপ্রায়! এখানেও কতকগুলি মন্দির আছে। যথা, শিব মন্দির, দুর্গা মন্দির, ল্যাংটা কোটাল, নহবতখানা প্রভৃতি। দুর্গা মন্দিরের ভেতরের পঙ্খের কাজ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ এক সময়ে যে কতবড় শিল্পীর জন্মদাতা ছিল তা ভাবলে হতবাক হয়ে যেতে হয়! ধলভূমগড় দেখে পরবর্ত্তী ট্রেনে ঝাড়গ্রামে চলে আসুন। ষ্টেশনের পথে বাবলুর দোকানে কিছু নতুন মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন যা এখনও পাননি।

ঝাড়গ্রাম থেকে আপনি একদিন সেই রোমাঞ্চকর স্থান গোপীবল্লভপুর চলে আসুন। ঝাড়গ্রাম থেকে

'কুঠীঘাট'-এর বাসে কুঠীঘাট আসুন। সেখান থেকে সুবর্ণরেখা নদী পার হলেই প্রায় এক মাইল সুবর্ণ নদীর চড়া পাবেন। স্তূপীকৃত বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে গোপীবল্লভপুর পাবেন। সামনেই অতি প্রাচীন রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী (রসিদ মুরারী)। প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে রসিকানন্দের কুলদেবতা গোপীবল্লভ রায়ের নামানুসারে গোপীবল্লভপুর নামকরণ হয়। পূর্ব নাম ছিল কাশীপুর। এই মন্দিরটি শ্যামানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল গদি (Head Quarter) এবং শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর নামে পরিচিত। এখানে একটি বটবৃক্ষ দেখা যায় গোকর্ণ বট নামে। এই বটের পাতার বৈশিষ্ট্য যে পাতাগুলি গোরুর কানের মত। এই রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছাড়া এখানে বর্গী আমলের কাপাশিয়া মন্দির, রঙ্গিনী মন্দির, দ্বাদশলিঙ্গ রামেশ্বর মন্দির ও রোহিণীর অন্তর্গত তপোবন আছে। তবে রামেশ্বর ও তপোবন বর্তমানে বিপদসঙ্কুল।

এরপর একদিন বেলপাহাড়ী ও ঘাগড়াসিনি আসতে পারেন। ঝাড়গ্রাম থেকে প্রায় ৩০ মাইল। সোজা রাস্তা, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বাস ছুটছে। মসৃণ পথ। হঠাৎ ডাক দিয়ে শিলদাকে ছুঁয়ে আবার ছুটছে। অবশেষে বেলপাহাড়ী। দূরে ধীরে ধীরে ওঠা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের কিছু অংশ তরুচ্ছাদিত। সহজেই ওঠা যায়। অদ্ভুত আবেশে জড়ান। বেলপাহাড়ী থেকে ঘাঘড়াসিনি ৩ মাইল। কাঁচা রাস্তা। কিছুদূর যাওয়ার পর জনমানব শূন্য। শালবনের মাঝখানে অপরিসর পথ। ক্রমশ দেখবেন আপনি অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন। তা যান কিন্তু চলার নেশায় আর একটু এগোলেই হঠাৎ পৌছে যাবেন ঘাগড়া। বালি, কাঁকরের দেশে হঠাৎ এত কাল পাথর দেখলে আশ্চর্য লাগে। ছোট পাহাড়ের মত পাথরের স্তূপ। তার মাঝখান দিয়ে ঘাগড়া নদীর জল ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। পাহাড়ের ওপর উঠলে প্রকৃতির শান্ত সমাহিত রূপ চোখে পড়ে। এই নির্জ্জনতার অনুভব প্রকৃতির এক সম্পদ। আসে-পাশের গাঁয়ের লোকেরা বলে এই আমাদের ঘাগড়াসিনি। ঘাগড়াসিনি সম্পর্কেও একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। যাইহোক চলার নেশায় পথিক বেরিয়ে পড়ে পথে। বহুদূরে চলে যায়। কিন্তু এই বাংলাদেশের ভেতরে কত কি দেখবার জানবার আছে তার দিকেও একটু চোখ ফেরালে ক্ষতি কি ?
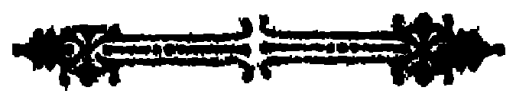
চম্বার মণিমহেশ কৈলাস

কমলা মুখোপাধ্যায়

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে একটি সুন্দর ছোট্ট রাজ্য তার অতীত গৌরব ও সৌন্দর্য্য নিয়ে বিরাজমান। তা' কয়জনাই বা জানেন? কুলু কাংড়া, বাঁশোলী, ডালহৌসির নামই পরিচিত সবার কাছে। এখানে যে একটি পর্বতশৃঙ্গ আছে যা শিবলিঙ্গেরই মত—তা' কি কেউ জানে? অতএব পাঠানকোট যাচ্ছি শুনেই সকলে ধরে নেয়—যে কাশ্মীর যাচ্ছি নিশ্চয়।

চম্বা দেশটি, তার 'গদ্দী' জনসাধারণ তার দৃশ্যাবলী—সবই সুন্দর, তার সোনালী রংএর আপেল বিখ্যাত, তার শুভ্রবর্ণ মেষ লোম মূল্যবান, সে এখন তার রুদ্ধ দুয়ার খুলে ভারতের অপরাপর দেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। নতুন জীবনকে তারা সহজেই গ্রহণ করেছে — তাদের সরল জীবনযাত্রায় আমরা অভিভূত।

ছোট্ট রাজ্য চম্বা—অধুনা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এর চারিদিকে জম্মু, লাহুল ও পাঞ্জাব। হিমালয়ের তিনটি তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী সমান্তরালভাবে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৩০/৪০ মাইল অন্তর অবস্থিত। বহির্হিমালয়ের অংশটি ধওলাধর নামে খ্যাত ও সমভূমির নিকট। দ্বিতীয় শ্রেণীটি মধ্য হিমালয়ের অংশ পীরপঞ্জিল। ও তৃতীয়টি অন্তর্হিমালয়ের অংশ এখানে এটি জাস্কর নামে বিখ্যাত, ও চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুনদের মধ্যের জলবিভাজিকা। পঙ্গী পর্বত শ্রেণী চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্যে জলবিভাজিকা। প্রধানতঃ চম্বা রাজ্যটি তিনটি নদী উপত্যকায় বিভক্ত। পাঠানকোট থেকে চম্বা পর্য্যন্ত ৭৬ মাইল বাস রাস্তা হয়েছে। সকালে রওনা হলে বিকেলের মধ্যেই পৌছানো যায়, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও পায়ে হেঁটে যেতে হোত। রাজধানী বর্ত্তমানে চম্বাতেই স্থিত, কিন্তু চম্বা যখন দুর্ভেদ্য পাহাড়ী স্বাধীন রাজ্য ছিল তখন তার রাজধানী ছিল ব্রহ্মপুর বা ভারমুরএ। সেখানে যাওয়া এখনও শক্ত ৪০০০´ ফিট থেকে ৭০০০´ ফিটে চলে গেছে পথ—এখন একটি বাস রাস্তা হয়েছে বটে খড়ামুখ পর্য্যন্ত কিন্তু তারপরে ১০/১১ মাইল হাঁটতে হয় ভারমুর পৌছাতে হলে। হয়তো বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এত দুর্গম জায়গায় রাজধানী ছিল। ৭০০০´ ফিট পর্য্যন্ত মোটামুটি ধান, ভূট্টা, গম ও বার্লি হয়ে থাকে, তার ওপরে মাত্র একটি ফসল হয়। শীতকালে হাড্‌সার (৮০০০´ ফিটের) গ্রামগুলিতেও বরফ পড়ে, আগে নাকি আরও নীচুতে পড়ত। খড়ামুখ থেকে ভারমুর যেতে খাড়া ও অসমান

নগ্ন পর্বতগাত্র দেখলে সেই কথাই মনে হয়। সেই সময়ে ওপরের গ্রামগুলি থেকে গ্রামবাসীরা নেমে আসে। আমরা এবার যখন অক্টোবরের প্রথমে যাই তখন তাড়াতাড়ি মকাই, রামদানা শুকিয়ে নিয়ে নীচে আসার তোড়জোড় চলছে।

চম্বাতে ইরাবতীর দু'টি উপনদী — বুধিল ও তুন্দা। বুধিল এসেছে মধ্য হিমালয়ের কুগতী গিরিপথের পাশ দিয়ে। হাডসারের কাছে এর সঙ্গে মিশেছে মণিমহেশ হ্রদ (১৩০০০´) থেকে বার হওয়া ছোট স্রোতস্বিনীটি। দশ মাইলেরও কিছু বেশী পথ বেয়ে এটি ইরাবতীতে এসে পড়েছে, যে সঙ্গম স্থলে খড়ামুখ স্থানটি অবস্থিত। অপর নদী তুন্দা বুধিলের নীচে দিয়ে বয়ে মিশেছে ইরাবতীর সঙ্গে।

চম্বাতে ২/৩ দিন থাকতে হয়েছিল যাবার ও আসবার পথে তাই ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়েছে। এখানে এখন স্কুল কলেজ স্থাপিত হয়েছে, চারিপাশের অঞ্চলের সঙ্গে বাস মারফৎ বেশ খানিকটা যোগাযোগও সুরু হয়েছে। রাজধানীর নামও চম্বা —। রাজধানী হওয়াতে নতুন নতুন বাড়ীঘর, ট্যুরিষ্ট অফিস, রেষ্ট হাউস তৈরী হচ্ছে যাত্রীদের খুব একটা ভীড় নেই। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ভূরি সিং মিউজিয়ামটি। রাজপুত চিত্রাবলী ও বাগোলী চিত্রাবলীর আসল চিত্রগুলি দেখবার সৌভাগ্য হল। তাছাড়া নিপুণ কাঠের কাজকরা তোরণ, সিংহাসন প্রভৃতি ত' আছেই। ভূরি সিং ১৯০৩/৪ সালে এখানে রাজত্ব করেছেন, তাঁর সময়েই Rose এবং Huchinson যে গেজেটিয়ার রচনা করেন তার মধ্যেই চম্বার পুরাণো ইতিহাস ও তার বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায়। বর্ত্তমানে এখানকার লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ, আগে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। পরে শাহিল বর্মা এই চম্বা শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেন এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাদের পরাজিত করে ও তার মেয়ে চম্পাবতীর নামে এই শহরের নামকরণ করেন। চম্বার প্রধান দেবতার মন্দির হোল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। তারপরে গৌরীশঙ্কর মন্দির, ত্রিমুখলিঙ্গ মন্দির ও লক্ষ্মীদামোদর মন্দির। এগুলি প্রায় একই জায়গায় অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের কাছে আছে বংশী গোপাল মন্দির ও শহরের বাইরে ভগবতী বজ্রেশ্বরীর মন্দির — আসলে এটি মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি।

চম্বার প্রাচীন ঐতিহ্য শৈব ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত — ভারমূর ও মণিমহেশ শিবের স্থান। এ রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম এসেছে পরবর্ত্তী কালে। যত ওপরে উঠছি ততই এই শিবের পূজারীদের সম্পর্কে এসে, এবং মন্দিরগুলি দেখে তা' উপলব্ধি করছি।

চম্বা থেকে খড়ামুখ পর্য্যন্ত কঠিন পথে বিকেলে বাস থামল—কিন্তু এখনও ওপরে যেতে হবে দশ মাইল। কোনও কুলী পাওয়া গেল না। এখানে যাত্রী বেশী আসেন না, তাই কুলীগিরিকে বৃত্তি হিসাবে কেউ গ্রহণ করেনি। সকলেই নিজেদের ক্ষেতখামার ও ভেড়ার পাল নিয়ে ব্যস্ত।

॥ যাত্রী ॥ — ॥ কুড়ি ॥

২/৩ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর রাস্তা তৈরী করছিল যে কুলির দল তাদের সর্দ্দারকে অনুনয় করাতে সে রাজী হোল একজন লোক দিতে। কিন্তু ৫টার আগে ছাড়তে পারবে না তাকে কারণ যদি P. W. D. সাহেব এসে পড়েন! তাতেই রাজী না হয়ে উপায় কি? খাবার ব্যবস্থা কিছুই নেই, একটি ছোট চায়ের দোকান ছাড়া। যাই হোক স্বর্ণাভ আপেল-এর বাক্স নীচে চালান যাচ্ছিল তার থেকেই কিছু কেনা হোল। কোথায় লাগে এর কাছে কাশ্মীরের আপেল! শেষপর্য্যন্ত স্থির হল আমি দিন থাকতেই রওনা হয়ে ওপরের পথের ও গ্রামের প্রান্তে অপেক্ষা করবো — আমার সঙ্গী পরে কুলিকে নিয়ে ও মাল নিয়ে আসবেন। ভারমুর পৌঁছতেই সূর্য্যের আলো শেষ হয়ে গেল। আমি রাত্রির বাসস্থান খোঁজ করে রাখলাম। কুগতী গিরি-পথের একজন বনবিভাগের কর্মচারী (সে স্কুল ফাইন্যাল পড়ে এই চাকরী পেয়েছে) সে খুব সাহায্য করল। তহশীলদারের বাড়ীতে নিয়ে গেল, তহশীলদার ছিলেন না, বাইরে Tourএ ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধা মা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না — অনেক কষ্টে পরে আসবো বলে নীচে নেমে আসলাম। কারণ তহশীলদারের বাড়ীটা বেশ কিছু উঁচুতে। গ্রামে ঢুকতেই বহু মন্দির চোখে পড়ে, তার সামনেই চায়ের দোকান। মন্দিরগুলির মধ্যে মণিমহেশ মন্দির, লক্ষ্মণাবতী (দুর্গা), নৃসিংহদেব ও গণেশের অষ্টধাতুর মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের ওপরের কাঠের কারুকার্য্য-গুলি সত্যিই দর্শনীয়। বরফে ঢেকে যায় বলে মণিমহেশ পর্বতের নীচে কোনো মন্দির নেই।

ভারমুর বা ব্রহ্মপুর ছিল চম্বা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। ব্রহ্মাণী দেবীর বাসস্থান পাহাড়ের ওপর; সেখানে মন্দির আছে। তার পাশ দিয়ে যে জলস্রোত বইছে, তা থেকেই শহরের পাণীয় জল আসে। এর নাম চৌরাশী ক্ষেত্রও বটে, চুরাশী জন সিদ্ধপুরুষ এখানে এসে মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। অত মন্দির আছে কিনা জানিনা তবে একই প্রাঙ্গণে বহু ছোট বড় মন্দির আছে। সামনেই একজন পরোপকারী সাধু নাগাবাবার মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর তিনিও দেবতা বলে পূজা পাচ্ছেন এখানে। আঙ্গিনার অন্যদিকে মাধ্যমিক স্কুলটি অবস্থিত। আমাদের সঙ্গে একই বাসে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা চম্বা থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলে ফিরলো। মন্দিরের স্থানীয় পূজারী থেকে শিক্ষক সকলেই অভয় দিয়ে জানাল আশ্রয়ের অভাব হবে না। মন্দিরের যাত্রীশালা ও স্কুলতো আছেই এক জায়গায় আস্তানা জুটে যাবে। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, দোকান যা দু' একটি ছিল, তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পাহাড়ীরা সকাল সকাল শুতে যায়, কোথায় থাকি! নীচে পথের দিকে চেয়ে বসে আছি কখন কুলী সহ আমার সঙ্গী আসবেন! হয়তো কুলী শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকার করেছে আসতে, তবে কী হবে! মনে মনে ঠিক করে ফেলি তাহলে ঐ যে মাতৃসমাকে (তহশীলদারের মা) দেখেছি, তাঁর কাছেই রাত্রে থাকবো।

অবশেষে প্রায় রাত ৮টার সময় আমার সঙ্গী এলেন ক্লান্ত হয়ে। কুলী তার মজুরী নিয়ে

তখন সেই সর্পিল hairpin bend রাস্তা ধরে নেমে গেল কারণ, তাকে ভোরেই কাজে লাগতে হবে। আমরাও মনোমত আস্তানা না পেয়ে তহশীলদারের গৃহ অভিমুখেই গেলাম অনেক সঙ্কোচ নিয়ে। কিন্তু কি রাজকীয় অভ্যর্থনা যে পেলাম। গৃহকর্ত্তা নেই, কিন্তু তাঁর মা তাঁর নিজের ঘরটিতে আমাদের থাকতে বললেন ও তখুনি চাকরকে ডেকে খাবার তৈরী করতে আদেশ দিলেন। তহশীলদার হলেন প্রায় 2nd class magistrateএর সমান ক্ষমতা সম্পন্ন। তিনি ১৫/২০ দিন তাঁর তহশীল পরিদর্শন করেন—তবে তা করতে হয় পায়ে হেঁটে। কারণ ওপরের দিকের পথ এরকম খাড়া যে ঘোড়া পর্য্যন্ত চলে না। অবশ্য এই সরকারী কর্মচারীরা সবাই প্রায় হিমাচল প্রদেশের লোক এবং স্বভাবতই স্বাস্থ্যবান। বৃদ্ধার ঘরে অপর শয্যায় আমি রাত্রে শুলাম, অন্য একটি ঘরে আমার সঙ্গী রইলেন। জিনিষ পত্র গুছানোর ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধার সাংসারিক সুখ-দুঃখের কাহিনীও শুনতে লাগলাম। একটি ১২/১৩ বছরের নাতনী তাঁর কাছে থেকে পড়ে। খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করেন হয়তো, তাই লোকজন দেখলে তাঁর এই সাদর অভ্যর্থনা ; কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত, অন্যদেশের লোককে একেবারে আত্মীয়ের মত গৃহে স্থান দেওয়া, এক অভাবনীয় ব্যাপার ! আমরা কি পারতাম ! পরদিন সকালে চৌরাশী ক্ষেত্রে বা মন্দির প্রাঙ্গনে নেমে কুলীর খোঁজ হোল। সেই বনরক্ষক এবারও আমাদের সাহায্য করলেন। বাজারে কুলীদের থেকে একজনকে নিয়ে আসলেন ও পারিশ্রমিকও ঠিক করে দিলেন। স্থির হোল এখান থেকে শেষ গ্রাম হাডসারে গিয়ে পূজারীদের (গদ্দীদের) গ্রাম থেকে আর একজন লোক নিয়ে মণিমহেশ যাওয়া হবে। এ পথে ভীড় নেই, আগেই বলেছি—সুতরাং এখানকার কুলীদের নির্দ্দিষ্ট কোনও রেট নেই। বরফ পড়ে যাচ্ছে বলে কেউই এখন মণিমহেশ যায় না। সেখানে একটি চটি বা আশ্রয় থাকলেও শীতের জন্য রাত্রে থাকা যাবে না কারণ কাঠ কাছাকাছি পাওয়া যায় না। অসময় বলে ১০৲ প্রতিদিন হিসাবে রেট ঠিক হোল। আমরা পরদিন ৮/৯ মাইল হেঁটে ৭৮০০´ ফিট উঁচু হাডসার গ্রামে পৌছলাম ও একজন গদ্দী বা শিবের পূজারীর বাড়ীতেই আশ্রয় নিলাম। সে অনায়াসে একটা ঘর ছেড়ে দিল। রান্নাঘরে রান্না করতে দিল কোনও ভাড়া ইত্যাদি দাবী করল না। মুক্তিনাথের পথে আকালী গ্রামগুলির সঙ্গে কত তফাৎ এই সরল গদ্দীদের, আকালীরা প্রত্যেকটি জিনিষ পয়সা ছাড়া দেয় না, এতটা ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন তারা।

শীত এসে পড়ছে বলে অনেক রাত অবধি ফসল মাড়িয়ে শুকিয়ে তোলার কাজ চলছে দ্রুত-গতিতে। পথের ধারে সমস্ত বাড়ীগুলির ছাদে 'মকাই' শুকোচ্ছে, শীতের সঞ্চয়। এরা কিছু-দিনের মধ্যেই নেমে যাবে। সেইদিন মাত্র ৯/১০ মাইল যেতে হবে বলে দু' পাশে ভাল করে দেখে শুনে চললাম। ভারমুর থেকে পথের দু' পাশে উঁচু পর্বতে ফসলের ক্ষেতের ধাপ, সঙ্গে বাসগৃহস্থিত। কয়েক মাইল আসার পর একজায়গায় পথটি দু' ভাগ হয়ে একটি রাস্তা সামনের

দিকে ওপরে চলে গেছে। সেইখানেও গ্রাম আছে. নাংগ্রি (১৩,০০০´) হয়ে চোবিয়া গিরিপথ পার হয়ে (১৬,৭০০´) বুগ্‌গী হয়ে বারাখাণ্ডা শৃঙ্গ ও গিরিপথ পার হয়ে নেমে ২৩ মাইল বনের মধ্যে দিয়ে গেলে বিখ্যাত ত্রিলোকনাথের মন্দির। যেতে কি পারবো এবার! যাহোক পথে বহু গদ্দী মেয়েদের সঙ্গে দেখা হোল, বহু গদ্দী. মেষপালক ও গ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোল। ভারমূরকে গদ্দেরাণও বলা হয়—অর্থাৎ গদ্দীদের স্থান। গদ্দীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, থাকু, রাথী সব জাতই আছে। ভারমূরের আশেপাশেই এরা বেশী থাকে, তবে অতীতকালে এরা এসেছে বাইরের রাজ্যগুলি পাঞ্জাব, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে। পূজারীরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কোমরে ৪০ হাত মেষলোমের বন্ধনী বা ডোরা পরে। ঐটাই প্রমাণ করে এরা শিবের পূজারী। সকলেই দেখতে খুব সুন্দর গৌরবর্ণ, দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান। বেশীর ভাগ লোকই মেষপালন করে, ধবধবে সাদা মেষ, গ্রামবাসীদের গায়ের কোট, মাথার টুপী সেগুলিও শুভ্রবর্ণের। প্রথম মেষ-শাবকটি মানৎ করে রাখে ও কোনও দেবমন্দিরে আবার বলি দেয়। ভারমূর স্থাপিত হয় ৫৫০ খৃষ্টাব্দে। বিখ্যাত মেরুবর্মার সময়ই (৬৮০ খৃঃ) ভারমূরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। অজেয় বর্মার (এর পরের রাজা) সময়ই গদ্দীরা এখানে এসেছে। বর্মণ রাজবংশ এসেছেন কুমায়ুনের তালেশ্বর থেকে। এই রাজ্য ও রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস আছে যার ভিত্তি হোল শিলালিপিগুলি। এই Inscriptionগুলি পুরানো মন্দিরগুলিতে আছে। চম্বার চামুণ্ডা মন্দিরে শক্তি পূজার প্রভাব দেখা যায়। গদ্দীরা সবাই শিবের পূজারী বলে নিজেরাও ৪০ হাত ডোরা পরে। হাডসার হোল পূজারীদের শেষ গ্রাম। এখানে একটি শিবের মন্দির আছে।

পরদিন ভোরে উঠে. ধান্‌চো অভিমুখে রওনা হলাম। প্রায় দশ মাইল পথ! এর পরে আর গ্রাম নেই. এখান থেকে আলু, টমাটো নিলাম। বোঝা কমাবার জন্য অনেক জিনিষ ছেড়ে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিই শুধু নিয়ে রওনা হলাম। এখানকার উচ্চতা ৯০০০´; ঘর বাড়ী নেই. আছে একটি আশ্রয়স্থল. যার আবার দু'দিক খোলা অর্থাৎ বৃষ্টি, হাওয়া ঢোকবার প্রচুর সুবিধা আছে। ধান্‌চোর উচ্চতা ৯০০০´ ফিট মাত্র হলে কী হয়—হাডসার থেকে আসার রাস্তা খুবই খারাপ। কোন কোন জায়গায় পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কোথাও ৬ - ১২ ইঞ্চি সরু পথ। এগুলি আসলে মেষপালকদের যাতায়াতের পথ, পাথর ভেঙ্গে কোনও রাস্তা তৈরী হয়নি। আমাদের সঙ্গে বরাবরের সাথী ছিল ইরাবতী নদী। মেষপালকদের দু' একজনকে চোখে পড়ছে, যত ওপরে উঠছি, ততই চোবিয়া গিরিপথ ও বারাখাণ্ডা শৃঙ্গ (১৭,০০০´) দৃশ্যমান হচ্ছে। এসব পার হয়ে কুগতী গিরিপথ-এর রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুরু হয়েছে দেখলাম। এখান থেকে বনপথে স্পিতির রাজধানী কেইলঙ্-এ যাওয়া যায়। এ গিরিপথটিও ১৬,০০০´ ফিট উঁচু।

ধান্‌চোর কাছে মণিমহেশ থেকে আগতা নালাটি বুধিলের সঙ্গে মেলবার আগে বেশ একটি সুন্দর তবে ছোটখাট জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। সেই নদীস্রোত পার হয়ে আবার উঠতে হোল — এবং আবার কিছুটা নেমে ধান্‌চোর আশ্রয়স্থলে পৌছলাম। তখনই শীত সুরু হয়ে গেছে. তাড়াতাড়ি আগুন জ্বেলে গরম পাণীয় খেয়ে রাতের খাবার তৈরী করা হোল; প্লাস্টিক শীটগুলি দিয়ে চারিদিকের ফাঁকগুলিতে পর্দা দেওয়া হল। জল অনেক নীচে. কুলিরা বুদ্ধি করে একটা বড় প্লাস্টিকের থলিতে জল ভরে রেখে দিল। ঠিক হোল সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হবে, আমি সারারাত কাঠ ঠেলে দেব বলে আগুনের পাশেই শুলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখি রাত দু'টো বেজে গেছে, আগুন নিভে গেছে — চারিদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া, কনকনে শীত। কুলিরা আবার আগুন ধরালো। এই ভাবে ভোর অবধি কাটলো। ঘুম না হওয়াতে শরীর বেশ শ্রান্ত অথচ পরের দিন মণিমহেশের চড়াই উঠতে হবে ও ফিরতে হবে। অন্তত ১০ মাইল পথ হাঁটতে হবে সম্ভব হলে ঐ দিনই হাডসারে ফিরতে হবে কারণ ধান্‌চোতে খুবই ঠাণ্ডা —। পরদিন শুধু পূজারী ও সামান্য কিছু জিনিষ নিয়ে মণিমহেশের পথে যাত্রা সুরু করতে হল। মণিমহেশ প্রায় ১৪০০০´ ফিট উঁচু, সমস্ত পথটাই চড়াই আর এখানে P.W.D.'র লোকে কোনও পথ তৈরী করেনি — মেষপালকরা যে পথে গিয়েছে, সেগুলিই হোল পথ, তবে শ্রাবণ মাসে অষ্টমী শুক্লা তিথিতে মণিমহেশে মেলা হয় — তখন বাইরে থেকে বহু তীর্থযাত্রী যান। শীতকালে এসব জায়গা তুষারাবৃত থাকে তাই পাথরগুলি খটখটে। এক এক জায়গায় পথ এত সরু যে কোনমতে এক পা রাখা যায়। এইভাবে সংকীর্ণ পথে চড়াই উঠে একটা উন্মুক্ত উপত্যকার মাথায় এসে দাঁড়ালাম। সেটার সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি উপত্যকা দিয়ে আবার তৃণযুক্ত পাহাড়ের মাথায় চড়তে সুরু করলাম। মাঝে একজায়গায় একটি অগভীর 'জলস্রোত' — কুলীরা জানাল ওটি 'গৌরীকুণ্ড' এখানে একটি পাথর সিঁদুর লেপা আছে। ভেবেছিলাম, ৫ মাইল পথ যেতে কতই বা সময় লাগবে? অবশেষে বেলা ১২টার সময় একটি hump বা কুঁজের নীচে এসে দাঁড়ালাম। এই hump পার হয়ে নীচে নামতে হবে তবেই নাকি মণিমহেশ হ্রদ ও শিবের পূজাস্থান দেখা যাবে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই মণিমহেশ পর্বত-শাখার মহিমময় কৈলাস শৃঙ্গ (১৮৫৬৪´) দেখা যাচ্ছিল। শিবের স্থান তাই কৈলাস নাম! আবার অমরনাথ থেকে শিব নাকি এখানে পালিয়ে এসেছিলেন এরকম কিংবদন্তী ও আরও বহুরকম কিংবদন্তী আছে। hump-এর ওপর রাত্রে বরফ পড়েছিল—এখন গলে গেছে, তাই দ্রুত চলা সম্ভব হচ্ছেনা। যাহোক এবারে নীচে নামার পালা। মণিমহেশের হ্রদটির নামও ডাল হ্রদ। একটি লম্বাটে ধরণের অগভীর জলাশয়। চতুর্দ্দিকের পাহাড় থেকে যে বরফ গলা জল এসে পড়ে তাই থেকে এই হ্রদের সৃষ্টি। জলাশয়ের অপর প্রান্তে ত্রিশূল গ্রথিত ও কয়েকটী পতাকা উড়ছে। একটি চতুর্মুখ প্রস্তর মূর্ত্তি, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আর একজন দেবতার মুখ — স্বচ্ছ

জলে বরফমণ্ডিত পর্বতশ্রেণীতে ছায়া পড়েছে। আমরা জলাশয় বা হ্রদটির পাশে বসে বিশ্রাম নিয়ে চারিপাশে পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন দিক দেখতে পেলাম। আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে বসেছিলাম সেখান থেকে ২/৩ হাজার ফিট উঠলেই মনে হচ্ছে শৃঙ্গে পৌছানো যায়, এত কাছে মনে হয়। আমার সঙ্গীর পর্বতারোহণে শিক্ষা আছে, তিনি তো খুব উৎসুক। আমাদের পিছনে, মহিমময় কৈলাস শৃঙ্গ সূর্য্যকিরণে দীপ্তিমান। পর্বতের গায়ে বরফের আস্তরণ, ফাটল সব দেখা যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে, খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালে জাপানী ও ভারতীয় (গুজরাতী) মহিলাদের একটি যৌথ দল কুগতী গিরিপথ দিয়ে কৈলাস শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

এদিকে দু'টো বেজে গেছে — ফেরার তাড়া; ভাবি, উৎরাই পথ বেয়ে আসতে আর কতই বা সময় লাগবে! কিন্তু তৃণময় উপত্যকাগুলি পার হয়ে যখন আবার নগ্ন প্রস্তরপথে পৌঁছলাম, তখন বুঝি,— নামাটাও কি প্রাণান্তকর! ক্লান্তিতে ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিনা, সঙ্কীর্ণ পথে একটু এদিক ওদিক হলেই নীচে পড়ে যাব! আমাদের গদ্দী পূজারী আমার গামছা নিয়ে এক বোঝা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে ফেলল — কারণ, সেদিন রাত্রেও ত' ধান্‌চোতে থাকতে হবে। — অতি কষ্টে বিকেল পাঁচটায় সেই ধান্‌চোতে এসে পৌঁছলাম। অপর কুলী রান্না করে বসে রয়েছে — ভাবছে, আজ রাত্রে আর শীতের কামড় খেতে হবে না। কিন্তু সেরাত্রে ত' আর দশ মাইল পথ যাওয়া যায় না, অতএব রাত্রে সেখানেই রইলাম। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে বেলা ১০টায় হাডসারে পৌঁছে ভোজনপর্ব সেরে সেদিনই রওনা দিয়ে ভারমূরে পৌঁছলাম। আমাদের পূজারী গদ্দী রয়ে গেল তার আপন গ্রামে। পৃথ্বী সিং ভারমূর পর্য্যন্ত এসে টাকা নিয়ে খুসী হয়ে বাড়ী ফিরে গেল। এবার নেমে তহশীলদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সাদরে আহ্বান করলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। খুব যত্ন করে খাওয়ালেন এবং আরও একদিন থাকতে বললেন। এত দূরে একজন এরকম সজ্জন ব্যক্তিকে দেখব তা' কল্পনাই করিনি। তাঁর কাছেই চম্বার গেজেটিয়ার দেখলাম ও মোটামুটি এর একটা পরিচয় পেলাম। ভোরে উঠে আবার যাত্রা করতে হবে চম্বার দিকে।

জীবনের এই অপরিসর পান্থশালার দ্বারে কত যাত্রী এল, কত মুসাফির চলে গেল। কাউকে ভুলিনি। ওরাই আমার জীবনে নতুন করে এনে দিয়েছে পথাতিক্রমণের প্রেরণা, জেলে দিয়েছে নতুন আলোর মশাল। —

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

দিনান্ত

গঙ্গাতীরে সূর্য্যাস্ত।

ত্রিদিব ঘোষ ॥
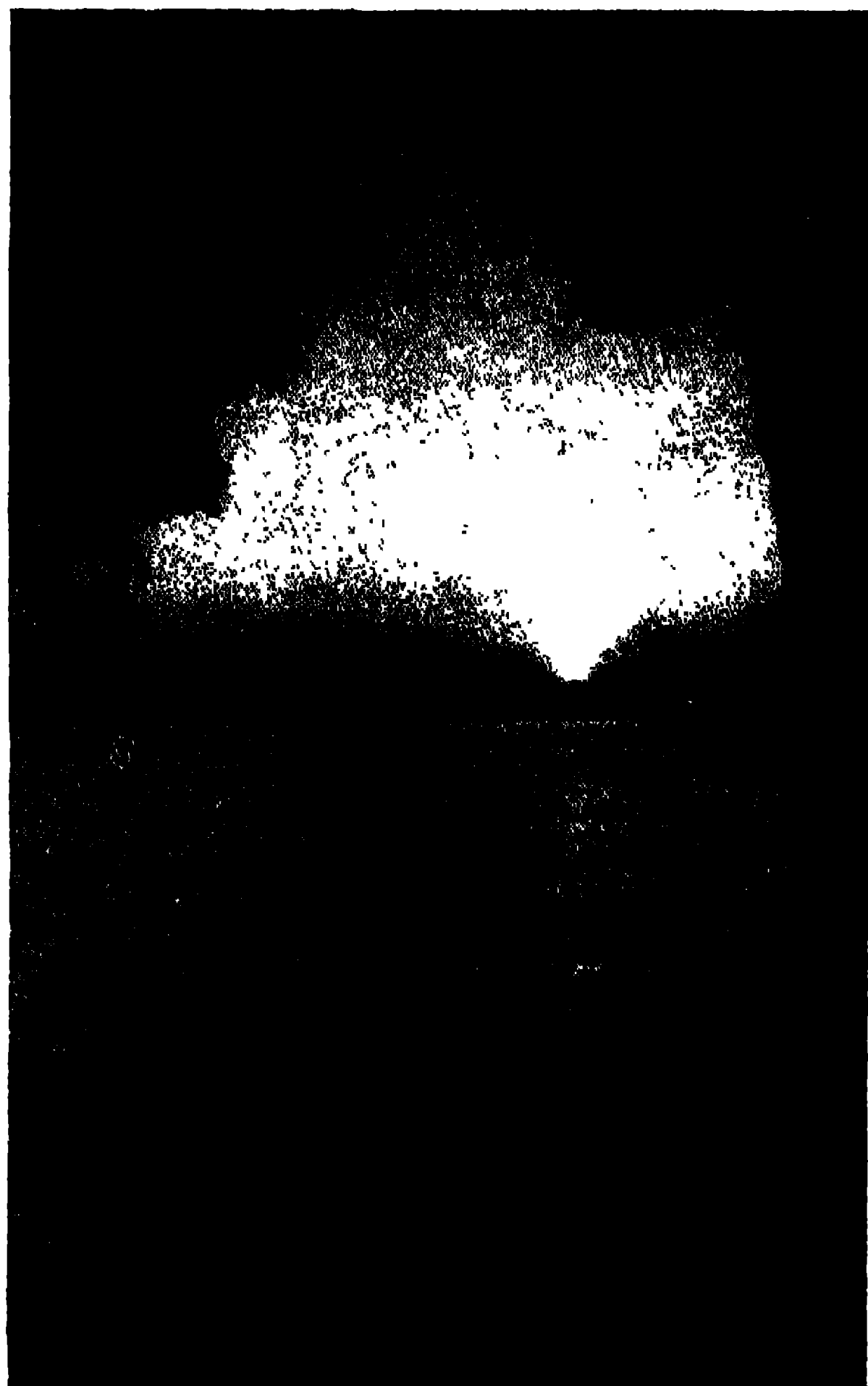
তটিনীর ইতিহাস —শিপ্রা নদীতীর, উজ্জয়িনী

অজয় চক্রবর্ত্তী ॥
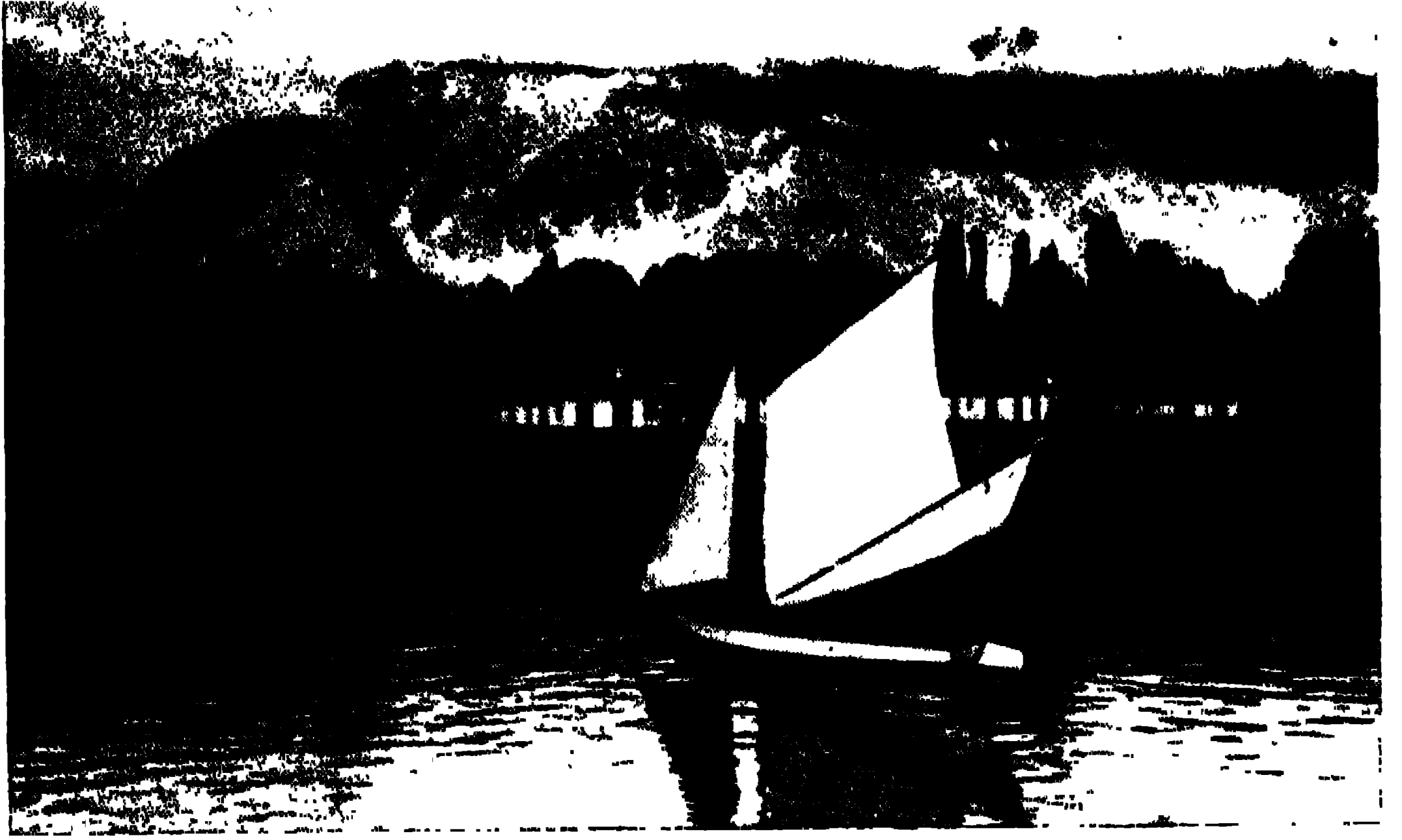
জলছবি—নাগিন লেক, কাশ্মীর দেবকুমার বন্দোপাধ্যায় ॥

মৌন কপাট

বুলন্দ্ দরওয়াজা — ফতেপুর-সিক্রি।

অনুরূপ চট্টোপাধ্যায় ॥

মোটর সাইকেলে পুরী

সনৎকুমার ঘোষ

ভট্ ভট্ ভট্ ভট্............

তিনখানা মোটর বাইক আর দু'খানা স্কুটার ২১শে ফেব্রুয়ারী '৭১ রবিবার খুব ভোরে উত্তরপাড়া ত্যাগ করল। যাত্রী ন'জন।

উত্তরপাড়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের বিপরীত দিকে একটি গাছতলায় আমাদের এই মোটর সাইকেলের ক্লাব। চাঁদা দিতে হয় না, আস্তানা ভাড়ারও বালাই নেই। একদিন স্কুটারাধিপতি প্রস্তাবটা তুললেন, রয়েল এনফিল্ড আমি তা' সমর্থন করলাম। রাজদূতকে অধিনায়ক করা হল এই সফরের। তিনি অল্প সময়েই খুব পরিশ্রম করে আনুষঙ্গিক সব রকম ব্যবস্থা করলেন।

যুদ্ধে যাবার আগে শিবিরে যেমন সাজসাজ রব পড়ে, তেমনি আমার বাড়ীতেও আজ শেষ রাতে পড়েছিল। ভ্রমণের পক্ষে প্যাণ্ট উপযোগী; আমার প্যাণ্টের পাট নেই বলে একজনের কাছে ধার করেছিলাম। সেই প্যাণ্টের ওপর আমার লম্বা ঝুলের একখানা ফুলহাতা সার্ট চড়িয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছি এমন সময় বোনেরা হেসে অস্থির। হকচকিয়ে গেলাম! তারা কলকণ্ঠে বলে উঠল : ওকি, সার্টের ওপর প্যাণ্ট না পরে প্যাণ্টের ওপর সার্ট!

আমি বললাম : তোদের বাইরে যাওয়ার অভ্যেস নেই তো, তাই জানিস না সার্টের পকেট দুটো কত কাজে আসে।

ভট্ ভট্ ভট্ ভট্

পাড়ার লোককে বিরক্ত করে তাদের রবিবার-ভোরের ঘুম ভাঙিয়ে আমাদের গাড়ী চলল। বালি ব্রিজে গিয়ে আমরা দিল্লী রোড ধরলাম। ডানকুনি দিয়ে আর গেলাম না, আগেই বাঁদিকে একটি পথ ধরে পাঁচ মাইল পথ চুরি করে পৌছে গেলাম বম্বে রোডে।

ঘণ্টাখানেক পরেই উলুবেড়ে। মহকুমা সহর এটি, তবে পাড়াগাঁ পাড়াগাঁ ভাব।

॥ যাত্রী ॥ — ॥ ছাবিব ॥

বেলা প্রথম প্রহর পার হবার পর এলাম খড়গপুরে। গাড়ীগুলোর পেটের মধ্যে তেল ভরা হল, আর তাদের সওয়ারদের পেটে ভাত।

আবার ভট্ ভট্ ভট্ ভট্

এল ছোট সহর জলেশ্বর, বিকেল তখন তিনটে। এখানে চা-পানের বিরতি। তারপর সন্ধ্যায় পৌঁছলাম বালেশ্বর। জেলা সহর। এ, ডি, এম, মিঃ ভার্মার সৌজন্যে সার্কিট হাউস পাওয়া গেল, তার পরিবেশ সুন্দর। দক্ষিণা ঘরপিছু তিন টাকা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভেতরেই — তার দক্ষিণা আড়াই টাকা করে। অবশ্য স্টেশনের কাছেও একটি ডাকবাংলো ছিল।

রাত্রে খেতে বসে পাচকদের কাছে আমরা শুনলাম, এখান থেকে কলকাতার বাজারে অনেক সমুদ্রের মাছ চালান যায়।

শুনেই ল্যাম্বেটা বললেন ঃ এখানে দিন দুই হল্ট করলে কেমন হয়? সমুদ্রের মাছ ……

মাছের ওপর আমার সহজাত দুর্বলতার কথা সকলেই শেষ পর্যন্ত জেনে ফেললেন! লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ এড়াতে বললাম ঃ তা' হয় না, সোমবারে অফিস-জয়েন করতেই হবে — পে ডে!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে পড়ল, এই বালেশ্বর থেকেই তো বিশ মাইল দূরে বুড়ী বালামের তীরে একদিন বাঘা যতীন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, সেখানে তাঁর স্মৃতি ফলকও নাকি আছে। শহীদ বীরের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে গেল।

২২শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

সকাল হতেই সার্কিট হাউস ছেড়ে, ভট্ ভট্ ভট্ ভট্ ………। বেলা দশটা নাগাদ ভদ্রক। জলখাবারের জন্য কিছুক্ষণ থামলাম। খাবার সময় দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখান থেকে একত্রিশ মাইল দূরে চাঁদবালী বন্দর — সেখানে ডাকবাংলো আছে, প্রতি আধঘন্টা অন্তর এখান থেকে বাস ছাড়ে।

কটক পৌঁছবার মাইল পাঁচেক আগে একটি সুন্দর খাল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, থামতে হল। থামা হত কিনা জানিনা। মোটর বাইক বিশারদের গাড়ী বিগড়ে গিয়ে আমাদের থামিয়ে দিলে।

সবাই স্নান সেরে ফিটফাট, সেই গাড়ী কিন্তু ফিট হল না। দায়িত্ব বেশী অধিনায়কের, তাই

তিনি শেষ পর্য্যন্ত নিজের গাড়ীর সঙ্গে দড়ি বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন কটক পর্য্যন্ত। কটকে পৌছে গাড়ী সারাবার ব্যবস্থা করে আমরা খেতে গেলাম।

মহানদীর ব-দ্বীপে এই কটক সহর। নেতাজীর জন্মস্থান। তাঁর পৈতৃক ভবন আজ উড়িষ্যা সরকারের জাতীয় সংগ্রহশালা। এখানে সার্কিট হাউস, গেষ্ট হাউস আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু হেঁটে হেঁটে ঘুরলাম, দেখলাম গহনার দোকানে সাজানো রয়েছে সোনা ও রূপার তারের নানাধরণের গহনা। এখানের এ জিনিস নাকি বিশ্ববিখ্যাত।

আবার চলেছি। বালেশ্বর থেকে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত রাস্তা অল্প উঁচু নীচু। সন্ধ্যায় পৌছলাম ভুবনেশ্বরে। এখানের ইন্সপেক্সন বাংলোতে দু'খানা ঘর নিয়ে রাত্রিযাপন করলাম। ঘর প্রতি চার টাকা, ভেতরেই আহারের ব্যবস্থা জনপ্রতি দু' টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

সকালে তৈরী হয়ে নতুন ও পুরনো ভুবনেশ্বর দেখতে বেরোলাম। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর। শৈবক্ষেত্র। বিধানসভা, সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন দেখে বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে আমরা গেলাম উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি।

দুটি পাশাপাশি ছোট পাহাড় — ওঠবার সিঁড়ি আছে। এখানের গুহাগুলি নাকি খ্রীষ্টজন্মেরও তিনশ' বছর আগে তৈরী। তখন এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন।

উদয়গিরির গুহা (গুম্ফা) সংখ্যা বেশী। তার মধ্যে রাণী গুম্ফা, হস্তী গুম্ফা ও ব্যাঘ্র গুম্ফা শ্রেষ্ঠ। খণ্ডগিরির ওপরে একটি জৈন মন্দির আছে।

এরপর গাড়ী ছোটালাম দক্ষিণ-পূর্বে — চার মাইল দূরে পুরনো ভুবনেশ্বরে। সেখানেই যত মন্দির। কিছুদুর এসে চোখে পড়ল লিঙ্গরাজ মন্দিরের চূড়া। খানিকটা যেতেই ডানদিকে বিরাট বিন্দু সরোবর। সমস্ত তীর্থের বারি দিয়ে পূর্ণ এই সরোবর — তাই অতি পুণ্যতীর্থ। কিন্তু এর জল পচে সবুজ বর্ণ হয়েছে।

গাড়ী থামিয়ে রাস্তার বাঁদিকে গৌরীকুণ্ড ও দুধকুণ্ড প্রস্রবণ দেখতে গেলাম। গৌরীকুণ্ডের জল অনবরত বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে লোকে স্নান করছে। আমরা দুধকুণ্ডের জল পেটভরে খেলাম, এ জল হজমের খুব সহায়ক।

গাড়ী নিয়ে একটু এগোতেই ডানদিকে পড়ল লিঙ্গরাজ মন্দিরের সিংহদ্বার। দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম

ভুবনেশ্বর, তাই নাম লিঙ্গরাজ। এই ভুবনেশ্বরের মন্দির ৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল মহারাজ ললাটেন্দু কেশরী তৈরী করান। এর চারপাশে অসংখ্য মন্দির। লিঙ্গরাজ মন্দিরের স্থাপত্য ও কারুকার্য্য অনবদ্য।

সিংহদ্বারের আশেপাশে পাণ্ডার দল খেরো খাতা নিয়ে যাত্রী পাকড়াচ্ছে। এদিন শিবরাত্রির ভীড়, তাই তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমরা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। মূল মন্দিরে আসবার সময় গণেশের প্রকাণ্ড মূর্তি দেখলাম। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে অনেক নীচে নেমে গিয়ে দেবদর্শন করতে হয়। অসম্ভব ভীড়ের জন্য আমাদের ভাগ্যে দেবদর্শন ঘটল না, সেইখানে দাঁড়িয়ে দেবতাকে মনে মনে পূজা করলাম।

এক যাত্রীর কাছে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম — এ অঞ্চলে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে পরশুরামের মন্দির এখানের অন্যতম প্রাচীন এবং মুক্তেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য অতুলনীয়। সেগুলো সময়াভাবে দেখা হল না, কারণ ইতিমধ্যে দুপুর হয়ে এসেছে। এর পর কোণারক দেখে আজই রাত্রে পুরী পৌঁছতে হবে।

ফিরে এলাম পিপলির মোড়ে। ভেবেছিলাম অধিনায়কের রাজদূত বুঝি লক্ষ্মী, দেখছি তা' নয়! তার চাকা গেল লিক হয়ে। তা' সারিয়ে ভাত খেয়ে তারপর রওনা।

কোণারক।

ভুবনেশ্বর থেকে দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইল। পৌঁছলাম বেলা তিনটায়। এখানের একমাত্র দ্রষ্টব্য সূর্য্য মন্দির। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরসিংহ দেব তৈরী করেন। তৈরী করতে নাকি সময় লেগেছিল ষোল বছর। তখন মন্দির চূড়ায় চুম্বক বসানো ছিল, তার টানে সমুদ্রের অনেক জাহাজ নষ্ট হত, তাই পর্তুগীজরা কামান দেগে চূড়া ভেঙ্গে দেয়। কেউ বলেন, কালাপাহাড় মন্দিরটিকে ধ্বংস করেছে।

রথের মত মন্দির, মাঝখানে সূর্য্যদেব, সামনে বড় বড় ঘোড়ার মূর্তি। মন্দিরের পিছন দিকে রাণীর মহল, ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। মন্দিরের গায়ে শিল্পীর অপূর্ব কারুকার্য শত শত বছর ধরে মানুষকে এখানে টেনে আনছে।

এখানে ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আকাশের অবস্থা খারাপ, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কিছুদূর এসে গোপ নামে একটি জায়গা, সেখান থেকে বাঁদিকে বেরিয়ে গেছে কর্ড লাইনের মত একটি কাঁচা রাস্তা, গিয়ে মিশেছে হাইওয়েতে। শুনলাম এই পথে

আগের দিন থেকে পুরী - কোণারক বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এই পথে গেলে চল্লিশ মাইল পথ সংক্ষিপ্ত হয়। খুব উৎসাহে সকলে বললেন : এই পথেই যাওয়া যাক। আমাদের অধিনায়কও সম্মতি দিলেন।

সেই পথেই চললাম। পথের দূরত্ব কমানোর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবাবু গাড়ীর গুরুত্বও কমালেন। তাঁর জামাকাপড়ের ব্যাগটি কোন ফাঁকে পড়ে গিয়ে তাঁর গাড়ী হাল্কা হল তা' তিনি টেরও পেলেন না। সেই ব্যাগে আবার আমার গাড়ীর চাকার একটা টিউবও ছিল, সেটিও খোয়া গেল। হাইওয়েতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেই চল্লিশ মাইল পথ সর্টকার্ট হল, তখনই পূর্ণবাবু টের পেলেন তাঁর কাছ থেকে চল্লিশ টাকার জিনিস কার্টসর্ট হয়ে গেছে। তখন আর উপায় কি!

এই পথে আসার সময় কিছুদূরে আমরা সাক্ষীগোপাল মন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়েছি। এখানের দেবতা গোপাল পুরী যাত্রার সাক্ষ্য বহন করেন বলে যাবার পথে তাঁকে দর্শন করা প্রথা। শ্রীচৈতন্য দেবও তাই করেছিলেন। কিন্তু আমরা তা' করতে পারলাম না, তার কারণ এখানে পাণ্ডাদের বড় দৌরাত্ম্য। তাই দূর থেকেই গোপাল কৃষ্ণকে প্রণাম জানালাম।

পুরীতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা। সমুদ্রতীরে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের দোতলায় গিয়ে উঠলাম। চব্বিশে ও পঁচিশে ফেব্রুয়ারী কাটল পুরীতে, সমুদ্রস্নানের অদ্ভুত আনন্দে······ অপূর্ব সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দর্শনে······জগন্নাথদেব দর্শনে······সন্ধ্যায় সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণে! জীবনের একঘেয়েমি থেকে যেন মুক্তির আস্বাদ পেলাম।

জগন্নাথ মন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীতে অনঙ্গ ভীমদেব তৈরী করেন। পরিচিত পাণ্ডা খুব যত্ন করে আমাদের মন্দির দেখালেন। ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহনমণ্ডপ ছাড়িয়ে আমরা এলাম গর্ভ-মন্দিরে। সেখানে রত্নবেদীর ওপর জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। পাণ্ডা বেদী প্রদক্ষিণ করালেন। প্রদীপের আলো না থাকলে অন্ধকারে কিছুই দেখা যেত না।

পাণ্ডা শোনালেন, ভোগ যেখানে রান্না হয় সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ভোগ দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয়, তারপর সেই মহাপ্রসাদ আনন্দবাজারে বিক্রি হয়। আমাদের পাণ্ডা মশায় দু'বেলা আমাদের দু'রকম ভোগ সেবা করিয়েছিলেন, ফেরবার সময় শুকনো মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়েছিলেন।

পাণ্ডা বললেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এ মন্দির তৈরী করান। তিনি স্বপ্নে আদেশ পান সমুদ্রতীরে একখানি গাছ ভেসে এসেছে তা' দিয়ে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি নির্মাণ করাবে। রাজা সকালে সেই গাছ দেখতে পেয়ে তুলে আনলেন। দৈববাণী শুনলেন : যন্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে

ঐ বৃদ্ধকে দিয়ে মূর্তি তৈরী করাও। তৈরী শেষ হবার আগে কেউ যেন তা' না দেখে।

কিন্তু দিন কয়েক পরে রাণী গুণ্ডিচা দেবী আর থাকতে না পেরে দরজা খুললেন, দেখলেন, অসম্পূর্ণ মূর্তি······শিল্পীও অদৃশ্য! হবেনই তো—তিনি যে স্বয়ং বিশ্বকর্মা। আকাশবাণী হল: শীঘ্র মন্দির তৈরী করে দেবতার প্রতিষ্ঠা কর। রাজা তাই করলেন।

মন্দিরের সামনের চওড়া রাস্তা সোজা গেছে গুণ্ডিচা বাড়ী, মানে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী। এই পথ রথযাত্রায় লোকে লোকারণ্য হয়।

এর পর ঘুরে ঘুরে মার্কণ্ডেয় সরোবর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখলাম।

দ্বিতীয় দিনে গিয়েছিলাম গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে, যেখানে রয়েছে ফোঁপরা একটা গাছ, নাম সিদ্ধবকুল। এই গাছ মনস্কামনা সিদ্ধ করে। এর তলায় শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস নামকীর্তন করতেন।

সিদ্ধবকুলের কাছেই গলির মধ্যে এক মঠে চৈতন্যদেবের পাদুকা, কাঁথা ও কমণ্ডলু আছে। বিকেলে গেলাম স্বর্গদ্বারে। পুরীর মহাশ্মশান। সমুদ্র তীরে। কাছেই শঙ্করাচার্যের মঠ।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

সকালে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ — বেলা দশটায় পিপলিতে টিফিন — দুপুরে ভুবনেশ্বরে আহার —ভদ্রকে চা পান — সন্ধ্যায় বালেশ্বর।

ভেবেছিলাম এবারেও সার্কিট হাউসে ঠাঁই পাব। কিন্তু ইলেকসনের ব্যাপারে কোন মন্ত্রী যেন গোটা সার্কিট হাউস রিজার্ভ করেছেন! তখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত মাইল বারো দূরে চণ্ডীপুর বীচে ট্যুরিষ্ট বাংলোয় যাই। স্থানটি বেশ ভাল লাগে, কিন্তু বাংলোর দক্ষিণা মোটেই ভাল লাগেনি। রাতটুকুর জন্য মাথাপিছু বোধ হয় বারো টাকা চেয়েছিল। তাতেই রাজী হতাম হয়ত, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ল লাগোয়া একটা বার রয়েছে আর তার লাউঞ্জে এক বাঙালী মেমসাহেব সিগারেট টানছেন! এতখানি পাশ্চাত্যয়ানা আমাদের সহ্য হবে না ভেবে আমরা ফিরে এলাম বালেশ্বরে।

উঠলাম এক নগণ্য হোটেলে রাত ন'টায়। ভাবলাম খাওয়া-দাওয়া সেরে সফরের এই শেষ রাতটুকু বেশ শান্তিতেই কাটাব। আমাদের ভাবনাটা বুঝতে পেরে দেবতা বোধহয় হেসেছিলেন!

দোতলার ঘরে সবেমাত্র আমরা গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনও সব জিনিসপত্র নীচে থেকে ওপরে যায়নি। হঠাৎ নীচে গোলমাল শুনে বারান্দা দিয়ে দেখি হোটেলের সামনে পুলিসের গাড়ী, সেখানে অনেক লোক ভীড় করেছে। কি ব্যাপার? সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল ঃ বঙালো দেশো হইতে নকশালো আউচি!

হোটেলের ম্যানেজার ছুটে এসে আমাদের ব্যাপারটা জানাল, বলল নীচে পুলিসের কাছে আসতে। আমরা বলে দিলাম পুলিসকেই ওপরে আসতে। উৎকল পুলিশ কিছুতেই ওপরে উঠতে সাহস করল না! বাধ্য হয়ে আমরাই নীচেতে নামলাম।

পুলিশ বলল ঃ তোমরা নকশাল আছ?

আমরা ঃ না—ট্যুরিষ্ট। অধিনায়কই পুলিসের সঙ্গে বিশেষ কথা বার্ত্তা বলছিলেন। আমাদের একজন কোন ফাঁকে ওপরে উঠে গিয়েছিলেন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদকের কাছ থেকে আমাদের জন্য একটা ছাড়পত্র লিখিয়ে এনেছিলেন সেটা নিয়ে এসে দেখালেন। তখন একজন পুলিশ আমাদের জিনিষপত্রগুলো খুব সাবধানে, দুটি পা অনেক দূর ব্যবধানে রেখে আলতো ভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল……বোধহয় বোমা-টোমা খুঁজছিল।

আমি বললাম ঃ আমরা ওসব নই, গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস করি। এ, ডি, এম, কে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, সার্কিট হাউসে আমরা যাবার সময় ছিলাম। জায়গা না পেয়ে এখানে এসেছি।

পুলিশ অফিসারটি বোধহয় এতক্ষণে আমাদের পজিসন সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তিনি স্বগত উক্তি করলেন, রং ইনফরমেশন! তারপর বিফল হয়ে দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন।

ভট ভট ভট ভট

সাতাশ তারিখ সকালে উঠে বালেশ্বর থেকে রওনা হলাম — জলেশ্বর ছাড়িয়ে দুপুরে খড়গপুরে আহার ও বিশ্রাম — তারপর বিকেল চারটায় উত্তরপাড়া জি, টি, রোডের ওপর সেই গাছতলায় মোটর সাইকেল ক্লাব।

তারপর? তারপর চলেছে বাড়ী আর অফিসের টানাপোড়েন·····সেই শহরের কোলাহলময় আবেষ্টনী·········সেই একঘেয়েমীর অন্ধকার······সেখানেও জীবন-সাইকেলের অবিরাম গতি— ভট্ ভট্ ভট্ ভট্·········!

ম্যাক্লাস্কিগঞ্জ

দ্বৈপায়ন

উনিশশ' সত্তর — একাত্তর সাল। বোমা আর গুলি, খুন আর লুঠতরাজ, বাংলার বুকে জেঁকে বসেছে। আমরা মধ্যবিত্ত। সারা বছর কাজ করি আর পুজো বা শীতে দিন পনেরো-কুড়ি কোথাও ঘুরে আসি। কর্মক্লান্ত মনটাকে সরস করে নিই। তাই এ আধা-ভবঘুরের দল পুজো বা বড়দিনের দিকে সারা বছর আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকে।

রবিবার। একে একে সব-কটি বন্ধু জড় হয়েছে সঞ্জয়ের বাড়ী। সকলের মুখে ঐ এক কথা— ভাই, আর পারিনে। চল, কোথাও গিয়ে একটু শান্তিতে দিনকয়েক কাটিয়ে আসি। সুজয় বল্লে, সত্যি যেতে চাও তো চল আমার সঙ্গে। পথে হয়তো একটু কষ্ট হবে। তা হোক। তবে তোমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখান থেকে হয়তো তোমরা আর ফিরতে চাইবে না। বন্ধুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো চল, — তবে তাই চলো। যাত্রার দিন স্থির হল ষোলই ডিসেম্বর।

কোলকাতার ডিসেম্বর। এখনও তেমন শীত পড়েনি। তবে কুয়াশার কিছু উৎপাত সুরু হয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও আমাদের যাত্রা করতে সকাল দশটা বেজে গেল। অবশ্য গাড়ীর চালে মালপত্তর বাঁধতেই ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল।

আহা! সাধের দিল্লী রোডের কি অবস্থা! এই সেদিন হলো এ রাস্তা। এর মধ্যেই বহু জায়গায় ছাল উঠে গেছে। অসংখ্য গর্ত। মাঝে মাঝে খোয়া-পাথরগুলো মুখ খিঁচিয়ে বিদ্রূপ করছে। গাড়ীর গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হচ্ছে। উপায় কি!

বাংলাদেশে ট্রেনে করে যাওয়া — একটা বিরাট অনিশ্চিত ব্যাপার। ট্রেন চলবে কিনা তার ঠিক নেই। চল্লেও কতদূর যাবে "দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ"। বাংলার পথ-ঘাট,— সেও নিরাপদ নয়। তাই ভয়ে ভয়ে বাংলাদেশ তো অতিক্রম করা গেল। বরাকর পার হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এবার গাড়ী হু-হু করে চল্লো। বিহারের এ রাস্তা দিয়ে কতবার গিয়েছি কিন্তু মনে হয় এ চির-নূতন। এর সৌন্দর্য্য অফুরন্ত। ঢেউ খেলানো জমি, জঙ্গল, পাহাড় সব মিলিয়ে ট্যুরিস্টের যেন স্বর্গ রাজ্য।

পথে হাজারিবাগে রাত কাটিয়ে পরদিন রাঁচী হয়ে আমরা গন্তব্য স্থানের দিকে চললাম। গন্তব্য স্থান মানে ম্যাক্‌ক্লাস্‌কিগঞ্জ। দিনের আলোয় পৌঁছন চাই। তা' না হলে পথে বিপদের আশঙ্কা আছে। রাঁচী থেকে ডাল্‌টন্‌গঞ্জের পথে কুড়ি মাইল গিয়ে বিজুপারা। সেখান থেকে ডাল্‌টন্‌গঞ্জের পথ ছেড়ে ডানদিকে 'খালারি'র (এ, সি, সি, সিমেন্টের খনি) পথে যেতে হবে। বিজুপারা থেকে আবার আট মাইল গিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে খালারির সরু পথ ধরতে হবে। এ জায়গাটা সম্পূর্ণ পাহাড় আর জঙ্গল। এই পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ী চললো। মাঝে মাঝে দু'এক ঘর আদিবাসীর পর্ণকুটীর। হঠাৎ উঁচু থেকে হড়-হড় করে গাড়ী নীচু দিকে চলতে লাগলো। মনে হলো আমরা পাতালপুরীতে চলেছি। দূরে নীচেয় 'খালারী মাইন' ও ছোট্ট 'খালারী' সহর দেখা যাচ্ছে। চারি দিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও কুঞ্চিত ভেড়ার লোমের মত গাছ-পালা। আবার কোথাও বা রুক্ষ পাথর। এই ধূসর পাথর থেকেই সিমেন্ট তৈরী হচ্ছে। 'খালারী' সহরের রাস্তাটি বড় চমৎকার। সিমেন্ট দিয়ে তৈরী। হবে না কেন, এদের তো আর সিমেন্ট কিনতে পয়সা লাগে না। সহরটুকু পার হতেই সরু হলো বিহারের দেহাতি রাস্তা। গর্ত আর ধূলো। কোথায় কত-খানি গর্ত বোঝবার উপায় নেই। সন্তর্পণে যেতে হচ্ছে। এত সাবধানতা সত্বেও একটি গাড়ীর পেট্রলের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সেদিন রাস্তায় গাড়ী রেখে আসতে হলো। এখনও আমরা গন্তব্য স্থান থেকে মাইল ছয়েক দূরে। পথ আরো দুর্গম হতে লাগলো। এদিকে সূর্য্যদেব সারা দিনের কাজ সেরে পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়েছেন। যা হোক রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ নেমে আসবার আগেই আমরা আমাদের ডেরায় পৌঁছে গেলাম।

ইংরেজ রাজত্বের সময় এ জায়গাটার নাম ছিল 'ল্যাপরা'। অবশ্য এখনও এই নামে এই জায়গাটা বেশী পরিচিত। বি, এন, আরের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড ও ইঞ্জিন চালকেরা এখানে একটা কলোনি করে অবসর জীবনটা কাটিয়ে দিতেন। তাই এখানে প্রায় পঞ্চাশ - ষাটটি বাড়ী আজও আছে কিন্তু নেই সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা। দেশ স্বাধীন হতে তাঁরা এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন—কেউ ইংলণ্ডে - কানাডায়, অস্ট্রেলিয়া - নিউজিল্যাণ্ডে, আবার কেউ বা দক্ষিণ আফ্রিকায়।

নেতারহাটে পালামৌ ডাকবাংলো থেকে পূর্ব দিকে যে ঢেউ খেলানো পর্বতশ্রেণী দেখা যায় এবং যার কোল থেকে সূর্য্যোদয় হয় — ম্যাক্‌ক্লাস্‌কিগঞ্জ এই পাহাড়গুলির মধ্যে একটি পাহাড়ের চূড়ায়।

যদি শহর জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকেন, রাহাজানি আর খুন দেখে দেখে দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে থাকেন, তবে চলে আসুন এই পাহাড়ে-জঙ্গলে — এই নির্জন ম্যাক্‌ক্লাস্‌কিগঞ্জে। চারি দিকে পাহাড়

আর জঙ্গল। আপনিও দাঁড়িয়ে আছেন জঙ্গলে ঘেরা একটি পাহাড়ের মাথায়। ঋজু দেহ নিয়ে শাল আর ঝাঁকড়া চুল নিয়ে মহুয়া দাঁড়িয়ে আছে আপনার জন্যে। ঘন এলোমেলো ভাবে গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে অনেকটা সৈন্যদের 'অ্যাটেন্‌সান্‌' ভঙ্গীতে। নীরব বনানী আপনাকে লক্ষ্য করছে। তারা নীরব ভাষায় আপনার সঙ্গে মিতালি করতে চায়। বসন্তে যদি এখানে আসেন, তাদের ফুলের গন্ধে আপনাকে নিশ্চয় পাগল করে দেবে। ভয় নেই, এ পাগল, রাঁচীর কাঁকের পাগল নয়। এ পাগল রূপ-রস-গন্ধের পাগল — ভাবোল্লাসের পাগল। আবার বর্ষায় যদি আসেন তবে শুনবেন অপূর্ব সঙ্গীত। সারা রাত্রি পাতার ওপর বৃষ্টিপাতের শব্দে আপনাকে এক অলস স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যাবে। আর শীতে যদি আসেন, সঙ্গে আনবেন প্রচুর শীতবস্ত্র। হ্যাঁ, ঠাণ্ডা বটে ম্যাক্‌ক্লাস্‌কিগঞ্জ! সকালে দেখবেন শিশিরগুলি জমে গেছে। তবে শীতে ভয় পাবেন না। এখানকার অলস জীবনে একটু দেরী করে বিছানা ছাড়লে কোন ক্ষতি নেই। বাইরে যখন রোদ ছড়িয়ে পড়বে, তখন একটা নরম পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসুন। কী চমৎকার আরামদায়ক রোদ। সর্বাঙ্গে তার স্নেহস্পর্শ অনুভব করবেন। আপনি হয়তো বলতে পারেন, খালি পেটে কি এসব ভাল লাগে? আমি বলব, নিশ্চয় না। রাঁচী থেকে আসবার সময় চাল-ডাল, তেল-নুন-মশলাপাতি সব নিয়ে আসুন। অবশ্য এখানেও এসব পাওয়া যায়। তবে চার মাইল দূরে স্টেশনে বা হাটে আপনাকে যেতে হবে। দল-বেঁধে যেয়ে দেখবেন, আনন্দও পাবেন। আর মালী আপনাকে ডিম, মুরগী ও খাঁটি গরুর দুধ জোগাড় করে দেবে। আমিও একজন ভোজনবিলাসী। ভাল খাবার ব্যবস্থা না থাকলে, আপনাদের এখানে আসতে বলতাম না।

হ্যাজ্‌লিট বলেছেন 'On going a journey, you should be alone.' এখানে হ্যাজ্‌লিটের উপদেশ শুনলে বিপদে পড়বেন। এখানে "On going a journey, you should be in company." আর হাতে একটা বন্দুকও থাকা চাই। বনের ভেতর দিয়ে বেশ গল্প করতে করতে চলেছেন হঠাৎ হয়তো দেখতে পাবেন একটা হায়না হাঁ করে আপনাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কিন্তু আপনাদের দলবল দেখে বেচারা আস্তে আস্তে সরে পড়লো। আবার চলেছেন। পথে হয়তো একটা ভীরু শৃগাল বোকা বোকা মুখে পালিয়ে গেল। কখনও কখনও মস্ত ভাল্লুক ঘোঁত ঘোঁত করে আপনার দিকে এগিয়ে আসতে দেখবেন। ভয় পাবেন না। এদেশের লোকেরা লাঠি দিয়ে এদের তাড়িয়ে দেয়। আপনারা একটু তাড়াহুড়ো করলেই ও পালিয়ে যাবে। কিন্তু ভয় এখানকার চিতাবাঘকে। চলেছেন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ দেখলেন গাছের ডালে একটা লম্বা লেজ ঝুলছে। আপনাদের গন্ধ পেয়ে বাবাজী হালুম করে নিচেয় লাফিয়ে পড়লো। আপনার বন্দুক কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গর্জে ওঠা চাই। দেখবেন ডোরা-কাটা নধর দেহ নিয়ে চিতাবাঘটি মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো। এমনি কত জন্তু-জানোয়ারের দর্শন পাবেন এই ম্যাক্‌ক্লাস্‌কিগঞ্জের বনের মধ্যে।

সহর - জীবন যখন আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, চাওয়া-পাওয়া যখন আপনাকে অস্থির করে তুলবে তখন চলে আসুন এখানে। আরণ্যক সৌন্দর্য্য আপনাকে সব ভুলিয়ে দেবে। আপনি বার, তারিখ ভুলে যাবেন। বাসে-ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে অফিস যাওয়ার কথা ভুলে যাবেন, ভুলে যাবেন রাজনীতির কোন্দল। ছোট নাগপুরের পাহাড়-জঙ্গল আপনাকে সব ভুলিয়ে দেবে। আপনার মনকে আনন্দে আর শান্তিতে ভরিয়ে তুলবে। এখানে বেশভূষার বালাই নেই। রোজ রোজ দাড়ি কামাবারও দরকার নেই। কারণ দেখবে কে? কাছে-পিঠে তো কোন সহুরে মানুষের বসতি নেই। তাই আপনি পুরোপুরি স্বাধীন। থাকার মধ্যে আছে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল। সরল অনাড়ম্বর এদের জীবন। বনের ফল, ঝরণা বা নদীর জল আর মৃত্তিকার কিছু ফসল—এতেই এরা সন্তুষ্ট। বনের তু'একটা জন্তু মিলে গেলে তো এদের মহোৎসব। সবাই মিলে সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে সব জড় হবে। তারপর চলবে মহুয়া মদ পান আর নাচ গান। মাদলের গুরু-গম্ভীর শব্দ আর সাঁওতাল যুবক-যুবতীর হিল্লোলিত দেহ-সৌষ্ঠব আপনাকেও চঞ্চল করে তুলবে, আপনাকে আনন্দে মাতিয়ে তুলবে। তাই বলছি যখনই সহর জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন তখনই চলে আসুন এখানে। — চলে আসুন ছোট নাগপুরের এ পাহাড়ে-জঙ্গলে।

কিভাবে ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ যাবেন—

(১) বম্বে মেলে গোমোয় নামবেন। তারপর বরকাকানা লাইনে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে নামবেন।

(২) রাঁচি থেকে ট্যাক্সি করেও যাওয়া যায়। ভাড়া ৩৫'০০ টাকা।

ভ্রমণের বাসনা প্রাণীর আদিম প্রবৃত্তি। ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু তার পদসঞ্চালন করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই পদক্ষেপ দৃঢ় হয়। মানুষ চলতে শেখে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে যায়। তারপর দেশে ফিরে আত্মীয় পরিজনকে বিদেশের গল্প শোনায়।

— সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

শিবলিঙ্গের কোলে

শুভজয়া গুহ

গভীর দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি, বাংলাদেশের অন্যতম মহিলা পর্ব্বতারোহী ও আমাদের সমিতির সভ্যা ও অন্যতম শুভানুধ্যায়িনী সুজয়া গুহকে। — পর্ব্বতপ্রেমিকা পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন অনন্ত পথে। রেখে গেছেন আমাদের জন্য শুধু বেদনা আর অশ্রুজল — তাঁর অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

— সম্পাদক

'বাঃ, দিব্যি আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রয়েছ? আর আমাদের ক্যাম্পফায়ারের মহড়ার জন্যে তাড়া লাগিয়ে এলে।'

সুজাতার তাগিদে পাথরের কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। কিন্তু যাবো কোথায়? নিচ থেকে কাঠ এসেছে শুধু রান্না করার মতো। কাজেই বাইরে ফায়ার প্লেস হচ্ছেনা। তাঁবুর মধ্যে আসর বসানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

উত্তরকাশীতে পৌঁছানোর দু'দিনের মধ্যেই আমাদের সমাবর্তন। আবার সেদিনই শুরু হচ্ছে নিয়মিত লেডিজ কোর্স। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় চল্লিশটি মেয়ে আসবে। সেদিনের ক্যাম্পফায়ারে তাই আমরা বাংলার নিজস্ব কিছু তুলে ধরতে চাই। ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্যনাট্য হবে। শ্যামা। ঘড়ি ধরে মহড়া শুরু হল। সুতপা আর সুদীপ্তা দরদী কণ্ঠে একের পর এক গান গেয়ে চলে। আমরা নীরবে শুনি।

খাবার ডাক পড়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বার হওয়া দুঃসাধ্য। জোঁকের মত লেগে রয়েছি এ ওর গায়ে। এমন উষ্ণ পরিবেশ ছেড়ে বাইরে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দিতেও ইচ্ছে করছে না।

কোনমতে বেরিয়ে আসতেই হল। বেশ রাত হয়েছে। এক কোণে একটি পাথরের গুহার মধ্যে আমাদের রান্নাঘর। আরাম করে উনুনের চারপাশে বসে ডাল রুটি আর টিনের তরকারী চিবোই। নিভন্ত কাঠের মিটিমিটি আগুন। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারই মাঝে মাঝে সাদার অস্পষ্ট আভাস। তুষারে ঢাকা তাঁবুগুলো আঁধারের গুরুভার ঠেলে ফুটে উঠতে সাহস পাচ্ছেনা যেন।

॥ যাত্রী ॥ — ॥ সাঁইত্রিশ ॥

পরদিন সকালে তৈরী হতে যথারীতি সেই আটটা বাজলো। তুষার গাঁইতি উঁচিয়ে জামিত আমাদের দেখায়। 'শিবলিঙ্গ শিখরের উত্তর ঢালে পাশাপাশি দুটি গিরিবর্ত্ম দেখতে পাচ্ছো? মধ্যিখানে বেবী শিবলিঙ্গ বা ব্ল্যাক পিক। তোমাদের যে কোন একটি গিরিবর্ত্মে উঠতে হবে উচ্চতা হবে উনিশ হাজার ফিটের মত।'

'আজ উঠবে পুরোপুরি নিজেদের হিম্মতে। কোন পথে কিভাবে উঠবে, ঠিক করবে তোমাদের লীডার। আমি আর মোহন দূর থেকে তোমাদের অনুসরণ করবো। বিপদে পড়লে বা পথে নিশানা না খুঁজে পেলে আওয়াজ দিও। আমরা মদত দেবো।'

'মিসেস্ গুহ, তুমি এগিয়ে যাও। তুমি আজ লীডার'। নাটকীয় ভঙ্গীতে ডায়ালগ শেষ করে।

'কোই বাত নেহী।' আপন মনেই বলি। টিলা থেকে তরতর করে নেমে আসি মাঠে। সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো রাঙিয়ে তুলেছে আমাদের তাঁবু, ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। ভিজে ঘাস ভোরের আলোয় মাথা দুলিয়ে কী বলছে — সুপ্রভাত? না—যেমন ধিঙ্গিপনা, বুঝবে 'খন মজা!

সেই ছোট্ট নদীটি। স্তব্ধ, ধ্যানমৌন। ওর কাকচক্ষু জল এখন স্ফটিক কঠিন। ঊষার আলোর পরশে এক বর্ণালী পরিবেশ। আলোর উষ্ণতায় আলোর খেলা ফুরিয়ে যায়, শিশু নদীর ধ্যান ভাঙ্গে। বরফের আবরণ খসে পড়ে। ছল ছল শব্দে শিশুর চাপল্যে আবার সে বয়ে চলে।

অজেয় শিবলিঙ্গ। ওই আমাদের ধ্রুবতারা। ওকে লক্ষ্য করেই আমরা এগিয়ে চলি। প্রথম দিকে ঘাসে ছাওয়া চড়াই। বেজায় গরম! হাঁপিয়ে উঠছি। ধড়াচূড়ো অসহ্য লাগছে। উইণ্ডপ্রুফ খুলে ফেলি। ব্যাগে ঢোকাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই! বোঝা বাড়াবো কেন? একটা পাথর চাপা দিয়ে রাখি। ফেরার পথে নিয়ে যাবো।

ঘাসের রাজ্য ছাড়িয়ে, এসেছি পাথরের রাজ্যে। একি লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড! দত্যির মত মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। অতিকায় পাথরের ব্যূহে আমরা ক্ষুদে বামনবীর। আমাদের অস্থির আস্ফালনে ওরা নির্বিকার। দু' ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত পাথরের পর পাথর ডিঙোচ্ছি।

যতো উঁচুতে উঠছি, বরফের পরিমাণ বাড়ছে। পুরু বরফ জমে আছে পাথরের মাথায় মাথায়, খাঁজে খাঁজে, ফাটলে ফাটলে। বোঝাই যায়না কোথায় গর্ত। মানুষ শিকারের জন্য প্রকৃতির ফাঁদ। আমরা সচেতন, সতর্ক। তুষার গাঁইতি ঠুকে ঠুকে প্রতিটি পা ফেলছি। মাঝে মাঝে তুষার গাঁইতি তলিয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থ ফাঁদের শুচি শুভ্র মুখোশ খুলে, অন্তহীন কৃষ্ণকায় স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে!

দুশ্চিন্তার বোঝা ভারী হয়ে উঠছে। এতগুলো মেয়ে চলেছে আমার নির্দেশে। যদি কেউ আহত হয়? বরফ সরিয়ে পাথরের ওপর পা রাখার জায়গা করছি। তা সত্ত্বেও বরফে ভিজে জুতো একেবারে জবজবে। পায়ের আঙুল থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত ব্যথায় টনটন করছে। এটা আমাদের নির্বুদ্ধিতার খেসারত। যেমন পুরু চামড়ার ক্লাইম্বিং বুট না পরে হাণ্টার পরেছি। একমাত্র কমলা বুট পরেছে। শিবির থেকে বোঝাই যাচ্ছিল না যে এখানে এত বরফ। পায়ের যন্ত্রণায় এক নতুন ভয় ঢুকছে মনে—তুষারক্ষত হবেনা তো!

পাথরের এলাকা এখনও শেষ হয়নি। তবে পাথর আকারে ছোট হয়ে এসেছে। মাড়িয়ে যাওয়া যায়। বরফ নেই কারণ খুব খাড়া ঢাল। পাথরগুলো খুব ঝুরঝুরে। ক্ষণে-ক্ষণেই ওরা ঝরণার মত বেগবতী হতে চায়। কিছুক্ষণ প্রবাহের পর আবার আপন মনেই ব্রেক কষে। পাথরের প্রবাহের মধ্যে পড়ে মাঝে মাঝে আমরাও চলি নিচের দিকে।

তাহলেও আমরা উঠছি। বেশ তাড়াতাড়িই উঠছি। আজ আমরা বিশ্রাম নেবার ছুতোয় বসে পড়ছিনা যেখানে সেখানে। একে তো পায়ের ভয় মাথায় উঠেছে। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালে নির্ঘাত তুষারক্ষত! পা চালিয়ে গা গরম রাখাই এখন বাঁচার একমাত্র রাস্তা।

অতিকায় পাথর যদি মাতাল হয় তবে বড্ড ভয়ের কথা; একেবারে বেসামাল হলে তো কথাই নেই! নিমেষে কোথায় তলিয়ে যাবো! খাড়া ঢালে পাথরের স্তূপ পর্বতাভিযানের সবচেয়ে বড় বাধা। প্রতিটি পাথর যেন এক একটি মৃত্যুর পরোয়ানা!

বহু নিচে বিশাল বোল্ডারগুলোকে নুড়ির মত দেখাচ্ছে। আরও নিচে সবুজের অস্পষ্ট আভাস। আমরা ঐ তীক্ষ্ণ চড়াই বেয়ে, আলগা পাথরের প্রস্রবণ পেরিয়ে, এতো ওপরে উঠে এসেছি, নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিনা।

হিমবাহের ওপারের শৃঙ্গগুলো প্রখর রোদে ভাস্বর। ভাগীরথীর তিনটে চূড়ো বর্শাফলকের মত ঝিক্‌মিক্ করছে। অকস্মাৎ গগনভেদী দামামা—পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে! অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি ভাগীরথী ১য়ের শিখর ভেঙে নেমে আসছে তুষারের বন্যা। পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সোচ্ছ্বাসে শতধা হয়ে ঝরে পড়ছে পেঁজা তুলোর মত। সূর্য্যকিরণ আপন মনে সেই হিমপুঞ্জে রামধনুর আলপনা এঁকে চলেছে। আজ কি ওখানে বসন্তোৎসব? নানা রংয়ের ফাগ উড়িয়ে ভাগীরথীর তিন কন্যা আমাদের ডাকছে?

তুষার-কন্যা হারিয়ে গেছে, রামধনুও মিলিয়ে গেছে। ভাগীরথীর শুভ্র-হিমশীর্ষে ফুটে উঠেছে এক

গহ্বর। ভেতরে তার উজ্জ্বল নীলিমা মাখা। নগ্ন নীলাভ হিমশীলা।

ওদের চমক এখনও ভাঙেনি। যাক্ ওরা বিশ্রাম করুক। আমি ততক্ষণে পথ খুঁজি। পথ মানে দেহভার গ্রহণের মত অটল অনড় পাথর। শেষে খুঁজে পেলাম সেই 'পরশ পাথর'। আনন্দে চীৎকার করি, 'এবারে তোমরা এস'।

জবাব নেই। নাম ধরে ডাকি। এবারে উত্তর আসে। স্বপ্না ও সুদীপ্তার পায়ের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই পা নিয়ে পতনোন্মুখ পাথরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করা যায়না। কি আশ্বাস দেবো? বলতে পারিনা — চলে এসো, কোন বিপদ হবেনা। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত্ত অপঘাতের আশঙ্কা বয়ে নিয়ে আসছে। তবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলি, 'আর বেশী দূরে নেই'। ওরা নিরুত্তর।

তবে কি এবারের মত এখানেই শেষ? এখান থেকেই ফিরে যাবো সবাই? মন যে সায় দিচ্ছে না। শরীরে কোন ক্লান্তি নেই, প্রাণে কোন ভয় নেই, মনে এক অদম্য আশা, — যাবো ঐ গিরিবর্ত্মে, উপল অবরোধ পেরিয়ে। মন বলে একলা চলো। হঠাৎ শুনি, 'সুজয়াদি আমি আসবো'। কমলা বলছে। নিশ্চয়ই আসবে। সঙ্গী পেলাম।

নিভৃত নিস্তব্ধ শিলাকীর্ণ পাহাড় ভেঙে আমরা দু'জনে নীরবে উঠছি। খুব ভাল লাগছে। — কি সাংঘাতিক জায়গায় এলাম! ধসে পড়া জীর্ণ প্রাসাদের মত একটা গোটা পাহাড় বিধ্বস্ত হয়ে আছে। রাশি রাশি, ভারি ভারি চাকলা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। নাড়া লাগলে নির্ঘাত ভূমিকম্প। থ্রিলের অনুভূতি ফিকে হয়ে আসছে। একনাগাড়ে ছ' ঘণ্টা ধরে শুধু পাথর আর পাথর।

কমলা আর আমি দু'দিকে সরে গিয়ে, ধস বাঁচিয়ে পথ খুঁজি। জামিত সিংএর গলা পেলাম — এইদিকে। আর ধস বাঁচিয়ে নয়, ধসের ওপর দিয়েই বেড়ালের মত লঘু পায়ে উঠতে থাকি। সামনে একটা ফোকর। তার ভেতরে মাথা গলাতেই পৌছে গেলাম আলোর জগতে।

দাঁড়িয়ে আছি একটি সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে। পূবে ও পশ্চিমে খাড়া ঢাল নেমে গেছে কোন অতলে। একটি বিরাট গিরিশিরার মধ্যে এইটুকু অংশ চাপা—তাই গিরিবর্ত্ম। গিরিশিরাটি দক্ষিণে গিয়ে মিশেছে কৃষ্ণচূড়ায় (ব্ল্যাকপিক)। কয়েক ফিট উঠলেই শিখর আরোহণ। ঐ তো শুভ্র মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণ-কান্তি কৃষ্ণচূড়া। কতটুকুই বা দূর? নিশ্চয়ই পারবো। জামীত আমল দেয় না, 'দেখছো না কি রকম পাথর পড়ছে? বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ছটফটানিও বাড়বে। ওসব বুদ্ধি ছাড়। এই ঢের হয়েছে'।

॥ যাত্রী ॥ — ॥ চল্লিশ ॥

চারিপাশে শুভ্র শিখরের মেলা। এত কাছে, এতো চূড়া, কখনও দেখিনি। উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ শিখরের পশ্চিমে মেরু, ভৃগু আরও দক্ষিণে কীর্ত্তিস্তম্ভ কেদারনাথ। রক্তবাহী ধমনীর মত অসংখ্য গিরিশিরা, শাখাপ্রশাখা মেলে দিগন্ত ছেয়ে আছে। আর আছে সবুজ, সাদা, কালো, স্লেট-রঙা পাহাড়ের ঢেউ। মাঝখানে আমি—আমাকে ঘিরে প্রকৃতি তার শাশ্বত সৌন্দর্য্যের পশরা সাজিয়ে বসেছে। নয়ন ভরে দেখি। শুধু দেখি আর দেখি। আর ভাবি·········

'আরে নামো নামো। ছুটো বেজে গেছে'।

আর একটু থাকি। নামতে ইচ্ছে করছেনা। আজই শেষ। কাল সকালে তপোবন ছেড়ে পাড়ি দেবো কলকাতার পথে। মনে পড়লেই বিদায় ব্যথা গুমরে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। জানিনা আবার কবে ফিরে আসবো ধ্যানগম্ভীর এই তপোভূমিতে!

শেষবারের মত ঝুঁকে দেখি, গিরিবর্ত্মের পশ্চিম ঢালে মেরু, ভৃগু আর শিবলিঙ্গের তুষারধারা বয়ে নিয়ে চলেছে মেরু-বামাক — উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে।

'কি হচ্ছে? এক্ষুনি পড়তে টুপ করে চার হাজার ফিট নীচে। ঐ মেরু-বামাকেই তোমার শেষ শয্যা হতো। দু' হাত চওড়া গিরিবর্ত্মে দাঁড়িয়ে আছ খেয়াল নেই, আশ্চর্য্য'।

কথা না বাড়িয়ে নামতে শুরু করি। ফিরে যেতে মন চায়না। মেরু-বামাকের শুভ্র তুষার-স্তূপে হারিয়ে গেলে মন্দ হতনা! লক্ষ বছর পরে কোনও বিজ্ঞানী প্রকৃতির এই কোল্ড ষ্টোরেজ খুলে আবিষ্কার করত আমার ফসিল। সাজিয়ে রাখা হত কোন যাদুঘরে। ভীতি, বিস্ময় আর অপ্রীতির দৃষ্টি নিয়ে দেখতো — যেমন আমরা দেখি পঞ্চাশ লক্ষ বছরের প্রাচীন ডায়নোসেরাস আর ছ' লক্ষ বছরের পুরনো জাভাম্যানের কংকালের দিকে। কেউ হয়তো তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে বলতো, ভাগ্যিস আমি ঐ রাক্ষসীর যুগে জন্মাইনি!

সংঘম্ শরণম্

অজন্তা চৈত্য গুহা।

অনিল ঘোষাল ॥

অরণ্যচারী —কাজিরাঙ্গা, আসাম।

স্বরাজ বন্দোপাধ্যায় ॥

সুরসুন্দরী

হয়শল্ স্থাপত্যশিল্প — বেলুর

কুমার মুখোপাধ্যায় ॥
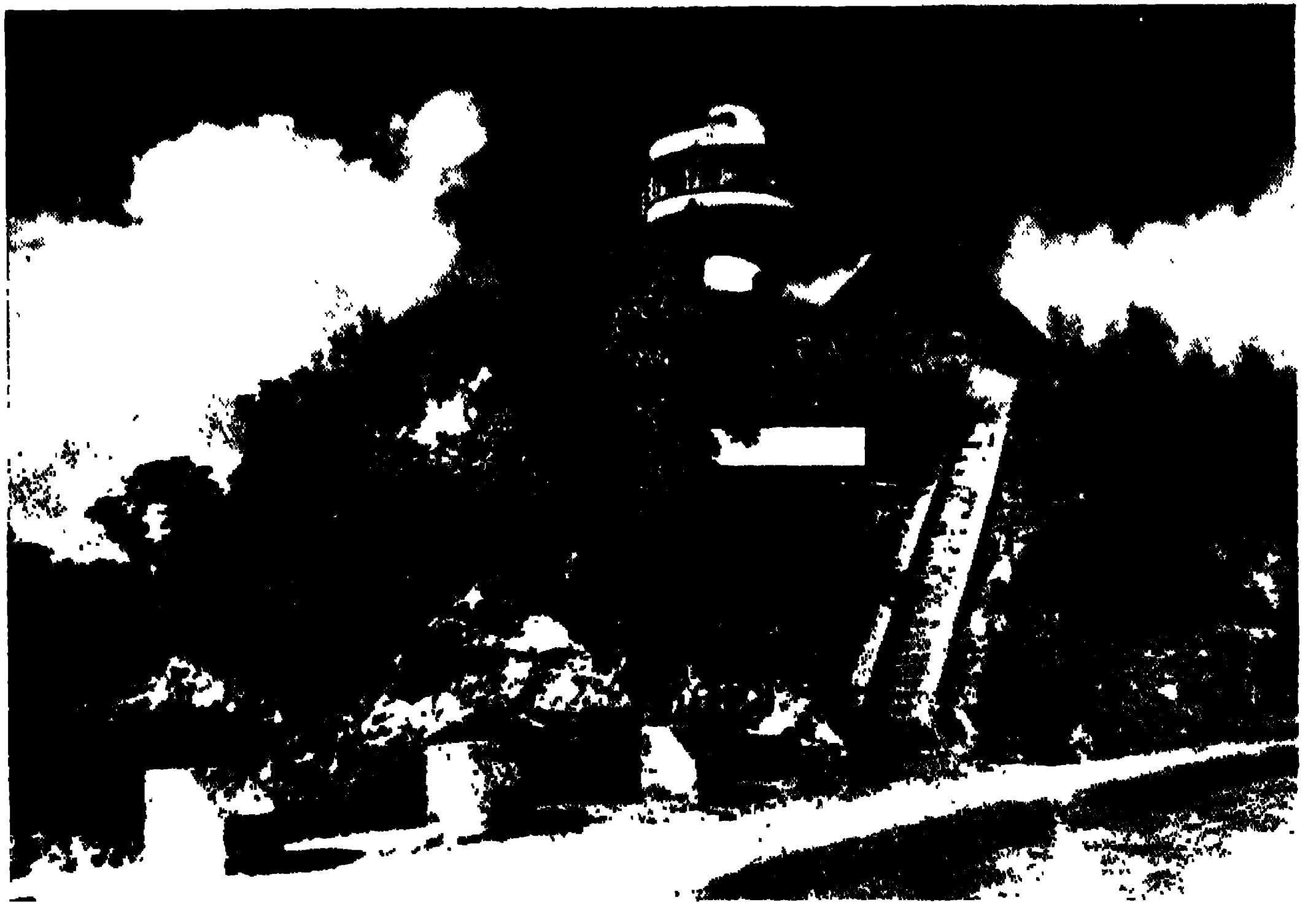
আকাশচুম্বী — দামন টাওয়ার, নেপাল। বিভাস চন্দ্র মিত্র ॥

আসুন মহীশূর দর্শনে

কুমার মুখোপাধ্যায়

সবুজ পাহাড়ের সারি, দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাভ অরণ্য, পুষ্পিত পর্ব্বতসানু, ইউক্যালিপ্টাস্-অর্জ্জুন-গুলমোহর শোভিত বীথিপথ, তরঙ্গায়িত শস্যশ্যামল প্রান্তর, গর্জ্জনে ভরা সফেন জলপ্রপাত, দেউলে দেউলে নাদস্বরমের উদাসী তান, কাবেরী-তুঙ্গভদ্রার শ্বেতজলধারা, অরণ্যে হাতীর পাল, সংরক্ষিত বনে চন্দনগাছের নেশাজাগানো গন্ধ, মেয়েদের খোঁপায় কনকচাঁপার শোভা — এমন একটি সুন্দর রাজ্যের নাম মহীশূর। সেই উত্তরে গোলগম্বুজের শহর বিজাপুর থেকে দক্ষিণে কাবেরীর উৎসভূমি কূর্গ অঞ্চল অথবা পশ্চিমে যোগ প্রপাতের কাছাকাছি তালগুপ্পা থেকে চলে যান পূবে কোলার স্বর্ণখনি এলাকায়—মহীশূর বিচিত্র, মহীশূর নয়নাভিরাম, মহীশূর পর্য্যটকের স্বর্গ! দক্ষিণের চারটি দ্রাবিড় রাজ্যের মধ্যে মহীশূর একক, মহীশূর স্বতন্ত্র। আপনি যান গুলবর্গায় কিংবা হাম্পিতে, ঘুরে বেড়ান উদিপি অথবা শৃঙ্গেরী মঠে, বেলুর, হালেবিড্ অথবা শ্রবণবেলগোলায় — খেয়াল খুসিতে দিনগুলো হারিয়ে আসুন। মস্ত বড় সোনালী জরি দেওয়া পাগড়ীর নীচে একটি হাস্যোজ্জ্বল কর্ণাটকী মানুষের মুখ সর্ব্বত্রই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। স্বচ্ছন্দগতি মেয়েরা 'বন্দনম্ স্বামী' বলে হাসিমুখে জানাবে অভ্যর্থনা।

বাংলাদেশ থেকে কিছুটা দূর বইকি! আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় দেড়হাজার মাইল দূর। তাতে হয়েছে কি? সময় সুযোগ করে চলুন যাই মহীশূরে। মস্ত বড় রাজ্য, তাই প্রথমেই চলুন রাজ্যের মধ্যমণি মহীশূর শহরে। উদাসী মনে ঘুরে বেড়াই কাবেরীর নুড়ি বিছানো তীরে তীরে, খুঁজে বেড়াই সেই সুপ্রাচীন 'মাহিষা' ভূমির পুরাকথা-কাহিনী আর কয়েকদিনের জন্য স্বপ্ন দেখি 'চামুণ্ডী' পাহাড়ের গিরিকন্দরে, ভালোলাগার রঙীন ফানুষগুলো উড়িয়ে দিই মহীশূরের নির্মেঘ নীল আকাশে।

চলুন, রাজধানী বাঙ্গালোর থেকে আশি মাইল পথ বাসে চেপে মহীশূর শহরে। বাঁদিকে টিপু সুলতানের সাধের রাজধানী শ্রীরঙ্গপাটনাকে রেখে, কাবেরীর দ্বিধাবিভক্ত জলধারাকে ডিঙ্গিয়ে একেবারে শহরের গোড়ায়, যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ফিলোমেনার গীর্জ্জা। ভারতে অনেক গীর্জ্জা আপনি দেখেছেন। কিন্তু নিশ্চয়ই এমনটি আর নজরে পড়েনি। ধূসর রঙের নিপুণ স্থাপত্যের এই বহুমুখী চূড়াবিশিষ্ট গীর্জ্জাটি শহরের সর্ব্বত্র থেকে নজরে আসে। ভেতরে যীশু ও মেরী মাতার বিশাল মূর্ত্তি আর রঙীন কাঁচে কত না কারুকাজ। আপনি মুগ্ধ হয়ে শুনছেন অর্গ্যানের উঁচু পর্দ্দায় ধর্ম্মসঙ্গীতের সুর আর বেরিয়ে যেতে যেতে শুনছেন উদাস করা ঘণ্টার ঢঙ্ ঢঙ্ শব্দ।

চার্চ্চ রোড দিয়ে হার্ডিঞ্জ সার্কেল ঘুরে বাস এল জমজমাট বাস আড্ডায়। আপনি যেন এককথায় দাক্ষিণাত্যের উদ্যান-শহর মহীশূরের রূপকথার রাজ্যে চলে এলেন। মেয়েদের পরনে চোখ ঝলসানো মহীশূরের রেশমী শাড়ীর বাহার আর পুরুষদের জরির পাগড়ী। ফুলের মেলা, ফুলের সমারোহ। ফুল পথের সাজানো উদ্যানে, ফুল পথের দোকানে, ফুল মন্দিরে দেবতার গলায়, কর্ণাটকী মেয়ের বেণীতে। উৎসব লেগেই আছে মহীশূরে। উপলক্ষ্য অনেক, তাই জাঁকজমকও অনেক। দিনের সূর্য্যালোকে ফুলের মেলা আর রাতের আঁধারে বিজলীর রঙীন খেলা। মহীশূর বলতেই মনে পড়ে দশেরা। সে এক রাজসূয় ব্যাপার! সাজানো হাতীর শোভাযাত্রা, মহারাজার ঝলমলে পোষাক, পাত্র-মিত্র, ফৌজ, লোক লস্করের মেলা। সারা ভারতের অগুন্তি মানুষের ভীড়। পথে হাঁটা দায়। পাঁচ টাকার হোটেল, তিরিশ টাকা! এক কাপ কফি বার আনা! কিন্তু কি দরকার আপনার ঐ ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার? আপনি অপরূপা মহীশূরের আত্মাকে আবিষ্কার করুন এই সুন্দর অক্টোবরের ঝকঝকে রোদের আলোয়, এই যুঁই আর মোতিয়া বেলের সুরভিতে, এই বন্ধুবৎসল কর্ণাটকী মেয়ে-পুরুষের চোখের তারায়।

আসুন, মহারাজার রাজপ্রাসাদে। বিশাল চত্বরের মাঝে 'ইন্দো-সেরাসিনিক্' স্থাপত্যশৈলীতে তৈরী প্রাসাদ। চারদিকে চার ফটকে অশ্বারোহী প্রহরা। উদ্যানে ফরাসী দেশের নানা ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি। বিশাল দেউড়িতে চারদিকে আঁকা রঙীন চিত্রের ছড়াছড়ি। কোষে বাঁধা তরবারি নিয়ে প্রহরীদের দৃপ্ত পদচারণা। কাঁধে লেখা 'হিজ হাইনেস্ মহারাজা অফ্ মাইশোর'। দশেরার ভীড়ে আগত গ্রামের হাজার হাজার মানুষ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের মহারাজার বৈভব।

কিন্তু এহ বাহ্য। আপনি মুগ্ধ হয়ে দেখছেন চামুণ্ডীশ্বরী রোডের ওপর জগন্মোহন প্রাসাদে। মহারাজার নিজস্ব দেশী বিদেশী বিপুল চিত্র সংগ্রহের প্রদর্শনী। ভারতে এমনটি আর কোথাও দেখেননি। ফ্রান্স থেকে আনা সেই ঘড়িটির সামনে সব সময় ভীড়। পনের মিনিট অন্তর যখন সুরেলা ঘণ্টা বাজে, তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একদল অশ্বারোহী পুতুল। আর প্রতি সেকেণ্ডের তালে তালে এক সৈন্য-পুতুল ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলেছে। সিলিঙে ঝুলছে মহারাজার বাইসন শিকারের স্মৃতিগুলো। কোথাও কর্ণাটকী বাজনার প্রদর্শনী, কোথাও চন্দন কাঠ আর হাতীর দাঁতের শিল্প সম্ভার। আপনি সর্ব্বত্রই খুশী মনে ঘুরছেন, কেবল অন্যমনস্ক হচ্ছেন সেই ছবিগুলার সামনে দাঁড়িয়ে — খোলা তরবারী হাতে লড়ছেন টিপু সুলতান একা ইংরেজের বিরুদ্ধে; তৃতীয়ার একফালি চাঁদের আবছা অন্ধকারে টিপুর মৃতদেহকে ঘিরে সৈন্যদের বিলাপ আর হারেমে বেগমদের বুকফাটা কান্না!

একটা সুন্দর প্রভাত বেছে নিন চামুণ্ডী পাহাড়ে যাবার জন্য। যেদিন ভোরের আকাশে একটুও মেঘ থাকবে না, প্রসন্ন সূর্য্যোদয় হবে পূব আকাশে শালীবাহন রোডের ওপর, সোনালী

আলো লুটোপুটি খাবে গাছ-গাছালিতে, সেদিন আপনি বাসে পাড়ি দিন সাত মাইল দূরে চামুণ্ডী পাহাড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে বাস ওপরে উঠছে, মাঝপথে পেরিয়ে গেল ললিতা মহল, রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা একটা ছোট টিলার ওপর। সাড়ে তিনহাজার ফিটের মাথায় বাস থেমে গেল মহারাজার বিশ্রাম নিবাস রাজেন্দ্র বিলাস প্রাসাদের সামনে। দূরে আবছা ছবির মত মহীশূর শহর। হরিতকী আর আমলকীর বন থেকে ঠাণ্ডা বাতাস মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে। সামনেই চামুণ্ডী দেবীর মন্দিরের অনুচ্চ গোপুরম্। পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ একরাশ মেঘ সাদা ধোঁয়ার মত সমস্ত মানুষকে ছেয়ে ফেললো। কেমন যেন ঠাণ্ডা সোঁদা গন্ধ, কোলের মানুষ দেখা যায় না। বেশ মজা লাগে। পাহাড়ের গা বেয়ে মেঘ উঠে আবার ওপার বেয়ে নিচে নেমে গেল। ঝলমলে সূর্য্যালোক আবার মন্দির চত্বরকে আলোময় করে তুললো। পুণ্যার্থীর মন নিয়ে দেবী দর্শনে চলেছেন আপনি। হাতে থালায় এলাচদানা, মিছরি, ভাঙ্গা নারকেল, মালা, ফুল আর ধূপ। দেবী কালো পাথরের অষ্টভূজা, ঠিক আমাদের মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। দক্ষিণ ভারতের বড় জাগ্রতা দেবী! পুত্রহীনাকে পুত্র দেন, ধনহীনকে ধন দেন, দুঃখীকে শান্তি সুখ। ভক্তের উপচার আর চোখের জলে নিয়ত অভিষিক্ত তাঁর রত্ন সিংহাসন। বিনিময়ে ভক্ত পায় পদ্মহস্তের বরাভয়।

মন্দিরের বাইরে দীর্ঘ সাপ হাতে নররূপী দানব মহিষাসুরের মূর্ত্তি। এখানেও সেই একই মহিষাসুর বধ করে দেবী চামুণ্ডীর রাজ্যে শান্তি স্থাপনের কাহিনী। তাই দেশের নাম 'মাহিষাউরু'। অর্থাৎ মহিষাসুরের দেশ। মাহিষাউরু আধুনিক রূপ নিলো মাইসোর বা মহীশূর। এবার পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালু গায়ের একহাজার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসুন সেই বিখ্যাত 'নন্দী' দেখতে। বিশাল ষোল ফিট উঁচু একখানা পাথর কেটে বার করা শিববাহন বৃষমূর্ত্তি নন্দী। গলায় সারি সারি মালা, নিচে ঘণ্টা বাঁধা। কালো পাথরের গায়ে অপূর্ব্ব সে সব কারুকাজ। ভক্তের দেওয়া কুমকুম্ আর ধূপের গন্ধে সুরভিত। বিশাল নীল আকাশের পটভূমিতে এত বড় বৃষমূর্ত্তি ভারতের আর কোথাও নেই। মহীশূর রাজ্যের প্রতীক নন্দী।

অপরাহ্ণের পড়ন্ত সোনালী রোদে যেদিন বাল্মিকী রোডের ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়বে আর পশ্চিম দিকের দিকচক্রবাল জুড়ে চক্রবাক পাখীর দল মালার আকারে উড়ে যাবে সেদিন আপনার ভারত বিখ্যাত বৃন্দাবন গার্ডেন্স্ যাবার দিন। বাসে চেপে চলুন পাহাড়ী পথ বেয়ে বারো মাইল দূরে কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ আর গার্ডেন্ দেখতে। বিশাল কাবেরীকে বাঁধে ধরা হয়েছে এখানে। মুগ্ধ দৃষ্টি আপনার চোখে। বাঁদিকে বিরাট জলাধার ডানদিকে স্লুইস্ গেট বেয়ে ক্ষীণ জলধারা বিশাল বিশাল পাথরের চাতাল বেয়ে ঝরছে। যতদূর দৃষ্টি চলে জলাধারের গভীর জল কানায় কানায়। পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্য সেই উথাল জলের ওপর চিক্‌মিক্ রূপোলী রেখা এঁকে খেলা করছে নিরন্তর। আপনার চোখে মুখে ভিজে বাতাস। বিরাট

সেই বাঁধের সিঁড়ি বেয়ে আপনি নিচে নেমে এলেন, পায়ে পায়ে চলেছেন বৃন্দাবন গার্ডেন্সে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিশাল বাঁধ আকাশে মাথা তুলে পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে গার্ডেন থেকে। যেদিকে তাকান, শুধু ফুলের মেলা। কত না মরশুমী ফুলের রঙবাহার, কতনা পাপড়ী আর গর্ভকেশরের খেয়ালী শোভা। ফোয়ারার ছড়াছড়ি। কেউবা বৃত্তকারে, কেউ চারকোণা আবার কেউবা সোজা উৰ্দ্ধমুখে জলধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। সেই জলে পড়ন্ত রোদের আলোয় সাতরঙা রামধনু। উদ্যানের মাঝে বিশাল জলাশয়, বুক চিরে চলে গিয়েছে কাঠের সেতু। মোগল উদ্যানের রীতিতে দু'পাশে পায়ে চলা পথ, মাঝে সারিবন্দী ফোয়ারা। দু'ধারে উঁচু চূড়ার ঝাউ আর পামবীথি। প্রত্যেকটি ফুলের কেয়ারীর ওপর রঙীন বিজলীর চাঁদোয়া।

অন্ধকার হতেই হাজার হাজার রঙীন আলোর মালা জ্বলে উঠলো। আপনার চোখের সামনে এক মায়ালোক সৃষ্টি হয়ে গেল এক লহমায়। শত শত রঙীন আলোর প্রজাপতিরা যেন ডানা মেলে উদ্যানময় নেচে বেড়াতে লাগলো। সে এক অভিনব বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জীবনে ভোলার নয়। এক কল্পলোকের মায়াপুরীতে হাজার হাজার মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো। সেই রঙীন আলোর ফোয়ারা, সেই ফুলের বাসরসজ্জা, সেই ঠাণ্ডা জলের মিঠে আমেজ, সেই ঝাউ-পামের মর্ম্মর কানাকানি, সেই সুবেশ নরনারীর জমজমাট মেলা, সেই নিথর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল, সেই হাজার মানুষের অব্যক্ত আনন্দ অনুভূতি—এরই নাম মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেন্স।

পুরো এক বেলা সময় নিয়ে চলুন দশ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গপাটনা। দ্বিধাবিভক্ত কাবেরীর মাঝের দ্বীপটিতে টিপু সুলতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপাটনা। টিপু আদর করে কাবেরীকে ডাকতেন 'দরিয়া দৌলত'—ঐশ্বর্য্যের নদী। নদীর তীরে তৈরী করেছেন গ্রীষ্মনিবাস। বিশাল চত্বরের ঝাউবীথি শোভিত পথ বেয়ে তাঁর প্রাসাদ। দেওয়ালে চিত্রিত করেছেন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের নানা কাহিনী। রাস্তার বাঁ ধারে জুমা মসজিদ, আকাশে মাথা তুলে চারটি মিনার। মিনারে উঠে আপনার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। প্রধান ফটক, দুর্গপ্রাকার, পরিখা, অস্ত্রভাণ্ডার, ইতস্তত ছড়ান কামান, বন্দীশিবির—ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে। সে সব অনেক কথা দু'শো বছর আগের সে এক বেদনাময় অধ্যায়! ছ' মাস শ্রীরঙ্গপাটনা অবরোধ করেও ইংরেজ দখল করতে পারলো না। এক বিশ্বাসঘাতক গুপ্ত-পথ দেখিয়ে দিল। দুর্ভেদ্য শ্রীরঙ্গপাটনা ধ্বংস হয়ে গেল। বীর সৈনিক টিপু একা খোলা তরবারী নিয়ে শেষ লড়াই করলেন। রক্তঝরা আহত টিপু টলতে টলতে একটা আমগাছের তলায়, কাবেরীতীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাতের অন্ধকারে ইংরেজ সে মৃতদেহ দেখে উল্লাস-ধ্বনি করলো। টিপুর দেহ থেকে তখনও তাজা রক্ত ঝরছে। হারেমে কান্নার রোল উঠল। বীর হায়দারের বীর পুত্র টিপুকে সমাহিত করা হ'ল পিতামাতার পাশে গুম্বজে—কাবেরীর দ্বিধারা সঙ্গমে। এখানেও ঝাউবীথি। এখানেও কিংখাবের ওড়নায় ফুল-ধূপের সুরভি। এখানেও সর্ব্বশক্তিমান

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। 'লায়-লাহা-ইল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা'। ঘর্ম্মাক্ত, রক্তাক্ত, পরিশ্রান্ত দুই স্বাধীনতার বীর সেনানীর ঘুম যেন না ভাঙে।

এই প্রার্থনা কাবেরীর আর এক তীরেও ধ্বনিত হচ্ছে। রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে। বিশাল মন্দিরে কালো পাথরে অনন্তশয্যায় শায়িত রঙ্গনাথবিষ্ণু। এখানেও ফুল, এখানেও মালা, এখানেও চন্দন-কুমকুমের সুরভি, এখানেও প্রার্থনা। 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়, গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ — '। পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান সেরে ভক্ত মানুষের নিত্যই যাওয়া আসা পূজার উপচার হাতে রঙ্গনাথ মন্দিরে।

দুর্গপ্রাকারের নিচে ভাঙা ঘাটে বসে আপনি কাবেরীকে দেখছেন। শ্বেতশুভ্র জলধারা বয়ে চলেছে কত মৃতের অস্থি নিয়ে, কত শ্মশানের শেষ শয্যা ধুয়ে নিয়ে, কত শস্যশ্যামল প্রান্তরের কোল ঘেঁসে। তীরের বাতাস টিপুর শেষ নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে আছে। পবিত্র কাবেরী। ব্রাহ্মণ আচমন করার আগে জলশুদ্ধি করেন, — 'গঙ্গেচ যমুনে চৈব, গোদাবরী সরস্বতী, নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরী'। সেই প্রাচীন ভারতভূমির কাবেরী। আপনার মনে পড়ছে এই মহীশূরেই কূর্গ অঞ্চলে মারকারা শহরের কাছে ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে এর উৎসের কথা। এক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের সুঁড়িপথ বেয়ে পাহাড়ের উঁচু চূড়োতে এক কমণ্ডলুর আকারের প্রস্রবণ থেকে কাবেরীর জন্মের কথা। কি অপূর্ব্ব মিল কাবেরীর জন্ম উপাখ্যানের সঙ্গে আজকের ভৌগলিক এই উৎসভূমির!

মারকারা শহর থেকে কিছু দূরে বিশাল ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের উঁচু চূড়োতে আজও আছে সপ্তর্ষি আসন। সাতজন মহাতেজা মুনির সাধন স্থান। সেই পুরাণের যুগের কথা। সাতজনের মধ্যে বশিষ্ঠ একজন। একটু নিচেই পাহাড়ের মাঝামাঝি আর এক গৃহস্থ মুনির কুটির। নাম তাঁর কাবেরা। কাবেরার কঠিন তপস্যায় ব্রহ্মা প্রীত হয়ে বর দিলেন —'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর। এছাড়া বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সেবার জন্য একটি সুলক্ষণা কন্যা দান করছি'। সেই হোমাগ্নির অনল থেকে এক শ্বেতাঙ্গী রূপসী তন্বী কিশোরী বেরিয়ে এসে মুনি কাবেরাকে পিতা সম্বোধন করলেন। কাবেরা আর তাঁর পত্নীর আনন্দ ধরে না। নিঃসন্তান কাবেরা লাভ করলেন ব্রহ্মার মানসকন্যা। কন্যার নাম হোল কাবেরী। কাবেরী পূজার ফুল তোলে, গাভীর পরিচর্য্যা করে, উদ্যান মার্জনা করে। সপ্তর্ষির আসন থেকে মুনি বশিষ্ঠ প্রত্যহ প্রত্যুষে দেখেন আলুলায়িত কুন্তলা কাবেরীকে। কেন জানি না, মুনির মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাধন ভজনের মধ্যেও গৌরাঙ্গী কাবেরীর মূর্ত্তি বশিষ্ঠকে বিব্রত করে। একদিন ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ বশিষ্ঠ সোজা নেমে এলেন কাবেরার কুটিরে। আপ্যায়নের পর কাবেরা বশিষ্ঠের আগমনের হেতু শুনতে চাইলেন। বশিষ্ঠ সসঙ্কোচে কাবেরীর পাণি প্রার্থনা করলেন। কাবেরা সানন্দে সম্মতি দিলেন। তবে কাবেরীর একটি শর্ত্ত—বশিষ্ঠ যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও কাবেরীকে সঙ্গছাড়া করেন, তবে তৎক্ষণাৎ কাবেরী স্বামীকে পরিত্যাগ করবেন।

এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন বশিষ্ঠ। গন্ধর্বমতে বিবাহের পর বশিষ্ঠ নিয়ে চললেন কাবেরীকে নিজের আশ্রমে। তবে অন্য ছ'জন মুনির কাছে এই ঘটনা প্রকাশে অনিচ্ছুক বলে লজ্জায় কাবেরীকে শ্বেত শুভ্র জলধারায় পরিণত করে ভরে নিলেন নিজের কমণ্ডলুতে। দিন যায়, বশিষ্ঠ কমণ্ডলুটি কখনও সঙ্গছাড়া করেন না। অন্য মুনিরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

একদিন বশিষ্ঠ তর্পণ করতে পাহাড় থেকে নিচে নদীতে নেমে এলেন। বিস্মৃত হলেন কমণ্ডলুকে সঙ্গে আনতে। দিন অতিক্রান্ত হ'ল। বশিষ্ঠ ফিরলেন না। এদিকে সেই ছ'জন মুনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বশিষ্ঠের গুহার আশ্রম থেকে সেই কমণ্ডলুর মুখ দিয়ে শ্বেত জলধারা নিঃসৃত হচ্ছে। সে জলধারা ক্রমে পর্ব্বতগাত্র বেয়ে নিচে রেখার আকারে নেমে আসছে। এদিকে তর্পণ পূজা সাঙ্গ করে খড়ম পায়ে বশিষ্ঠ উপর দিকে উঠে আসছেন অপরাহ্ণের বিষণ্ন বেলায়। লক্ষ্য করলেন পর্ব্বত উপত্যকায় সেই ক্ষীণ শ্বেতজলধারা। তিনি হাহাকার করে উঠলেন! কাবেরীর সেই কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। দ্রুত পায়ে চললেন আশ্রমে সেই কমণ্ডলুর কাছে। হতবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সেই ছ'জন মুনি। তাঁরা কিছুই জানলেন না, কিছুই বুঝলেন না, শুধু দেখলেন বৃদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী মহাতেজা মুনি বশিষ্ঠের দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে, অস্ফুট স্বরে বলছেন,—'হা কাবেরী - হা কাবেরী'!

ততক্ষণে কাবেরীর ক্ষীণ জলধারা প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত থেকে নিচে নেমে সমতল ক্ষেত্র বেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই শ্বেতাঙ্গী তন্বী কিশোরী কাবেরী, বশিষ্ঠ ঘরণী, গুহার আশ্রমের আশ্রয় ছেড়ে তখন চলেছেন শ্বেত অঞ্চল উড়িয়ে — কত হোমাগ্নির ভস্ম ধুয়ে, কত তপোবন পার হয়ে, কত দেশ জনপদ অতিক্রম করে, কত অরণ্য গিরিউপত্যকা, কত ঘুমের দেশ, কত আলোর রাজ্য পেরিয়ে, নুড়ি পাথরের মল বাজিয়ে শেষ অভিসারের আশায় — মহাসমুদ্রের বুকে।

.........ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই পথের উপর দিয়া একই নিঃশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। .....।...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ভ্রমণ

বিগত বছরে আমাদের সংস্থা মোট ন'টি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে। এর মধ্যে সাতটি কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় এবং অন্য দু'টি অনিবার্য্য কারণবশতঃ বাতিল হয়ে যায়। এই ভ্রমণের মধ্যে দু'টি ট্রেন এবং বাকী পাঁচটি বাসযোগে পরিচালিত হয়। আমাদের ভ্রমণের লেখাগুলি পরিচালকদের নিজস্ব — তাই সেগুলি মোটামুটি যথাযথ রেখে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

— সম্পাদক

প্রথম ভ্রমণ : **গিরিডি - উশ্রীপ্রপাত - পরেশনাথ পাহাড়** ॥ —প্রসূন দেব।

গত ১৪ই আগষ্ট ১৯৭০ তারিখে রাত্রি সওয়া দশটায় ৩৮ জন যাত্রী ও ২ জন হালুইকর বামুন সমেত এ্যাসোসিয়েশনের সামনে থেকে বাসযাত্রা শুরু হয়। রাত্রি দেড়টায় বর্দ্ধমানে পৌঁছই। বাসের অপর ম্যানেজার শ্রীঅজয় চক্রবর্ত্তী অসুস্থ হওয়ার ফলে আসানসোল থেকে বাড়ী ফিরে যান। ১৫ই আগষ্ট তারিখে সকাল পৌনে দশটায় গিরিডি পৌঁছই। সকাল সাড়ে দশটায় উশ্রী-প্রপাতের ধারে পৌঁছই। বেলা দু'টোর সময় উশ্রীপ্রপাতের ধারে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা পৌনে তিনটেয় মধুবনের পথে যাত্রা করি। বিকেল সাড়ে চারটের সময় মধুবনে পৌঁছই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় চা খেয়ে, রাত দশটায় রাতের খাওয়া শেষ করি। ১৬ই আগষ্ট ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠার জন্য এক পথ প্রদর্শক নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। পাহাড়ের শীর্ষে ওঠা হয় সকাল পৌনে আটটায়। প্রাতঃরাশ পর্বতশীর্ষে সমাধা হয়। সকাল পৌনে ন'টায় নীচে নামতে শুরু করি এবং বেলা সাড়ে এগারোটায় নীচে পৌঁছই। বিকেল তিনটেয় তোপচাঁচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করি এবং সাড়ে চারটে নাগাদ তোপচাঁচী পৌঁছই। বিকেল সওয়া পাঁচটা নাগাদ চা-পর্ব শেষ করে সন্ধ্যা সাতটায় মাইথনে পৌঁছই। রাত আটটায় মাইথন থেকে আসানসোলের পথে যাত্রা শুরু। রাত পৌনে ন'টা নাগাদ আসানসোলে পৌঁছে হোটেলে খাওয়া সেরে রাত দশটায় আসানসোল থেকে কোলকাতার পথে যাত্রা শুরু হয়। ১৭ই আগষ্ট ভোর সাড়ে চারটের সময় এ্যাসোসিয়েশনের সামনে বাস পৌঁছয়। এই যাত্রায় মাথাপিছু ব্যয় হয় বত্রিশ টাকা।

দ্বিতীয় ভ্রমণ : **কাশ্মীর ও অমৃতসর** ॥ — শম্ভুনাথ মুন্সী।

সংস্থার নির্দিষ্ট ভ্রমণ তালিকা অনুযায়ী ১৮ই অক্টোবর ১৯৭০ — কাশ্মীর ও অমৃতসর ভ্রমণ শুরু হয়। এই ভ্রমণে ১৭ জন অংশগ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে দুই জন অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া প্রথম শ্রেণীতে যান। আমি পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী হাজারীবাগ রোড ষ্টেশন হইতে ইহাদের সঙ্গে মিলিত হই। সংস্থা কর্তৃক আরোপিত নিয়মকানুন সকলের সামনে ব্যক্ত করি। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত মালপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া লই — পরে যাহা বহুক্ষেত্রে উপকার দিয়াছিল।

২০শে অক্টোবর পাঠানকোট পৌঁছাই। শ্রীনগর যাওয়া ও আসার বাসের টিকিট কাটিয়া রেলওয়ে ক্যান্টিন্-এ প্রাতঃরাশ সারিয়া বাসে চাপি। জম্মুতে দুপুরের আহার সারিয়া রাত্রিতে বাটোট পৌঁছাই। আমাদের আসিতে দেরী হওয়ায় ভাল জায়গাগুলি ভর্তি হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরু হইল। পথে বাস ড্রাইভারকে মাথাপিছু ১৲ টাকার বিনিময়ে ভেরীনাগ দর্শন করিলাম। শ্রীনগর পৌঁছিলাম বেলা তিনটায়। ট্যুরিষ্ট রিসেপসান সেণ্টারে খোঁজ নিয়া জানিলাম যে এদের সঙ্গে গুটি কয়েক হোটেল ও হাউস বোটের ভিতর ভিতর ব্যবস্থা আছে। তবে একটা কথা ওরা জানাইয়াছিল যে রাত্রি ৯টার মধ্যে কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ওদের হলঘরের মেঝেতে মাথাপিছু ১৲ টাকা দিয়ে রাত্রিবাস করা যায়। আমরা কয়েক জন লালচকের কাছাকাছি থাকিবার জন্য বাসস্থানের সন্ধানে চলিলাম। কারণ দৈনিক ভ্রমণের বাস ঐ অঞ্চল হইতে ছাড়ে। কাছেই ঝিলাম নদীর উপর একটি বড় হাউস বোট ঠিক করিলাম। পাছে পরে কোনরূপ গোলমাল হয় তাই বোটের মালিকের এগ্রিমেণ্ট ফরমএ লিখিয়া লইয়াছিলাম আমাদের কোন কোন সময় কি কি খাবার দেওয়া হইবে। এগ্রিমেণ্ট-এ লেখা ছিল শতকরা ৭৲ টাকা হিসাবে সার্ভিস চার্জ্জ দিতে হইবে।

সংস্থার ভ্রমণসূচী অনুযায়ী ২২ তারিখে ফিরিবার বাসের সিট ও ট্রেনের স্লিপার রিজার্ভ করা হইল। রেলওয়ে বুকিং এজেণ্ট, টিকিট প্রতি ৫০ পয়সা বেশী লইল। দৈনিক ভ্রমণের তালিকার কিছু পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাস কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট ভ্রমণ-তালিকা অনুযায়ী আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করিতে হইল। আমরা ঠিক করিলাম, একদিনেই পহেলগাঁও দেখিয়া ফিরিয়া আসিব। ইহাতে একদিন বাঁচিয়া যাইল বলিয়া সভ্যরা যুস্মার্গ যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা পুরণের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। পরে বাস কোম্পানীর বিশেষ ব্যবস্থায় গুলমার্গ পর্য্যন্ত বাস যাওয়ার পারমিট পাওয়া গেল। সুতরাং গুলমার্গ পর্য্যন্ত বাসের টিকিট কাটা হইল। এই ব্যবস্থায় সকল সভ্যই গুলমার্গ ও খিলেনমার্গের সৌন্দর্য্য ও মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করেন।

দৈনন্দিন ভ্রমণ বেশ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবেই হয়। বোট হইতে একটি লোককে আমাদের দুপুরের আহার বহিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করাতে প্রচুর সুবিধা হইয়াছিল। রবিবার ছাড়া মোগল গার্ডেন দেখিবার সুবিধা হয় না। কিন্তু ঐদিন কয়েকজন জিনিষ কিনিবার জন্য দেরী করায় তাহাদের বাদ দিয়া আর সকলে গার্ডেন দেখিতে যায়, পরে অবশ্য আর সকলকে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ঠিক এইরূপ অবস্থার জন্য অমৃতসরে দুর্গাবাড়ী দর্শন বাদ দিতে হইয়াছিল।

৩০শে অক্টোবর সকাল সাড়ে সাতটায় শ্রীনগর ছাড়িলাম। পরদিন ভোরবেলায় পাঠানকোট পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের কাছে ট্যুরিষ্ট হোটেলে দু'টি বড় ঘর ভাড়া লইলাম। প্রাতঃরাশ সারিয়া বাসে অমৃতসর যাত্রা করিলাম। দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া এবং কেনাকাটা করিয়া ফিরিলাম রাত দশটায়। ১লা নভেম্বর ফিরিবার দিন। সভ্যদের একজনের হাতে সব দায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়া আমি জ্বালামুখীর দিকে যাত্রা করিলাম। এই ভ্রমণে মাথাপিছু খরচ ধার্য্য হয় ২৯০৲ টাকা।

তৃতীয় ভ্রমণ : **আসাম** ॥ — দেবদাস লাহিড়ী।

বারোই নভেম্বর '৭০-এ বারোজন সদস্য (একজন মহিলাসহ) আসাম সফরে সকাল সাড়ে ছ'টায় হাওড়া থেকে ফারাক্কা প্যাসেঞ্জারে উঠে বসলাম। গাড়ী ঢিমে তালে চলে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ফারাক্কা হাজির হল। লঞ্চে চেপে ফারাক্কা পেরিয়ে খেজুরিয়া ঘাটে উঠে নিউবঙ্গাইগাও-এর গাড়ীতে চাপলাম। গাড়ী ছাড়লো রাত্রি সওয়া দশটায়। গাড়ীতে চলাকালীন খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব সমিতির ছিলনা। পরদিন দুপুর দেড়টায় নিউবঙ্গাইগাও ষ্টেশনে হাজির হলাম। এখান থেকে ছোট গাড়ী ধরে রাত্রি সাড়ে দশটার পর আমরা গৌহাটিতে নামলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হোটেল থেকে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে রাতের মত ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিলাম। ভোর বেলায় সিটি-বাস ধরে সর্বানন্দ পাণ্ডার আশ্রমে উঠলাম। গৌহাটির পূর্বে নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। অহোম রাজাদের রাজত্ব।

১৪।১১।৭০

কামাখ্যা একান্ন পীঠের এক পীঠ। এখানে সতীর দেহের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে মহামুদ্রা অর্থাৎ যোনি-অঙ্গ কামরূপে পতিত হওয়ায় এই দেবীস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কামাখ্যা এবং তাঁরই সংশ্লিষ্ট ভৈরব হলেন উমানন্দ। দেবীর যোনিমুদ্রা মহাপীঠ দশ ধাপ নীচে অন্ধকার গুহায়। চার বর্গ-ক্ষেত্র বিশিষ্ট শিলাপীঠ। সদাসর্বদা পাতাল থেকে জলধারা উঠছে, তাই কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল। যোনিমণ্ডলের দৈর্ঘ্য এক বাহু, প্রস্থে দ্বাদশাঙ্গুল এবং সপ্তশীতি ধনু পরিমিত রুক্ষরক্ত এবং সপুলক অষ্ট হস্ত ও পঞ্চাশ সহস্র পুলকান্বিত শিবলিঙ্গ যুক্ত। মাতৃঅঙ্গ বলিয়া অর্ধভাগ সোনার টোপরের উপর

কাপড় এবং পুষ্পমাল্যদ্বারা আবৃত ও সুশোভিত। দর্শন, স্পর্শন ও জপ পূজাদির জন্য একাংশ উন্মুক্ত রাখা হয়। এই মহাতীর্থ শক্তিপীঠ নামে খ্যাত। কামাখ্যা দেবী এখানে কুমারী রূপে বিরাজিতা। আমরা সবাই এখানে পূজা দিই। পূজা শেষে আমরা দশঅবতার মূর্ত্তি দর্শন করি। বিকালে আমরা গৌহাটি শহর ঘুরতে যাই। পান বাজার, ফ্যান্সি বাজার ঘুরে রাত্রে পাণ্ডার আশ্রমে ফিরে আসি।

১৫।১১।৭০

সকালে দুটা ট্যাক্সি নিয়ে দশমাইল দূরবর্ত্তী বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করতে গেলাম। এখানে দেহহীন বশিষ্ঠ-দেব ললিতা, কান্তা ও সন্ধ্যা এই ত্রিধারা প্রয়াগে ত্রিসন্ধ্যা করতেন। বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করে ও পূজা সেরে আমরা গাড়ীতে উঠে বসলাম। লক্ষ্য আমাদের উমানন্দ দর্শন। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে এসে দাঁড়ালাম। নৌকা করে ওপারে গেলাম। স্নান সেরে পাহাড়ের সোপান বেয়ে আমরা মন্দিরে এলাম। উমার প্রীতি বর্ধনের জন্য মহাদেব এখানে লিঙ্গরূপে বিদ্যমান। মন্দির মধ্যে অনাদি শিবলিঙ্গ ও রৌপ্য নির্মিত বৃষভবাহন পঞ্চবক্ত্র দশভুজ বিশিষ্ট উমানন্দের চলন্তা মূর্ত্তি। দর্শন শেষে ফিরে আসি। সন্ধ্যায় ভুবনেশ্বরী দর্শনে যাই। মহাগৌরী ভুবনেশ্বরী দর্শন করে। পাহাড়ের উপর থেকে বিজলী বাতিতে সাজান গৌহাটি শহর দর্শন করি। রাত্রি দশটায় বাস নিয়ে কাজিরাঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করি : ১৫৬ মাইল দূরত্ব।

১৬।১১।৭০

ভোর পাঁচটায় আমরা কাজিরাঙ্গা অরণ্যের ধারে এসে দাঁড়ালাম। অরণ্যে প্রবেশের একমাত্র বাহন হাতী। প্রতি হাতীতে তিনজন করে নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। নির্দ্দিষ্ট পথ নেই। দেড়তলা দোতলার সমান ঘাসে আমরা হারিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রথমে চোখে পড়লো একটা মরা বাইসন। কিছু পথ যেতে এক খড়গ বিশিষ্ট গণ্ডার জলাশয় থেকে উঠে আমাদের দিকে তেড়ে এল। বিশ্ববিখ্যাত বাইসন ও রাইনো দেখতেই অরণ্যে আসা। 'বন্যেরা বনে সুন্দর'। হাতী চারটা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করতে লাগলো। পশুরাজ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অরণ্যের মধ্যে ফিরে গেল। অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমরা শম্বর ও হরিণের পাল দেখলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা ভ্রমণের পর আমরা বাসে উঠে বসলাম। মাথাপিছু অরণ্যের জন্য ছয় টাকা ও হাতী বাবদ পাঁচ টাকা (মোট এগার টাকা) ফরেষ্ট অফিসারকে জমা দিয়ে, বাস ছুটে চল্লো গৌহাটির দিকে। ব্রেকফাষ্ট সঙ্গে না থাকায় আমাদের খুবই অসুবিধা হয়েছিল। দুপুরবেলায় নওগাঁওতে আহারাদি সেরে বেলা সাড়ে চারটায় গৌহাটি এসে পৌছলাম। সেখান থেকে শিলং অভিমুখে বিকাল পাঁচটায় যাত্রা শুরু করলাম। চৌষট্টি মাইল পথ। রাত্রি দশটায় শিলংয়ের নিউ হোটেলে এসে হাজির হলাম। রাত্রের আহারাদি সেরে শয্যা নিলাম।

১৭। ১১। ৭০

আজ বিশ্রামের দিন। শিলংয়ের বর্ত্তমান নাম মেঘালয়। আমরা বিশ্ববিখ্যাত গলফ্ ক্লাবের মাঠ, শিলং লেক দেখলাম। শিলং ছোট পার্বত্য শহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান।

১৮। ১১। ৭০

সকাল সাতটায় সিটিবাসে আমরা চেরাপুঞ্জি অভিমুখে যাত্রা করলাম। ত্রিশ মাইল পথ। আমরা চেরা বাজার ও রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে বিদ্যালয় দেখে, আরও তিন মাইল দূরবর্ত্তী মেসিনা ফলস্ দেখতে গেলাম। অজস্র ঝরণা চতুর্দিকে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। শীতকালে জলধারা খুবই শ্লথ। নির্জন জায়গা। এখানে কমলা মধু পাওয়া যায়। ফেরার পথে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় আমরা 'এ্যালিফ্যান্টা ফলস' দেখতে পেলাম। ঘন অরণ্যে হাতীর মুখের মত পার্ব্বত্য স্থান থেকে জল লাফিয়ে পড়ছে। দেখাশেষে ফিরে এলাম হোটেলে সাড়ে চারটায়। পরের দিন আমরা সতী ফলস্, বড়তালাও দেখলাম। বড়তালাও বিরাট জলাধার, এখান থেকে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি তৈরী করে সারা শহরে বিজলী দান করে। সব শেষে এলাম বিডন ও বিশপ ফলস্ দেখতে। জলের ধারা নেই বল্লেই চলে। ফল্স্ দেখতে এসে সত্যই ফলস্ খেলাম। রাত্রে আমরা শিলংয়ের বড়বাজার দেখলাম। এটা এক প্রমীলার রাজ্য। বাজারের সব দোকানীই সুন্দরী স্ত্রীলোক। অদ্যই শেষ রজনী। ২২শে নভেম্বর সকালে ফিরে এলাম নিজেদের ডেরায়। মাথাপিছু খরচ পড়ে ১৯৫৲ টাকা।

চতুর্থ ভ্রমণ : **রাঁচী-নেতারহাট-বেতলা** ॥ — অনিল ঘোষাল।

সমিতির নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণসূচী অনুযায়ী রাঁচী-নেতারহাট-বেতলার সংরক্ষিত বনভূমি অঞ্চলে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২২শে জানুয়ারী ১৯৭১ সালে। যথারীতি আমাদের রিজার্ভ করা বাস এসে হাজির হোলো উত্তরপাড়ায় সমিতির অফিসের বারান্দার নীচে। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। ঐদিনে আমাদের আর একটি দল চলেছিল ঐ অঞ্চলের দিকে তবে এরা বেতলা বনভূমি অঞ্চলে না গিয়ে রাজরাপ্পার পথে অর্থাৎ এক সঙ্গেই বার হয়ে দুটি বাস রাঁচী নেতারহাট ঘুরতে চলেছিল, পরিবর্ত্তনের মধ্যে হলো একটি যাবে বেতলা অঞ্চলে অপরটি যাবে রাজরাপ্পা। আমার ওপর ভার ছিল বেতলা অঞ্চলের বাসটি নিয়ে যাওয়ার অর্থাৎ ভ্রমণসূচীটি পরিচালনা করা। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় দু'খানি বাস হাওড়া ময়দানের পাশে এসে হাজির হলো এবং দু'খানি বাস এরপর থেকে সামনে পেছনে চলতে লাগলো। রাত্রি তিনটের সময় প্রায় একশ' কুড়ি মাইল পথ চলার পর বহরাগোড়াতে পৌছলাম এটি পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমানা। চেকপোষ্ট পার হবার কিছুক্ষণ পরে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম এবং আমাদের বাসের সামান্য যান্ত্রিক

গোলযোগ দেখা দিল. অপর বাসের পরিচালককে তাঁদের গাড়ীটি নিয়ে এগিয়ে যেতে বললাম পরে অবশ্য বাসটি চলার উপযোগী হয়ে ওঠায় এক সঙ্গেই আবার যাত্রা শুরু হলো।

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারী সকাল সাতটার সময় রঁাচী থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে আমরা প্রাতঃরাশ দেবার জন্য গাড়ী থামালাম এবং এখান থেকে চলার সময় আমরা খানিকটা আগেই যাত্রা শুরু করলাম কারণ ঐ দিন রঁাচী হয়ে আমাদের বিকেলের মধ্যে নেতারহাট পৌঁছনোর কথা। রঁাচীর মেন মার্কেটে বাস ষ্ট্যাণ্ডে যখন এসে পৌঁছলাম তখন প্রায় ন'টা বাজে। রান্না ইত্যাদি করার সুবিধা মত জায়গার বন্দোবস্ত করার জন্য ওরিয়েণ্টাল ইন্সিওরেন্সের অর্ধেন্দু বসুকে আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা হ'লে জানলাম যে তিনি অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। নিয়ে চললেন তিনি আমাদের একটি স্কুল বাড়ীতে। জিনিষপত্র বাসের মাথা থেকে নামিয়ে রান্নাবান্নার চেষ্টা চলতে লাগল। তাড়াতাড়ি খাওয়ার পর্ব সারতে হলো। বেলা একটার মধ্যে আমরা সবাই আবার বাসে চাপলাম, গন্তব্যস্থল নেতারহাট এবং সূর্য্যাস্তের মধ্যে পৌঁছন চাই। কিছুদূর গিয়েই রাজরাপ্পার বাসের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল ওঁরা হোটেলে খাওয়ার পর্ব সেরেছেন বলে জানলাম।

একটানা চলার পর আমরা লোহারডাগা এসে পৌঁছলাম. বেলা তখন প্রায় তিনটে, কাছের একটি চায়ের দোকানে তাড়াতাড়ি একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া গেল. বাসের চালক বাবু সিং তার সঙ্গীদের নিয়ে বেশ মেজাজের ওপর চা-পর্ব শেষ করল, মুখে তার হাসি ভাবটা যেন সে নেতারহাটেই সময় মত পৌঁছে গেছে। আবার চলা শুরু হল. ঘাট সেকশনের আঁকা বাঁকা সর্পিল পথ বেয়ে আমাদের নিয়ে গাড়ী ওপরের দিকে উঠতে লাগল। ক্রমশ বাসচালকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বোঝা গেল সে এ রাস্তায় চালানোয় অভ্যস্ত নয়। যাই হোক. আমরা ম্যাগনোলিয়া পয়েণ্টের একটু আগে বাস থামালাম।

ঐ সময়টা কয়েকটা ছুটির দিন থাকায় নেতারহাটে শত শত যাত্রীর সমাবেশ হয়েছিল. আমরা আগে থেকে যদিও বন্দোবস্ত করেছিলাম কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখি যে অফিসার বদলি হওয়ায় নতুন অফিসার এসে পুরানো কাগজপত্র না দেখেই আমাদের পাঠানো টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং "ঠঁাই নাই" এই বার্ত্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা খুবই সঙ্গীন! এই ঠাণ্ডায় পাহাড়ী জায়গায় এতগুলি লোকের দায়িত্ব! রাত্রের একটু আস্তানা যোগাড় করতেই হবে। অবশেষে পি. ডব্লু. ডি'র ইন্সপেকশন বাংলোর চৌকিদারের 'বিশেষ' চেষ্টায় রাতের থাকার জায়গা মিলল। বেশ বড় বড় দু'খানা ঘর আমরা পেলাম অবশ্য কিছু দর্শনীর বিনিময়ে। ইতিমধ্যে যাত্রীরা বাস নিয়ে এলেন; শুনলাম মেঘলা থাকায় ভালভাবে সূর্য্যাস্ত দেখা সম্ভব হয়নি। অবশেষে খাওয়া দাওয়া সেরে নিদ্রা দেবীর কোলে যখন আশ্রয় পেলাম রাত তখন প্রায় এগারোটা।

॥ যাত্রী ॥ — ॥ ভিন্নাম ॥

পরদিন, ২৪শে জানুয়ারী ভোর হবার আগেই সবাই উঠে পড়ল, উদ্দেশ্য সূর্য্যোদয় দেখা। বাংলোর বারান্দায় এসে দেখি কয়েকজন উৎসাহী ক্যামেরাম্যান তাঁদের যন্ত্র নিয়ে নাড়া চাড়া করছেন। অবশেষে সকলকে নিরাশ করে আবার মেঘ দেখা দিল এবং সূর্য্যোদয় যদিও হোলো তবে বেশ উঁচুতে মেঘের ওপরে।

আমরা এবার যাব বেতলা সংরক্ষিত বনভূমি অঞ্চলে (পালামৌ ন্যাশনাল পার্কে) নেতারহাট থেকে দূরত্ব প্রায় ১৪০ মাইল, দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা যখন যাত্রা শুরু করলাম বেলা তখন প্রায় বারোটা। বাস প্রথমে পাহাড়ী এলাকায় কিছুটা আস্তে চলা আরম্ভ করে বেশ জোরেই চলতে লাগল গন্তব্যস্থলের পথে। কিছুদূর চলার পরে লোহারডাগার কাছে দেখি এক বিরাট হাট বসেছে। কিছু জিনিষপত্র কেনার আশায় বাস থামালাম। দূর দূরান্ত থেকে আদিবাসীরা এসেছেন তাঁদের পশরা নিয়ে। মাইকে সস্তা হিন্দি গান বাজান হচ্ছে এবং শাক-সবজি, সূচ থেকে আরম্ভ করে গরু, মহিষ পর্য্যন্ত এখানে কেনা বেচা চলছে। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই দাবী তুললেন মুরগী চাই এবং এই হাটেই কেনার উপযুক্ত সময়। মনে মনে রেস্ত'র হিসাব করে দাবী মেনে নিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উৎসাহী সভ্য ছুটলেন। প্রায় ১০/১২ টা মুরগী বেশ সস্তাতেই পাওয়া গেল। বাস আবার চলা শুরু করল। কিছুদূর যেতে যেতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সংরক্ষিত বনাঞ্চলটি ডাল্টনগঞ্জের কিছুটা আগে কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আমরা রাস্তা ঠিক করতে না পেরে একেবারে ডাল্টনগঞ্জেই হাজির হলাম। রাস্তায় লোকেদের কাছে পথের নিশানা নিয়ে গাড়ী আবার পুরোনো পথেই চলল এবং প্রায় আধঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ রিজার্ভ ফরেষ্টের কাছে পৌঁছলাম। সঙ্গে দু'একজনকে নিয়ে প্রথমেই ফরেষ্ট অফিসারের খোঁজ করলাম। তিনি নেই তবে তাঁর প্রতিনিধি জানালেন যে আমাদের চিঠি ও টাকা তাঁরা পেয়েছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ঘরগুলি আমাদের থাকবার জন্য ঠিক করে তাঁরা অগ্রিম চেয়ে পাঠিয়েছিলেন সেইগুলির এখনও ছাদ তৈরী হয়নি! আমরা ত' এ খবর শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম! প্রতিনিধিটি জানালেন ফরেষ্ট অফিসার যে কিভাবে অগ্রিম টাকা চাইলেন তা তিনিও বুঝতে পারছেন না। সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি এই রাত্রে আমাদের আরও আট মাইল পথ গিয়ে 'চিপাধরে' অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ফরেষ্ট অফিসারের কাজের যা নমুনা পেলাম তাতে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার ভরসা পেলাম না। বন বিভাগের কর্মচারীদের একটু মাথা গোঁজার বন্দোবস্ত ও বনের ভিতর প্রবেশ করবার জন্য অনুরোধ জানালাম। তিনি অবশ্য সাধ্যমত চেষ্টা করে একটি ভাঙ্গা গুদাম ঘরের কিছুটা অংশ আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। তাতেই রাতের রান্নার চেষ্টা চলল এবং আমরা বনের ভিতরে প্রবেশ করবার জন্য জীপ গাড়ীর খোঁজ করতে গেলাম। সেইদিন ভারতীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের একজন উচ্চ পদস্থ মহিলা অফিসার এসেছিলেন। একমাত্র জীপ গাড়ীটি তাঁর

পিছনেই ছুটাছুটি করছে অবশেষে সব ভাবনার অবসান হল, যখন জানলাম গাড়ীটি বনের মধ্যে হাতীর তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে বিকল হয়ে বসে আছে এবং চালক ও অন্যান্য যাত্রীরা কোনো রকমে ফিরে এসেছেন। রাত্রের মধ্যে গাড়ী আর চালু হল না। আমরাও কোন রকমে প্রায় বিকল অবস্থায় রাত্রি কাটালাম। অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যই অবস্থাটা বুঝলেন এবং নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিলেন ও মনে মনে বিহার সরকারের বন বিভাগের মুণ্ডপাত করলেন।

পরদিন একবার বাস নিয়ে বনের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বাস চালক বাবু সিং যার এতক্ষণ মুখে কথার খই ফুটছিল, ভয়ে চুপসে গেল, কিছুতেই তাকে রাজী করানো গেল না। অগত্যা ফেরার পথে রাঁচীর দিকে যাত্রা করলাম। একটানা চলার পর বেলা প্রায় এগারোটার সময় হুণ্ডরুতে এসে বাস থামল। গতকালের মুরগী নিয়ে কয়েকজন কাটাছেঁড়া করতে লাগলেন এবং কয়েকজন জলপ্রপাতের শোভা দেখতে ও স্নান পর্ব শুরু করলেন। বেলা প্রায় দুটোর সময় রান্না শেষ হল 'আইটেম'টা মনোমত হওয়ায় গত রাত্রের কষ্ট ও আফ্‌শোষের কিছুটা যেন লাঘব হল। আবার চলা আরম্ভ হল জোন্‌হার দিকে এবং সন্ধ্যার একটু আগেই মনোরম পরিবেশে আমরা সকলেই এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটুকু পুরোমাত্রায় উপভোগ করলাম। ফেরার পথে রাঁচীতে রাত্রের খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ থেমে আবার ফিরতি পথ ধরলাম।

পরদিন অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী হাওড়া ময়দানে এসে সকাল আটটার সময় যাত্রা শেষ করলাম। এই ভ্রমণে ১ জন মহিলা সমেত মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। খরচ পড়েছিল সদস্যদের জনপ্রতি ৫৮ টাকা ও অতিথিদের জন্য ৬০ টাকা। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই ভ্রমণসূচীটি সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছিল।

পঞ্চম ভ্রমণ : **রাঁচী-নেতারহাট-রাজরাপ্পা** ॥ — হিমাদ্রি চৌধুরী

২২শে জানুয়ারী রাত ১০-৩০ মিনিটে আমাদের সংস্থার দু'টি বাস হাওড়া ময়দানে একত্র হয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রথম বাসটির রাঁচী, নেতারহাট ও বেতলা ফরেষ্টে ও দ্বিতীয় বাসটির রাঁচী, নেতারহাট ও রাজরাপ্পায় গন্তব্যস্থল ছিল। প্রথমে স্থির হয় দু'টি বাসই একত্রে রাঁচী পর্য্যন্ত যাবে ও সেখান থেকে প্রথম বাসটি সোজা নেতারহাট চলে যাবে ও দ্বিতীয় বাসটি একদিন রাঁচীতে অবস্থান করে নেতারহাট যাবে।

পরদিন সকাল ছ'টায় রাঁচী থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল আগে কাঁচী নামক স্থানে চায়ের জন্য সাময়িক বিশ্রাম নেওয়া হয়। এইখানেই প্রথম বাসটির থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। প্রাতঃরাশের পর

॥ যাত্রী ॥ — ॥ পঞ্চান্ন ॥

আমরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করি ও রাঁচীতে পৌঁছই সকাল সাড়ে দশটার সময়। পথিমধ্যে আমাদের বাসে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়।

রাঁচীতে আমাদের বাসস্থান ঠিক করতে একটু সময় লাগে। আমাদের যাত্রীদের মধ্য থেকে একজনের চেষ্টায় একটি সুন্দর বাংলো পাওয়া যায়।

মধ্যাহ্নে একটি হোটেলে আমাদের দুপুরের খাওয়া সেরে হুণ্ডরু ও জোন্‌হা ফল্‌স্ অভিমুখে যাই। হুণ্ডরু পৌঁছতে আমাদের বেলা তিনটে বেজে যায়। যাত্রীদের অনেকেই একেবারে নীচে, যেখানে ওপর থেকে জল এসে পড়ছে সেখানে চলে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। এখানে প্রায় দু' ঘণ্টা থাকার পর আমরা জোন্‌হাতে যাই। জোন্‌হা পৌঁছতে সন্ধ্যা হওয়ার জন্য আমরা বেশীদূর যেতে পারিনি। এরপর আমরা রাঁচী ফিরে এসে আহার করে শুয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে রাঁচীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়। রাঁচী হিল্‌স্, পাগলা গারদ, বাজার ইত্যাদি ঘুরিয়ে এনে আমরা খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেতারহাট অভিমুখে রওনা হই বেলা বারোটার সময়। নেতারহাট যাওয়ার পথে একটি হাট থেকে কিছু মুরগী কেনা হয় পরদিন রাজরাপ্পায় পিক্‌নিক্ করার উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার অনেক আগেই ম্যাগ্নোলিয়া পয়েণ্টে সূর্য্যাস্ত দেখবার জন্য আমাদের সদস্যরা এসে সমবেত হন। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় সূর্য্যাস্ত দেখা সম্ভব হয়নি।

রাত্রে ট্যুরিষ্টস্ বাংলোতে একটি মাত্র ঘর পাওয়া যায় অনেক কষ্টের পর। সেইখানে কিছু যাত্রী ও বাকী বাসের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা হয়। কোনরকমে খাওয়া সেরে আমরা বিশ্রাম নিই।

২৫শে ভোরে সবাই উঠি। কিন্তু এদিনও আকাশ পরিস্কার না থাকায় সূর্য্যোদয় দেখার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হই। ফেরার পথে খানিকক্ষণের জন্য সূর্য্যোদয় দেখি। লোহারডাগায় এসে আমরা প্রাতঃরাশ করি। রাজরাপ্পায় পৌঁছতে বিলম্ব হবে জেনে রাঁচীতে ফিরে এসে আর একবার জলযোগের বন্দোবস্ত হয়।

দুপুর দু'টায় আমরা রাজরাপ্পায় এসে পৌঁছই। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সবারই খুব ভাল লাগে। যাত্রীদের অনেকে ছিন্নমস্তার মন্দিরে যান ভেরা নদী অতিক্রম করে আবার অনেকে ভেরা ও দামোদরের সঙ্গমে বসে সৌন্দর্য উপভোগ করেন। চারটের মধ্যে রান্না শেষ হয় বৃষ্টির মধ্যে। এরপর খাওয়া সেরে যাত্রা শুরু করি সন্ধ্যা ছ'টার সময়। রাত ন'টার সময়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমরা ধানবাদ এসে পৌঁছই। এখানে ড্রাইভার পথের নিশানা ঠিক করতে না পারায় প্রায় দু'ঘণ্টা আমরা ধানবাদের মধ্যে ঘুরি। বরাকরের সীমানা অতিক্রম করে চা পানের বিরতির প্রয়োজন হয়।

কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার জন্য নামা সম্ভব হয়নি। বাস পুরোদমে ছুটে আসানসোল অতিক্রম করার পর যাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হয় চায়ের জন্য। কিন্তু বৃষ্টির জন্য কিছুই করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে বর্ধমানে চা ও জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়। বর্ধমান থেকে রাত্রে যাত্রা শুরু করে ভোরে আমরা উত্তরপাড়ায় এসে পৌঁছই। এই ভ্রমণে ১৩ জন মহিলা সমেত ৩৮ জন যাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জনপ্রতি ব্যয় হয়, সদস্যদের ৫৬৲ টাকা ও অতিথিদের ৫৮৲ টাকা।

ষষ্ঠ ভ্রমণ : **জয়রামবাটি-কামারপুকুর-বিষ্ণুপুর যাত্রা** ॥ — বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি এগারোটায় বাসে ছত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। রাত্রি আড়াইটায় আরামবাগে চা পান করে ভোর সাড়ে তিনটায় পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর পৌঁছই। সেখানে ভোরের আরতি ও সমস্ত পবিত্র দর্শনীয় স্থান দেখে আঠাশ তারিখে সকাল সাড়ে ছ'টায় জয়রামবাটির পথে বাস যাত্রা করে। পথে বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের যাত্রা কিছু শ্লথ হয়ে যায়। সেখানে প্রাতঃকালীন জলযোগ ও চায়ের ব্যবস্থা হয়। শ্রীমার জন্মভূমি দর্শন করে সকাল সাড়ে আটটায় বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। সাড়ে ন'টায় বিষ্ণুপুর পৌঁছই। বিষ্ণুপুরে মন্দিরের টেরাকোটার কাজ ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন সেরে লাল-বাঁধের ধারে বেলা দেড়টায় মধ্যাহ্ন ভোজন হয় এবং বেলা তিনটায় উত্তরপাড়ার পথে বাস যাত্রা করে। পথে আরামবাগে বৈকালিক জলযোগ ও চা পান হয় এবং রাত্রি সাড়ে আটটায় এ্যাসোসিয়েশনের অফিসের সামনে বাস থামে। এই যাত্রায় মাথা পিছু ধার্য্য হয় সভ্যদের ১৪৲ টাকা ও তদীয় অতিথিদের ১৫৲ টাকা।

সপ্তম ভ্রমণ : **নেপাল** ॥ — সৌম্যেন ব্যানার্জী

এ বছরের সর্বশেষ ভ্রমণ নেপাল — ট্রেন যোগে। ১৩ই মার্চ্চ, শনিবার রাত দশটা পঁচিশ মিনিটে মিথিলা এক্সপ্রেসে সমস্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করি। গাড়ী অতিরিক্ত বিলম্বে চলার দরুণ আমরা পরের দিন বিকেল সাড়ে চারটায় সমস্তিপুর পৌঁছই। রাত দশটা নাগাদ মিটার গেজে সমস্তিপুর থেকে যাত্রা করে দ্বারভাঙ্গা হয়ে পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চ্চ সকালে রক্সৌল স্টেশনে আসি। আমাদের এই ভ্রমণে একজন ব্যবস্থাপক আগে থেকে কাঠমাণ্ডু যাবার জন্য বাসের বন্দোবস্ত ক'রে রাখেন। এবং আমাদের জন্য তিনি ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকেন। ট্রেন নির্ধারিত সময়ের প্রায় বার ঘণ্টা বিলম্বে চলার দরুণ রক্সৌল ষ্টেশনে আমাদের অত্যধিক তাড়াহুড়া করতে হয়। রিক্সা ও টাঙ্গা সহযোগে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারত-নেপাল চেকপোষ্টে হাজির হই। সহৃদয়

কর্ম্মচারীগণ আমাদের জিনিসপত্র নামমাত্র পরীক্ষা করে ছেড়ে দেন। আস্তে আস্তে আমরা নেপাল-ভারত চেক্ পোষ্ট বীরগঞ্জে প্রবেশ করি। এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর আমরা পূর্বব্যবস্থামত পশুপতিনাথ ট্র্যাভেলস্ কোম্পানীর বাসে বেলা ন'টায় কাঠমাণ্ডুর পথে যাত্রা করি। সাড়ে তিনটা নাগাদ আমরা দামান্ টাওয়ারে আসি। বৃষ্টি ও অত্যধিক ঠাণ্ডার দরুণ দামান্ টাওয়ারের ওপর ওঠা সম্ভব হয়নি। ঝোড়ো হাওয়া ও সামান্য বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ কাঠমাণ্ডু বাস স্ট্যাণ্ডে পৌছই। এ্যাসোসিয়েশন থেকে পূর্বেই কয়েকটি হোটেলে চিঠি দেওয়া ছিল। আমরা সেইমত স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি নিউ সেণ্ট্রাল লজে থাকবার ব্যবস্থা করি।

পরের দিন ১৬ই মার্চ্চ সকালে আমরা রিজার্ভ মিনি বাসে বাগমতির তীরে শ্রীপশুপতিনাথ ও শ্রীগুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির দর্শন করতে যাই। দুপুরে সারভিস বাসে করে হোটেলে চ'লে আসি। বিকেলে সভ্যগণ নিজেরাই রত্না পার্ক, রাজপ্রাসাদ, ইন্দ্র চক্ এবং হনুমান ধোকা ইত্যাদি দেখেন। ১৭ই মার্চ্চ বেলা সাড়ে বারোটায় আহারাদি সেরে মিনি বাসে করে ভাতগাঁও (ভক্তপুর) ও পাটানের (ললিতপুরের) পথে যাত্রা করি। এই দু'টি জায়গায় বহু প্রাচীন মন্দির আছে। ভারত-চীন শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঐ মন্দিরগুলি। ভক্তপুরে সিধাপোখরি, রাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদের স্বর্ণফটক, ললিতপুরে কৃষ্ণ মন্দির, মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির ইত্যাদি দর্শনযোগ্য। ফেরার পথে বোধনাথ, স্বয়ম্ভূনাথ, বিমানঘাঁটি ও বালাজু গার্ডেন দেখে সন্ধ্যায় চলে আসি। রাস্তা খারাপ থাকার দরুণ বুঢ়া নীলকণ্ঠ দেখা সম্ভব হয়নি। দু'দিনেই মোটামুটিভাবে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ভ্রমণ-সূচী শেষ হয়।

অংশগ্রহণকারী সভ্যগণ, ব্যবস্থাপকদের 'দক্ষিণা কালী' ও 'নাগরকোট' দেখাবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁরা সমস্ত প্রকার সহযোগিতা করতে রাজী হন। ১৮ই মার্চ্চ বেলা আটটায় একটি মিনি বাস রিজার্ভ করে নেপালের সবচেয়ে জাগ্রতা দেবী 'দক্ষিণা কালী' দর্শন করতে বের হই। আমাদের জন্য আরেকটি স্টেশন ওয়াগন রিজার্ভ করা ছিল। স্টেশন ওয়াগনটি দেরীতে আসায় পথে খানিকক্ষণের জন্যে একটি হোটেলে অপেক্ষা করতে হয়। যা হোক, প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ দশ মাইল দূরে 'দক্ষিণা কালী' দর্শনের জন্যে যাত্রা করি। 'দক্ষিণা কালী' থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে স্টেশন ওয়াগনটি যান্ত্রিক গোলোযোগের জন্য অচল হ'য়ে পড়ে। মিনি বাস গন্তব্যস্থানে চলে যায়। তাই একটি যাতায়াতকারী ট্যাক্সী ড্রাইভার মারফৎ মিনি বাসের ড্রাইভার খবর পেয়ে সংগে সংগে গাড়ী নিয়ে চলে আসেন এবং আমাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যান। সোনা দিয়ে মোড়া ৺মায়ের মূর্ত্তি ঠিক ৺কালী বলে মনে হয়না। পাশাপাশি গণেশ এবং আরও কিছু বিগ্রহ আছে। অনেকেই মন্দিরে পুজো দিলেন। পাণ্ডার কোন বালাই নেই। এখানে মোষ, ছাগল, মুরগী ও মুরগীর ডিম বলি হয়। আমাদের একজন সভ্যার শাড়িতে হঠাৎ প্রদীপের

আগুন লেগে যায়। হাত দিয়ে নেভাবার জন্য ডান হাতটি তাঁর পুড়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের যথাসম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসায় সাহায্য করেন। আমরা কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে মিনি বাসে তুলে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে কাঠমাণ্ডুর প্রখ্যাত 'বীর হসপিট্যালে' নিয়ে যাই। মিনি বাস আবার আমাদের অবশিষ্ট সভ্যদের আনবার জন্য দক্ষিণা কালী যাত্রা করে। বেলা তিনটায় অবশিষ্ট দল হোটেলে ফিরে আসে। ১৯শে মার্চ ভোর চারটায় মিনি বাস ও একটি ষ্টেশন ওয়াগনে চার মাইল দূরে মাউণ্ট এভারেস্ট ও অন্যান্য পর্বত শিখর ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দর্শনের জন্য যাত্রা করে প্রায় সূর্যোদয়ের আগে পৌঁছই। আকাশ খুব পরিস্কার থাকায় আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য ভালভাবেই দর্শন করে চা, জলযোগ সেরে বেলা আটটায় রওনা হয়ে ন'টায় হোটেলে ফিরে আসি। পরের দিন, ২০শে মার্চ, সকাল ৭-৩০ টায় বাসযোগে রক্সৌল যাত্রা করি। পথে দামান্ টাওয়ারে ওঠা হয় এবং সন্ধ্যায় বীরগঞ্জ চেক্‌পোস্ট চলে আসি। চেক্‌পোস্টের ঝামেলা মিটিয়ে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ রক্সৌল ষ্টেশনে আসি। রাত দশটায় ট্রেনে চেপে সকালে দ্বারভাঙ্গায় গাড়ী বদল করে বেলা দশটা নাগাদ সমস্তিপুর যাই। সারাদিন সমস্তিপুরে কাটিয়ে সন্ধ্যায় মিথিলা এক্সপ্রেসে গাদাগাদি করে বসে পরের দিন অর্থাৎ, ২২শে মার্চ হাওড়ায় পৌঁছই। গাড়ী ঘণ্টা চারেক দেরীতে চলার জন্য হাওড়ায় পৌঁছতে বেলা চারটে বেজে যায়। এই ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী সকল সভ্যরা আমাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। এই ভ্রমণে ১২ জন মহিলা সহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। জনপ্রতি টাকা ধার্য্য ছিল ১৫০৲ টাকা (সভ্যদের ক্ষেত্রে) এবং অতিথিদের জন্য ১৫৩৲ টাকা। যাতায়াতের পথে আহার ও আনুসঙ্গিক খরচ বাদে।

॥ একাদশ বার্ষিক সংকলন, তেরশ' উনআশী ॥

গ্রন্থনা

মনোমোহন ঘোষ

প্রচ্ছদ

রথীন দাস

॥ আমাদের সমিতির লক্ষ্য ॥

- ভারতের যে কোনও প্রান্তে পর্যটন ও অভিযানকে সংগঠিত করা এবং উৎসাহ দেওয়া—

- সমিতির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্যদের মধ্যে পর্যটন সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা —

- পর্যটন সম্বন্ধে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং সভা ও সম্মেলন আহ্বান করা —

- সদস্যবৃন্দ, শুভাকাঙ্খী ও জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ভাব-বিনিময় ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা —

- পর্যটনে উৎসাহদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যয়ের পর্যটক নিবাস নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা —

- ভারতে পর্যটন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও মত বিনিময় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুশীলন করা। এ কাজে পর্যটক, বিভিন্ন ভ্রমণ-রসিক ও সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা —

- সমিতির সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করা —

- দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থাপনা এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা —

মুখভাষণ

১লা মে ইতিহাসের এক বিশেষ চিহ্নিত দিন। ১৯৬০ সালের ঐ বিশেষ দিনে জন্ম নিয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন। তারও নিজস্ব ইতিহাস আছে দীর্ঘ বারো বছরের। নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও এ্যাসোসিয়েশন তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের সংস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে পর্য্যটক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই বারো বছরের সুদীর্ঘ পথচলা সার্থক হয়ে উঠল তার নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য জমি কেনার মধ্য দিয়ে। সভ্যদের মিলিত চেষ্টায়, আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সমিতির নিজস্ব গৃহনির্ম্মান করা সম্ভব হবে। ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকের সংগ্রহে আমাদের সংস্থা বৈশিষ্টের দাবী রাখে।

গত বারো বছরে 'যাত্রী'তে নানা ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিকে বর্তমান সংখ্যার শেষে রাজ্য বা অঞ্চল হিসাবে ভাগ করে এক বিশেষ সূচীর সংকলন সংযোজিত করা হোল। আশাকরি এই 'সূচী' ভ্রমণ-পিপাসু পাঠকদের মনের খোরাক যোগাবে। বর্তমান সংখ্যা ''যাত্রী''কে নানা রচনা সম্ভারে সাজিয়ে সভ্যদের হাতে তুলে দেওয়া হোল। নতুন রাষ্ট্র 'বাংলা-দেশে'র ওপর এবার দু'টি রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। যাত্রীদের কাছে ভ্রমণের একটা নতুন দিক খুলে গেল। আশাকরি আমাদের

সমিতির সদস্যদের এবার ওপার বাংলার আসল রূপ দেখা সম্ভব হবে।

গত ১৩ই মে ১৯৭২ থেকে ২০শে মে ১৯৭২ এ্যাসোসিয়েশনের দ্বাদশ-বর্ষ পূর্তি উৎসব উত্তর-পাড়ায় জয়কৃষ্ণ পাঠাগার ভবনে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও ভ্রমণ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের কলকাতা শাখার সহকারী-অধিকর্তা শ্রী এ, কে, মিত্র মহাশয়। ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভ্রমণরসিক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল ও শ্রীকুমারেশ ঘোষ মহাশয়।

১৪ই মে, ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের সৌজন্যে ও ১৭ই মে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সৌজন্যে ভ্রমণ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২০শে মে, ইউথ হোষ্টেলস্ এ্যাসোসিয়েশন ও গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার্স এক্সপ্লোরেশন সংস্থার সৌজন্যে স্থির তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। সমিতির সভ্যদের তোলা বহুবিধ ভ্রমণ বিষয়ক আলোকচিত্র উক্ত প্রদর্শনীতে জনসাধারণের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে আলোকচিত্র শিল্পী শ্রীভূপেন রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

সভ্যদের মিলিত চেষ্টায় এবং পাঠাগার কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতায় এই উৎসব পালন করা সম্ভব হয়। আগামী দিনেও সকলের সহযোগিতার আশা নিয়ে 'যাত্রী'ও তার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাবে এই কামনা করি।
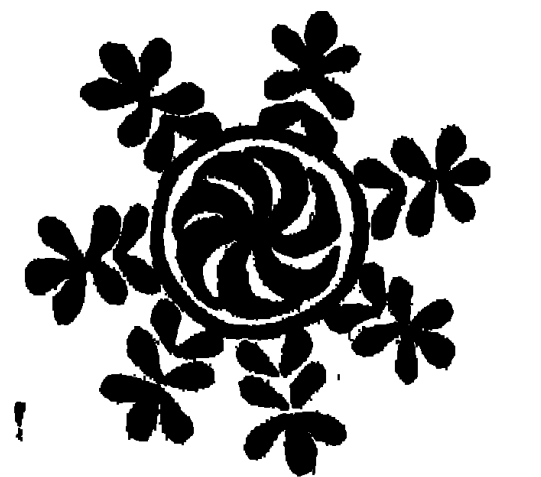
ঃ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন ঃ

১৯৭১ — '৭২ সালের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ

বাঁ দিক থেকে (বসে) — সর্বশ্রী অনিল ঘোষাল (সম্পাদক), ডাঃ নিরঞ্জন বসু (সহঃ সভাপতি), তরুণ কুমার রায় (সভাপতি), শম্ভুনাথ মুন্সী (সহঃ সভাপতি), সমরেশ চট্টোপাধ্যায় (সহঃ সম্পাদক)।

বাঁ দিক থেকে (দাঁড়িয়ে) — সর্বশ্রী প্রসূন দেব, শিবনাথ পাঁজী, মনোমোহন ঘোষ, কুমার মুখোপাধ্যায়, দেবদাস লাহিড়ী।

ভাস্কর - ছন্দ

যুগল স্তম্ভ — শ্রীরঙ্গম।

ত্রিদিব ঘোষ॥
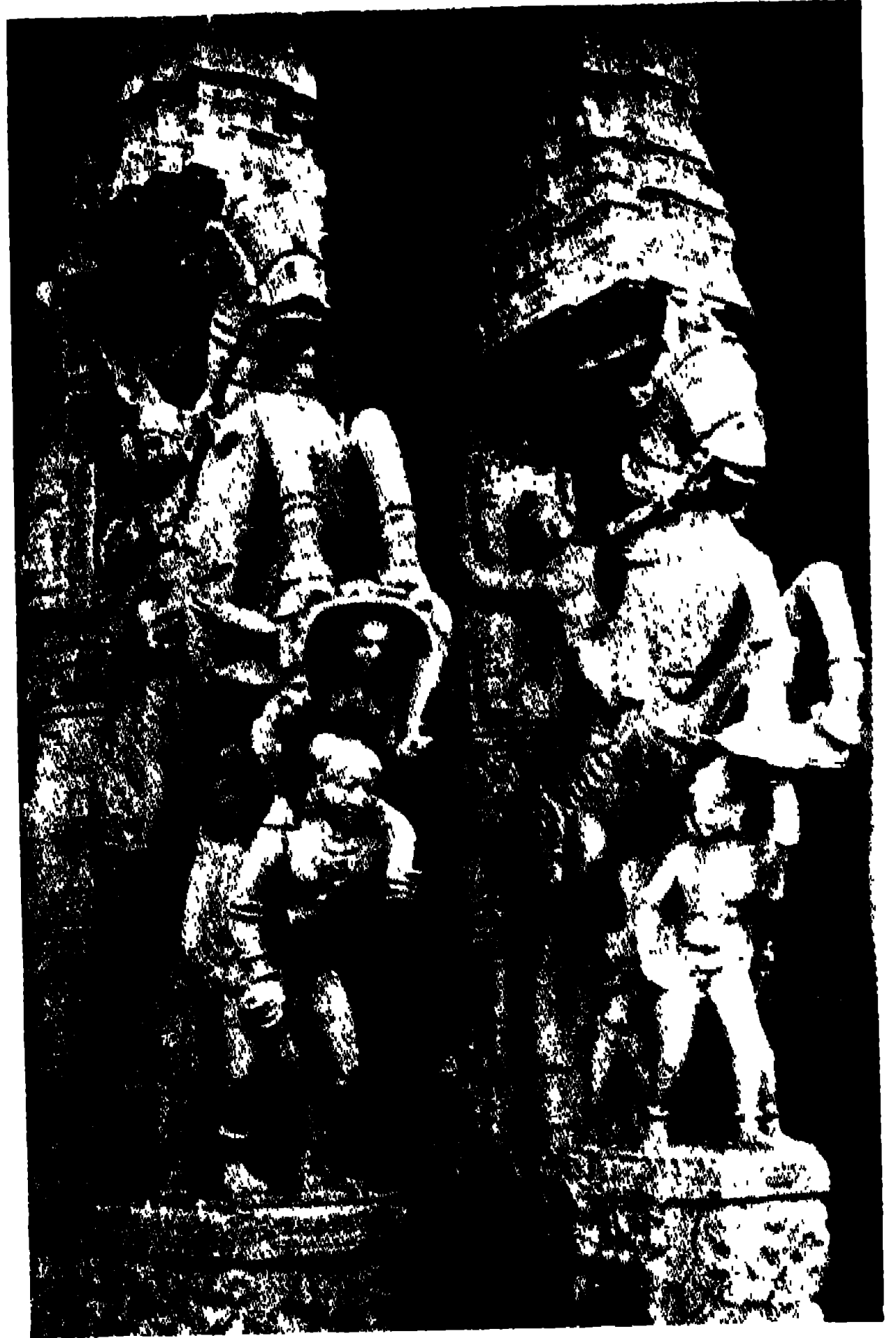
দ্বাদশবর্ষ পূর্তি উৎসবে আয়োজিত আলোক চিত্র প্রদর্শনীতে বিশিষ্ট অতিথি শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল।

চিত্র : হিমাদ্রী চৌ

জয়যাত্রার পথে - এক যুগ

(সমিতির দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উৎসবে সম্পাদকের ভাষণ)

আজ থেকে এক যুগ আগে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এসোসিয়েশন যে এক শুভলগ্নে জন্মলাভ করেছিল তা আজ যৌবনের দুর্বার জয়যাত্রার পথে। ১৯৬০ সালের ১লা মে কয়েকজন যুবক এই সংস্থার বীজ রোপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল অল্প খরচে ভ্রমণের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ভ্রমণের স্পৃহা জাগানো, ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ ও পাঠাগার স্থাপনা করা এবং সভ্য ও ভ্রমণ পিপাসু জনগণের মধ্যে দেশ ভ্রমণের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশনা। আমাদের দেশে এই ধরণের অপেশাদার সংস্থা গড়ে ওঠা বোধহয় এই প্রথম। মূলতঃ যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এই সংস্থার আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল তাঁদের কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ না করলে এই দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উৎসবানুষ্ঠানের পূর্ণ মূল্যায়ন বোধকরি সম্ভবপর নয়। এঁরা হলেন সর্বশ্রী মৃগাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিমোহন হালদার, দিলীপ ঘোষাল, শম্ভুনাথ ঘোষ ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সংস্থার জন্মলাভের অল্পকাল পরেই প্রথম ভ্রমণসূচী নির্দ্ধারিত হয়েছিল বাসযোগে - গয়া, রাজগীর ও নালন্দা অঞ্চলে। ১৩ই আগষ্ট ১৯৬০ সালে উত্তরপাড়ায় কার্য্যালয়ের সামনে থেকে ৩৮ জন ভ্রমণ রসিক সদস্যকে নিয়ে বাস ছুটে চললো উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির পথে—এই যাত্রা আজও চলেছে অব্যাহত গতিতে এবং আমরা এই ১২ বৎসর কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রূপে ৭৩টি ভ্রমণের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে পেরেছি, তবে যে ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের সংস্থা খুব শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা হল জলপথে সুন্দরবন। হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল, জল-জঙ্গলে ভরা সুন্দরবন অঞ্চলে যে ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে এক পরম রমণীয় স্থান হতে পারে তা অনেকেই জানলেন আমাদের সংস্থা আয়োজিত এই ভ্রমণের মাধ্যমে এবং আকৃষ্ট হয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ, চিত্র শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ সংস্থার আজীবন সদস্যরূপে যোগদান করলেন। আলোচ্য ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক অধ্যাপক মনীন্দ্র দত্ত যুগান্তর পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এই আকর্ষণীয় ভ্রমণটি ও আমাদের সংস্থার কার্য্যাবলী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করলেন এবং উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার পরিচিতি ব্যাপকতর হয়ে উঠল, যোগদান করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি —সংস্থার সদস্যরূপে।

এই সংস্থার বারো বৎসরের যাত্রাপথে নানাদিকে নানাভাবে সাফল্য লাভ করেছে। প্রথমেই আসা যাক পাঠাগারের বিষয়ে। মাত্র কয়েকখানি ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তিকা ও গ্রন্থ নিয়ে এর বীজ আরোপিত হয়েছিল

আজ তাহা বিশাল মহীরুহে পরিণত। কেবল মাত্র ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি দ্বারা সংকলিত এই ধরণের পাঠাগার বোধকরি আমাদের দেশে আর কোথাও নেই। মোট প্রায় ৫০০ বই, যার মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে দুর্লভ, সংগৃহীত হয়েছে এই পাঠাগারে। বহু সদস্য নানাভাবে সাহায্য করে এই পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর করে তুলেছেন এই প্রসঙ্গে একজনের অবদানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, ইনি হলেন ডাঃ নিরঞ্জন বসু, যিনি প্রায় তিন শতাধিক পুস্তক এই পাঠাগারে দান করেছেন।

১৯৬০ সালে ছোট একখানি ঘর ভাড়া করে সংস্থার কাজ শুরু হয়েছিল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মান-কল্পে উত্তরপাড়ার একটি বিশিষ্ট স্থানে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে জমি খরিদ করা হয়েছে এর পরই শুরু হবে গৃহ নির্মানের কাজ। আমরা আশা করি সদস্য ও ভ্রমণপিপাসু জনগণের ঐকান্তিক সাহায্যের ফলে এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক মুখপত্র "যাত্রী" একটি অভিনব পুস্তিকা। প্রতি বৎসর বাৎসরিক উৎসবকে স্মরণীয় করে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ কাহিনীকে ভিত্তি করে বহু রসোত্তীর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এই পত্রিকা সমিতির সামগ্রিক উন্নতির সাথে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। যে কোন ভ্রমণ-রসিকের কাছে যাত্রীতে প্রকাশিত তথ্য সম্বলিত রচনাগুলি এক অমূল্য সম্পদরূপে সমাদৃত হয়ে থাকে। বহু সদস্য নানা ভাবে সাহায্য করে যাত্রীর প্রকাশনে সহায়তা করে আসছেন তবে বিজ্ঞাপন বাবদ অর্থ সাহায্যে শ্রীবিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় ও গ্রন্থনায় শ্রীমনোমোহন ঘোষের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাসযোগে ভ্রমণ সুরু করে এই সংস্থা প্রথম ভ্রমণসূচী রচনা করেছিল আজ তা ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমন কি ভারতের বাইরে তার সফল ভ্রমণসূচী রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। উত্তরে কেদার-বদরী, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি থেকে শুরু করে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমাঞ্চলের দ্বারকা, ভেরাবল প্রভৃতি নানাদিকে নানাভাবে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা রূপায়িত করে ওয়েষ্ট বেঙ্গল টুরিষ্টস্ এসোসিয়েশন আজ আমাদের দেশে একটি সার্থক অপেশাদার ভ্রমণ সংস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪৭৫ জন। তার মধ্যে আজীবন সভ্য ৬২ জন। সদস্য চাঁদা—বার্ষিক ৬ টাকা। ভর্তির জন্য —২ টাকা। আজীবন সভ্য চাঁদা—৫০ টাকা। আগামী দিনে উৎসাহী ও ভ্রমণেচ্ছুক জনগণের সক্রিয় সহযোগীতায় এই সংস্থা সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে বিকশিত হয়ে উঠুক আজকে দ্বাদশ বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে এই কামনা করি।

অনিল ঘোষাল

কমলা মুখোপাধ্যায়ের

পুনদর্শনায় চ

জীবিতকালে আমার মাতৃভূমি ও স্বদেশে ফিরে যেতে পারবো কিনা সে বিষয়ে ছিল ঘোর সন্দেহ ; স্বপ্নেই তাকে দেখা ছিল বাঞ্ছনীয় — তবে বৈশাখ মাস এলেই যখন কবি রবীন্দ্রজন্মোৎসব সুরু হয়ে যায় — বৈশাখের নিদারুণ রসহীন আবহাওয়ার মধ্যে কবির ভাষায় ও সুরে তার নিরাসক্ত বৈরাগী রূপটী মূর্ত হয়ে উঠতে সুরু করে তখন আমার মাতৃভূমি মৈমনসিংহের কথাই বার বার মনে পড়ে। তার প্রচণ্ড কালবৈশাখীর রূপ "বাজে ঈশান কোণে কালো প্রলয়বিষাণ" যেন দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান হোত, এর সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্র উৎসবের পালা সুরু হয়ে যেত। অবশ্য তখনকার রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের মাধ্যম ছিল, গান ও কবিতা। তাছাড়া কবি তখন জীবিত, বছরে বছরে নব নব কবিতা আসতো এক একটি জন্মোৎসবে। এই আবহাওয়ায়, উন্মুক্ত প্রান্তরে, গ্রীষ্মবসন্তের পুষ্প সম্ভার নিয়ে প্রকৃতি নব নব রূপে তার ঋতুর পালা বদল করতো, তার জন্য গবেষণার দরকার ছিলনা, নিত্যদিন তাকে চোখের সামনে দেখতে পেতাম— আর নিশ্চিত ছিলাম কবি নিশ্চয়ই আমাদের দেশের প্রকৃতির রূপ দেখে এসব কাব্য লিখেছেন, সুরের ঝরণা বইয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও সঙ্গে ছিল লাঙ্গলবন্দ ও ব্রহ্মপুত্রের বিভিন্ন স্থানে অশোকাষ্টমীর দিনে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবিকাগিরি করা। ছুটিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেতাম, একবার এই ধরণের এক কনফারেন্সে ভোজন পর্বের পর সন্দেশ সম্পাদক বিখ্যাত সুকুমার রায় "খাই খাই কর কেন এসো বসো আহারে" কবিতাটি রচনা করে পড়ে শুনিয়েছিলেন—মনে পড়ে।

তবে দেশ তো শুধু প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য নয়—তার মানুষগুলিও আছে। যারা দেশের মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে, শত নির্য্যাতন সয়েও সে দেশ ছাড়ার কথা ভাবতেও পারেনা তাদের বাদ দিয়ে তো দেশ দেখা যায় না। তাই অতীত স্মৃতি চারণা করেও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, যে দেশের মাটির সঙ্গে আমার নাড়ীর টান ছিল, তাকে ফেলে চলে আসতে যখন পেরেছি, তখন তার উপর আমার দাবী কোথায় ? তবে সে যদি কৃপা করে তার কোলে বা পাশে একটু ঠাঁই দেয়, তাহলেই ধন্য হবো—কতকটা সেই ভাবনা নিয়েই গিয়েছিলাম। যে দেশ আমাকে চেতনা দিয়েছে, কৈশোর ও যৌবনের মায়াময় দিনগুলিকে নানা রঙ্গীন চিন্তার জাল বিছিয়ে আচ্ছন্ন করেছিল, তার নিত্যনতুন লীলাখেলাতে আমাকে যুক্ত করেছিল, সে দেশের আমি কেউ নই—সে কথা নিজের কাছেও স্বীকার করা দায়। এই বেদনা নিয়েই স্বাধীনতার ১ম বার্ষিকীতে যখন আমন্ত্রণ আসলো—তাকে সাদরে গ্রহণ করলাম ও অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে

যশোর খুলনা অভিমুখে রওনা দিলাম ২৬শে মার্চের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

১৯৩৮-৩৯ এর কোনও একসময়ে খুলনায় ভৈরব ও রূপসার মধ্যবর্তী এক চরে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশ কিছুদিন ছিলাম, সে ছিল আদিম গ্রাম্যভূমি। তবু আমরা তিন মহিলা মুসলমান চাষীদের মধ্যে বেশ নির্ভয়ে ছিলাম। অন্য সময়েও খুলনা গিয়েছি কিন্তু ২৪ বৎসর পরে গত ২৬শে ডিসেম্বর '৭১ যখন গিয়েছি বিপুল ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে বোঝা গিয়েছিল কি বিপুল উন্নতি হয়েছে, খুলনার! সামরিক শাসনের সময় যশোর-ঢাকা রোডের মধ্যস্থিত এটা ছিল একটি নদীবন্দর, তাছাড়া একটি প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্রও বটে। কাগজ ও পাটের কল স্থাপিত হয়েছে —নদীর ধারে সারি সারি গুদাম দেখা যায়। স্কুল কলেজের সংখ্যা তো ৩/৪ গুণ বেড়েছে। একটি অতি আধুনিক মাইক্রোওয়েভ রেডিও ষ্টেশনও ছিল, যেটিকে যাবার সময় শাসকরা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল অবাঙ্গালীদের হাতে। জনসংখ্যার অনুপাত ছিল অবাঙ্গালী/বাঙ্গালীর—৬০/৪০। এই অঞ্চল ছাড়া উত্তরবঙ্গেরও কয়েকটি শিল্প প্রধান স্থানের জনসংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালীদের অনুপাত বেশী। কতকটা পরিকল্পনা করেই এসব করা হয়েছিল। ব্যবসা প্রধান কেন্দ্র বলে খুলনার ষ্টীমার ষ্টেশনটিও খুব আধুনিক। সামরিক শাসনে নদীগুলিতে নিয়মিত ফেরী থাকায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে খুবই কম সময় লাগতো। গ্রামের অবস্থা সেই পূর্ববৎই রয়েছে কিন্তু পিচঢালা রাস্তাগুলি খুবই সুন্দর ও আধুনিক। তবে ট্রেণের ব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়নি, বর্ত্তমানে জ্বালানীর অভাবে ও বহু পুল ধ্বংস হওয়াতে ট্রেণ ব্যবস্থা খুবই অনিয়মিত।

খুলনার এত আধুনিক ফিটফাট চেহারা আমাদের খুশী করতে পারেনি কারণ গত ডিসেম্বরেই রেডিও ষ্টেশনের বিপরীত দিকে গল্লামারীর চরে ও নদীর পারে গুদামগুলিতে বেশ গণকবর ও মৃতদেহের অবশিষ্ট দেখে গিয়েছি। ২/৩ মাস পরে এসেছি—স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে, স্কুল কলেজ বাজার হাট খুলেছে বটে কিন্তু হত্যালীলা এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। তিক্ততা এত সৃষ্টি হয়েছে, যে তা ভুলতে সময় লাগবে।

নদীতে বহু লঞ্চ ও নৌকা চলাফেরা করছে। দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট লঞ্চ তো নিয়মিত বরিশাল হয়ে ঢাকা যায় তাছাড়াও সপ্তাহে দুদিন বিশেষ লঞ্চ "রকেট" চলাচল করে। এই নদীপথই এখন যাতায়াতের প্রধান 'জীবনসূত্র'। খুলনা থেকে সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় লঞ্চ ছাড়ে, আমরা ৭ টাকা ১০ পয়সার বিনিময়ে ডেকে স্থান গ্রহণ করে ফেললাম। ২৪ ঘণ্টা পরে এ লঞ্চ ঢাকায় পৌঁছাবে নদী পথে ৯৮ মাইল পথ পার হয়ে। প্রায় ৩৫০ মত যাত্রী এ লঞ্চে, বিভিন্ন স্থান থেকে প্রধানতঃ যশোর, কুষ্টিয়া, কলকাতা থেকে চলেছেন। কিছু শরণার্থীও ছিলেন। যাত্রা-

পথটি কি সুন্দর! —ভৈরব, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ, পদ্মা, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, বুড়ি গঙ্গা নদী-গুলি ধরে ঢাকা যেতে হয় অর্থাৎ সমস্ত সুন্দরবন এলাকা ঘুরে চালনা, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, বরিশাল ঘাট হয়ে তবে যেতে হয়। শুক্লপক্ষের রাত্রি ছিল, কবিত্বের উপাদান ছিল প্রচুর, মায়াপুরী দিয়ে যেন চলেছি কিন্তু খুব উপভোগ করতে পারিনি মন ছিল ভারাক্রান্ত। বহু যাত্রী আছেন—তাঁদের সর্বস্ব গেছে, বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন মৃত। ব্যাপক লুট ও ধ্বংস হয়েছে দু'পাশের গ্রামগুলি দেখলেও বোঝা যায়। তাছাড়া এমন একটি পরিবার নাই যার কেউ না কেউ মরেনি। প্রতি নদীর ঘাটে লঞ্চটি লাগতেই ছোট ছোট নৌকা করে নানাবিধ সুমিষ্ট ও রসাল খাদ্য সামগ্রী আনছিল যে সব ছেলেরা তাদের কাছেও যে সব ভয়াবহ ঘটনাবলী শুনলাম তাতে আনন্দ উপভোগ করার অবকাশ খুব একটা ছিলনা। এসব ক্ষত নিরাময় হতে সময় লাগবে; তখনই না হয় বাংলাদেশকে আবার নতুন করে দেখবো এখন শুধু যাচ্ছি পুরানো আত্মীয়কে দেখতে বহুদিন অদর্শনের পর।

নৌকারই কত রকম, নাম—ভাওয়ালী, বজরা, ছিপ, নাওধুবি, ডিঙ্গী, পলওয়ার, পানসী, ছান্দী, সারেঙ্গা —! যাত্রীদের সঙ্গে সারাদিন আলাপ করতে করতে দিন গেল, একবারও মনে হলনা ২৪ বৎসর পরে দেশে যাচ্ছি। আগে যেমন বছরে বছরে ছুটীতে বাড়ী যেতাম এবারও যেন সেইভাবে যাচ্ছি, কোনও নতুনত্ব নাই। যাত্রীদের ব্যবহারও সেইরকম ছিল। শুধু "ইণ্ডিয়া থিকা আইছেন বুঝি" কথাটা কানে ঠেকছিল; অবশ্য এখন ইণ্ডিয়া বলাটা বেশ কিছুটা কমেছে।

মাঝে লঞ্চ কোন চড়ায় ঠেকেছিল তাই ২৬ ঘণ্টায়, রাত্রি ৮ টায় ঢাকা পৌঁছলাম। পরদিনই ২৬শে মার্চ্চ ছিল স্বাধীনতা দিবস, রমনার মাঠে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজের পর ভাষণ দিলেন। বহু পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হোল। ঢাকা শহরের ও রাস্তা ঘাটের কি বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে যে চেনাই যায় না। নবাবপুর রোড তো কত চওড়া হয়েছে, ঢাকা-মৈমনসিংহ রোড যেটি টাঙ্গাইল হয়ে যায়—সে তো অতি আধুনিক রাস্তা। রমনার উত্তরাঞ্চলে মাঠগুলির জায়গায় ধানমণ্ডীর আবাসিক অঞ্চল, আমাদের বালিগঞ্জের মত কতকটা। পুরানো ওয়ারীকে তো খুঁজেই পাইনি প্রথমে। তবে শাঁখারী বাজার বা বসাকদের অঞ্চল যেগুলি ছিল খুবই ঘিঞ্জি ও জনাকীর্ণ সে সব অঞ্চলগুলি প্রায় তেমনি, পরিবর্তনের মধ্যে দেখা গেল সামরিক বাহিনীর সমস্ত ক্রোধের প্রকাশ এই অঞ্চলগুলির মধ্যেই প্রথমে হয়েছে, তারা ভেবেছিল এই সব এলাকাতেই, ছাত্র ও কর্মীরা আশ্রয় নিয়েছে। গলির দুদিক থেকে মেসিনগান, গ্রেনেড চার্জ করে এসব অঞ্চলকে কিভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে - যে, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের বাগান বাড়ী ছিল যেখানে বর্তমানে রাজার বাগ পুলিশ ট্রেনিং কেন্দ্র—তার উপরও

বিপুল ধ্বংসের চিহ্ন। পুলিশ বাহিনীকেই সৈন্যদল সর্বপ্রথম নির্মূল করতে চেয়েছিল সেই ২৫শে মার্চের রাতে। ঢাকার কিছুটা বাইরে সাভারের দিকে মীরপুর মহম্মদপুর অঞ্চলটি ক্রমশঃ ঢাকার উপনগরীতে পরিণত হচ্ছিল, সেখানেও ধ্বংসলীলার চিহ্ন! ঢাকায় এলে বর্তমানে এইখান থেকেই মিনিবাসে বা কোচে করে সমস্ত জেলাগুলিতে যাওয়া যায়। বর্তমানে অন্য যানবাহনের সুবিধা না থাকাতে এইখানে এসেই সর্বত্র যাওয়া হয়। আমরা তো ফেরবার সময় সকাল ৭-৩০ টায় রওনা হয়ে বংশাই, নবগঙ্গা, যমুনা ও গড়াই নদী বার্জে গাড়ীশুদ্ধ নয়াঘাট, তরাঘাট, আরিচাঘাট ও কুমারখালি দিয়ে পার হয়ে ৩-৩০টায় যশোর ও সেই রাতেই কলকাতা এসে পৌঁছেছিলাম।

অতীতে বাংলাদেশে যানবাহনের এত দ্রুতগতি কল্পনাই করতে পারতাম না। খাদ্যদ্রব্যও আমাদের দেশের তুলনায় সস্তা তবে ঐ দেশের তুলনায় আক্রা বটে। তদুপরি ব্যাপক ধ্বংসলীলার মধ্যে জনসাধারণ তাদের রোজগারের মাধ্যমগুলি হারিয়েছেন হাতে পয়সা নাই। চাকুরীজীবি ছাড়া সকলেই এক নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন! ঢাকায় যানবাহন কিছুটা উন্নত হলেও গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বল শহরে যাতায়াতের কিছুমাত্র সুবিধা নাই। কারণ ডিজেল নাই, মৈমনসিংহ থেকে ঢাকা আসতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগলো তাও একটি ইঞ্জিন দুটি ট্রেণকে নিয়ে এলো। হয়তো আউস বা ইরি ধানটা উঠে গেলে কিছুটা সুরাহা হবে। কিন্তু তবু জনসাধারণকে হতাশ দেখলাম না—আশায় বুক বেঁধে দিন যাপন করছেন। আবার অতিথি আপ্যায়নেও ত্রুটি নাই।

ঢাকার অবস্থিতি যে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ঐ দেশে ঢোকাকালীন কখনও চিন্তা করিনি। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় যখন ঢাকায় প্রবেশ করতে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের দেরী হচ্ছিল তখনই নতুন ভাবে অবস্থিতির গুরুত্ব বুঝলাম। চতুর্দিক শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী দ্বারা বেষ্টিত, শুধু উত্তরের দিক থেকে মৈমনসিংহ—ঢাকা রেলপথে। রাস্তা সোজাসুজি নাই, আসতে হলে টাঙ্গাইল মধুপুর ঘুরে আসতে হয়। তা ৬০ মাইল পথকে আবার বাঘা সিদ্দিকীর বাহিনী ১৮টি পুল ও ১১টি কালভার্ট ভেঙ্গে সামরিক বাহিনীর পক্ষে একেবারেই অকেজো করে দিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যখন প্রবেশ করে, তখন ঐ ভাঙ্গা পথের পাশ দিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরী তারাই করেছিল বর্তমানে সেই পথই চলছে। পুল মাত্র ২টি সারানো হয়েছে বর্ষায় কী হবে কে জানে।

কলকাতা থেকেও ঢাকার ইতিহাস অনেক পুরানো। সেই পালবংশের সময় থেকে এর উত্থান। বিখ্যাত রাম পাল ছিল মুন্সীগঞ্জ মহকুমায়। সেটি ছিল তাঁদের রাজধানী। তারও আগে বৌদ্ধ

প্রভাব ছিল এ দেশে। বজ্রযোগিনী গ্রাম ছিল অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান—সাভারের কাছে মঠে তিনি লেখাপড়া করেছেন। পালরাও ছিলেন বৌদ্ধ—বহু বৌদ্ধ ধর্মের কীর্তি চিহ্ন এখনও এখানে বর্তমান। বার ভুঁইয়াদের সুবর্ণ গ্রাম বা সোনার গাঁও (বর্তমান পানাম) ছিল তাদের রাজধানী। মগ ও পর্তুগীজদের উৎপাতে মোগল যুগে জাহাঙ্গীরের সময় ১৬০৮ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে আরও পূর্বদিকে প্রাদেশিক রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়। এর অবস্থিতির গুরুত্বও একে রাজধানীর মর্য্যাদা দিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা আগেই এখানে ছিলেন। তাই হিন্দু ও মুসলমান দুই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিহ্ন এখানে বর্তমান। একদিকে আছে বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দির। চাঁদরায় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির ও বুড়ো শিব ও রমনার কালীবাড়ী ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তারই পাশাপাশি আছে হাজী সাহাবাজের মসজিদ, সাতগম্বুজ মসজিদ, বিখ্যাত হুসেনী দালান, শিখ সঙ্গত ও প্রাচীন গ্রীক গির্জা। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন-গুলি ভবিষ্যৎ রিসার্চ কর্মীদের হয়তো বেশী খোরাক জোগাবে—এমনিতেই পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় বিখ্যাত হয়ে আছে। ঢাকার ১২ মাইল দূরে নারায়ণগঞ্জ প্রসিদ্ধ নদীবন্দর, ওপারে ইতিহাস বিখ্যাত জিঞ্জিরা—সমগ্র ঢাকা জিলার ইতিহাস লিখতে গেলে 'ঢাকা পুরাণ' গ্রন্থ মহাভারতের চাইতে কিছু কম হবেনা। তবে এবার আমরা গম্যস্থল—মৈমনসিংহ।

আমাদের সময় ঢাকা ও মৈমনসিংহ দুটি পাশাপাশি জেলা ছিল ও প্রধান শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এরা একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক প্রতিযোগিতা করত। ঢাকাই পরোটা, অমৃতি, রামপালের কলার সঙ্গে পোড়াবাড়ীর চমচম, মুক্তাগাছার মণ্ডা ও গফরগাঁও-এর বেগুনের রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো—যেমন চলতো প্রতিবার কোন্ স্কুল বেশী স্কলার-শিপ আনতে পারে। মৈমনসিংহে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না বটে কিন্তু আনন্দমোহন বসুর নামে স্কুল ও কলেজ ছিল তাছাড়াও ছেলে ও মেয়েদের বহু বিদ্যালয় ছিল। জয়দেবপুর টঙ্গী পার হয়ে সীমান্ত শহর ছিল কাওরাইদ—এখানকার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের বংশের খ্যাতি ছিল খুব। বর্তমানে জয়দেবপুরে আধুনিক অস্ত্রের কারখানা খোলা হয়েছিল। তবে অতীতেও এইখানে ছিল ভাওয়াল পরগণা—ভাওয়ালের রাজকুমারের কেস তো ভারতবিখ্যাত। তাছাড়া ভাওয়াল বাংলার প্রসিদ্ধ পল্লীকবি গোবিন্দদাসের জন্মস্থান। এখন এসব স্থান আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছে। তবে গফরগাঁও বা কাওরাইদ সেরকম মেঠো ষ্টেশনই রয়ে গেছে। কাওরাইদের বিভিন্ন বংশ থেকে সে যুগের ছেলে মেয়েরা রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশিষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন — সাহানা দেবী, কনক দাস প্রভৃতি রবীন্দ্র সংগীতে মুখরিত করে রাখতেন মৈমনসিংহকে। এদের আত্মীয় একটি পরিবারের থেকে জর্জ বিশ্বাস বা (দেবব্রত বিশ্বাস), বলাই বিশ্বাস, মঞ্জু গুপ্ত প্রভৃতি নামী গায়ক গায়িকারা এসেছেন—এদের বংশের প্রত্যেক ছেলে মেয়েই ছিলেন ভাল গাইয়ে। আর তখনকার দিনে গান মানেই ছিল রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদের গান ও বিভিন্ন কীর্ত্তন,

পদাবলী। নজরুল সঙ্গীতও খুব জনপ্রিয় ছিল বটে কিন্তু তিনি তো তখন ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হননি। সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়, স্বদেশী মেলায় ডাঃ বিপিন সেনের বাড়ীতে ঘন্টার পর ঘন্টা ঐ তরুণ কবি অবিরাম স্বদেশী গান ও বিদ্রোহী কবিতা শুনিয়ে যেতেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে সব শুনতাম। বাস্তবিক রবীন্দ্র চর্চ্চা সেই যুগে এত বেশী মৈমনসিংহ, ঢাকায় হোত যে তার প্রভাব থেকে কেউই মুক্ত ছিলাম না। রবীন্দ্র ভক্তদের মধ্যে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ও পুলিনবিহারী সেন ছিলেন এখানকার অধিবাসী সুতরাং রবীন্দ্র কাব্য ও গানের ঢেউ সারা বছরই রয়ে যেত। প্রতি ঋতুকে বুঝতে শিখেছিলাম তাঁর গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে। তবে কাব্য চর্চ্চার চাইতে স্বদেশী ভাবেই ওপার বাংলা তখন উদ্বেলিত ছিল, বিশেষ করে বঙ্গ ভঙ্গের পর। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান সহায়। এই পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত জনসাধারণ এত বেশী স্বদেশী ছিলেন—যে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারাও এ সব দেশে না এসে পারেননি।

কিন্তু আজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে বুঝি—রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল যেই হোন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল তাঁদের সীমা—। আর তখন মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ২/৩ ভাগের বেশী শিক্ষা গ্রহণ করতেন না। সুতরাং জনজাগরণ বা চেতনা ছিল একাংশের মধ্যেই। তবে অর্থ-নৈতিক শোষণটাকে জনগণ বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করতেন—তারই প্রতিবিধান হবে পাকিস্থান পেলে, এইরকম একটা ধারণা মুসলমানদের মধ্যে জন্মে ছিল। আজ দেখলাম আমার ঐ মৈমনসিংহতেই স্কুল কলেজের সংখ্যা দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে, ট্রেনিং কলেজ হয়েছে গোটা চারেক, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ১৬০০ ছাত্রের আবাসিক কৃষি মহাবিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়েছে। এখনও শিক্ষিতের হার কম কিন্তু রবীন্দ্র চর্চ্চা বা নজরুলের কবিতা, গান এখন এদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে, এঁরা তাঁদের একেবারেই আপন করে নিয়েছেন। সেই অতীতের রবীন্দ্র প্রভাবের বীজ লুপ্ত হয়নি, রবীন্দ্রনাথকে এঁরা সংগ্রামের হাতিয়ার করে এগিয়েছেন—এখন হয়তো তাঁর সূক্ষ্ম কাব্য উপভোগের দিকে যাবেন। ছায়ানটের এক শিল্পী বলছিলেন—যে আইয়ুব খাঁর আমলে রবীন্দ্র চর্চ্চা বা রবীন্দ্র জন্মোৎসব করা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল—তাঁরা সাহস করে তা পালন করতেন। যেহেতু সামরিক শাসনকর্ত্তা ঐ অনুষ্ঠান নিষেধ করেছেন—সেইজন্যই সমস্ত জনগণ, রিক্সাওয়ালা থেকে দোকানদার, কৃষক, অধ্যাপক ঐ অনুষ্ঠানে দলে দলে যোগ দিতে আসতেন। এইবারও ২৫শে বৈশাখ শিলাইদার কুঠিবাড়ীর অনুষ্ঠানে ভোর থেকে দলে দলে গ্রামবাসী এসেছেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। রবীন্দ্রনাথকে আবার স্মরণ করি—জীবিতকালে তো বটেই, মৃত্যুর পরও তিনি কি দিয়ে গেলেন—বাঙ্গালীকে—তার পরিমাপ কে করবে? যে স্কুলে লেখা পড়া করেছি—সেই স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের বললাম দেখ,—"রবীন্দ্রনাথ এই

পুকুরের ধারে প্রাঙ্গনে এক উজ্জ্বল দিনে দাঁড়িয়েছিলেন। শিশুকালের আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি—কিন্তু এতদিন পরে এসে দেখি—স্থানটি কত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে—কি ভাবে সেই মহৎ ব্যক্তি এখানে এত ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে দাঁড়ালেন তা কল্পনাই করতে পারিনা"। আসলে বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে এসে পূর্বের চেনা স্থানগুলিকে এত ক্ষুদ্রায়তন মনে হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাকে এরা কতটা নিজের করে নিয়েছে, তা দেখলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার গ্রন্থটিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তো সব বিদেশী খেতাব প্রাপ্ত ডক্টরেট কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে তাঁরা 'বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞান' বলে একটি আলোচনা সভা চালিয়েছিলেন—বিজ্ঞানকে কিভাবে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাস্তবিক কত সহজে Technical কথা গুলির বাংলা অবলীলা ক্রমে তাঁরা বলে গেলেন তা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না—বাংলা ভাষাকে সত্যি এঁরা নিজের করে পেয়েছেন।

সারা পুল এখন ভাঙ্গা। মনে পড়ে সেই বিখ্যাত পুলটিকে দেখার জন্য ট্রেনে কখনও ঘুমাতাম না—এখন সেই পুল ভগ্ন, আগষ্টের আগে সারান হবে না। এখন ভেড়ামারা দিয়ে, ফেরী পার হয়ে ঈশ্বরদি সিরাজগঞ্জ ঘাট হয়ে মৈমনসিংহ আসা যায় বটে কিন্তু খুবই সময় সাপেক্ষ, ঢাকা থেকেই যাওয়ার বেশী সুবিধা। কবে যে সমস্ত যাতায়াতের পথ চালু হবে কে জানে ; বিরাট সমস্যা এঁদের সামনে—কিন্তু ভগ্ন মনোরথ নয় কেউ। —জয়দেবপুরের ভাওয়াল অঞ্চলের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ঢাকা জিলার উত্তর ভাগ থেকে ময়মনসিংহ জিলার (বর্তমানে টাঙ্গাইল আলাদা জিলা) টাঙ্গাইল৷ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মধুপুরের জঙ্গল—এর গজালি গাছই প্রধান। জ্বালানীর জন্য বহু গাছ কাটা হলেও বন এখনও বিস্তৃত। অতীতের মত, মধুপুরের বন এবারকার যুদ্ধেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আগে বাঘ ও হাতী ছিল বনে—এখন আর নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' যে গড় ও জঙ্গলের উল্লেখ আছে তা এই মধুপুরের বন। আবার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রও ছিল উত্তর বঙ্গের রংপুর ও টাঙ্গাইল—মৈমনসিংহ জিলায়। ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীতে ছিল ভবানী ঠাকুরের অবাধ গতি। এবারকার মুক্তিযুদ্ধেও বাঘা সিদ্দিকীর বাহিনীর দখলে ছিল এ অঞ্চল ও নদীর ধার গুলি। সেই কারণে সামরিক বাহিনী এদিকে খুব সুবিধা করতে পারেনি ও মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় ফৌজ এই অঞ্চল দিয়েই ঢাকায় প্রবেশ করে। অতীতের স্বদেশী আমলেও এই সব জঙ্গল ও টিবিগুলি ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্র—এবারও গারো পাহাড়ের সীমা পর্য্যন্ত মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জ ও আসামের মাকণার চরের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার কাজে এ অঞ্চলটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অতীতের কিছুই হারায় না—বারে বারেই সেই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের স্ফুরণ জেগে উঠেছে একই জায়গা থেকে—"ইতিহাস বার বারই ফিরে আসছে"—এই প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করলাম এ অঞ্চলে এসে। অবশ্য হাল্কা ভাবে বলতে গেলে টাঙ্গাইল

শাড়ী ও পোড়াবাড়ীর চমচমও তার আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে বলা যায়।

টাঙ্গাইল, মীর্জাপুর, করটিয়া, সন্তোষে বহু স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তবে বিখ্যাত ব্যবসায়ী রণদা সাহা ও তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদও খুবই মর্মান্তিক। অথচ এঁরা এ দেশের উন্নতির জন্য স্কুল কলেজ ও আধুনিক হাসপাতাল সবই তো তৈরী করে দিয়েছিলেন। টাঙ্গাইলে উকীল ও মোক্তারদের বহু প্রশ্নের জবাব দিতে হোল—এঁরা যে কত সচেতন, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বাঘা সিদ্দিকীর সঙ্গেও কথা হোল—টাঙ্গাইলের এই ২৫ বৎসর বয়স্ক রবিন হুড জানালেন—এবার শিক্ষা জগতে ফিরে যাবেন তিনি।

নেত্রকোণা যাওয়া কঠিন কারণ ব্রহ্মপুত্রের পুলটি পাক বাহিনী ভেঙে দিয়ে গেছে– শম্ভুগঞ্জ থেকে বাসে করে যেতে হয়—মগরা নদীর তীরে খুব সুন্দর দেশ ছিল। কিন্তু প্রাক্তন বিপ্লবী সুধীর মজুমদারের আবদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু কাহিনী শুনে আর অন্য কোন কিছুতেই মন রইল না।

বল্লাল সেনের সময়—সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরে গারো ও হাজংদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈশ্য গারোর সময়ে সোমেশ্বর পাঠক সুসঙ্গ অধিকার করেন, হয়তো তাঁর নামানুসারেই সোমেশ্বরী নদী—যা গারো অঞ্চলে অবস্থিত। গারোরা থাকতো পাহাড়ের উপরে—আর উপত্যকায় থাকতো হাজংরা। গারোরা আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে এখনকার মেঘালয় রাজ্যটিতে এরাই প্রধান। এবার যুদ্ধে বহু হাজং পালিয়ে এসে বাঘমারা রংরা এলাকাতে ছিলেন—এখন আবার ফিরে এসেছেন। গারোরা শিক্ষিত কিন্তু নিজেদের বিষয়ে বেশী সচেতন হাজংরা অনেকটা মিশে গেছে। এই সব পাহাড়ী অঞ্চলে বিরাট পার্বত্য হ্রদ বা হাওর দেখা যায়, সমুদ্রের মতই বিশাল সেগুলি খুবই অপূর্ব দেখতে। কিন্তু এবার আর ইচ্ছা হোল না সে সব দেখতে। মৈমনসিংহ থেকে ৬২ মাইল দূরে কিশোর গঞ্জ, বল্লালসেনের সময়ে এখানেও জঙ্গল বাড়ীতে হাজংদের একটি রাজ্য ছিল। ৮৩ মাইল দূরে মেঘনার তীরে ভৈরব বাজার অবস্থিত। বাজিতপুরের প্রায় ১৬টি গ্রামে কোনও পুরুষ মানুষ জীবিত নাই—এ সব শুনে আর অগ্রসর হওয়া যায় না—পরে আসবো বলে পালিয়ে আসতে হল।

টঙ্গীর অদূরে দৌলতকান্দীও বিখ্যাত ছিল বৌদ্ধস্তূপ ও স্মৃতি চিহ্নের জন্য—কিন্তু এখন তো প্রমোদ ভ্রমণের সময় নয়—সে সব বছর দুই পরে হবে—। এখন তো আমি আমার দেশের লোককে দেখতে গেছি, বার বারই হয়তো যেতে হবে—এ তো ভ্রমণ নয় এ তো ফেরা! নিজেকে এতদিন পরে মানিয়ে নিতে হয়তো সময় লাগবে। কিন্তু যে ভাবে আমার জিলার লোক আমাকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন তাতে নিজেকে এদের সঙ্গে আপন করে নিতে বেশী দেরী হবে না এটা স্থির নিশ্চিত হলাম।

শঙ্কু মহারাজের

আলপ্‌সে হিমালয়ের এক টুকরো

পাইন বনের বুক চিরে আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। যতদূর দৃষ্টি যায় ঘন সবুজ আঁচল বেছানো উঁচু-নিচু প্রান্তর দিগন্তে গিয়ে পাহাড়ে মিশেছে। অনেকটা যেন রাঁচীর পাহাড়—তবে আরও সবুজ। ভারী মিষ্টি লাগছে।

পথ সরু হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হয়। গাড়ীর গতিবেগও এসেছে কমে। বাঁয়ে মোড় নিতে নিতে ফিস্ ফিস্ করে বললেন বান্ধবী, 'খুনের কারখানা'। আঁতকে উঠি। অকস্মাৎ একি ছন্দপতন! এখানে এসেও রেহাই নেই? ঘাড় ফেরাতেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে—হের কুন-য়ের গামলার কারখানা। জার্মান উচ্চারণে ক আর খ-য়ের তফাৎ আমি মোটেই ধরতে পারিনা। যাক এই শীতেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

ভোক্‌স্ ওয়াগেন্‌ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল। গাড়ীর এবং আমাদেরও যাত্রা হল শেষ। সামনেই এক সারি তিব্বতী পতাকা উড়ছে। তার পেছনে গুম্ফা—যার জন্যে এতটা পথ আসা: দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। মনে পড়ে গেল লাহুল, স্পিতি ও মান্তাংয়ের কথা। কিন্তু এতো সুইটজারডুট্‌স্ অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, আর ভাষাও তিব্বতী নয়—জার্মান। গুম্ফার দোরগোড়ায় প্রধান লামা লোদ্‌রো তুক্‌লু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে অভ্যর্থনা জানালেন। আর সখেদে জানালেন যে ভারতীয়রা ভুলেও 'তাঁর' এই রিকন গাঁয়ে পায়ের ধুলো দেননা। মহা সমাদরে তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর খাস কামরায়। পুরু গালিচায় বসে আরাম করে চা খেতে খেতে প্রাণের কথা শুরু হল।

হঠাৎ লক্ষ্য করি আমার পঞ্চাশ বছরের তরুণী বান্ধবী বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। সেই ১৯৬২ সালের কথা। তিব্বতীদের প্রথম দল আসার পর থেকেই ইনি তাদের সাহায্য করে আসছেন। তবে মাটিতে বসাটা এখনও ঠিক রপ্ত করে উঠতে পারেননি। আর মনে হচ্ছে পারবেনওনা কোন দিন। নাম ডক্টর ব্লাঞ্চে ওলস্‌চাক। জন্ম অষ্ট্রিয়ায়, তবে জাতিতে সুইস। এঁর প্রতিষ্ঠিত এ্যাসোসিয়েশান অফ টিবেটান হোম্‌স্ এখন এক বিরাট প্রতিষ্ঠান: প্রথম দিকে শুধু বক্তৃতা দিয়েই তিনি নাকি সাড়ে সাত লাখ টাকা তুলে এর পত্তন করেন। এখানকার তিব্বতী যুবগোষ্ঠির কাছে ইনি মাতৃ স্বরূপিনী।

'দেশের লোক' হাতের কাছে পেয়ে তুক্‌লু লামা সেই থেকে একটানা নানা কথা বলে চলেছেন।

আমি ইতিমধ্যে খুটিয়ে খুটিয়ে চারিদিক দেখে নিচ্ছি। না কোন খুঁত নেই। ছোট্ট তিব্বতী মন্দির কে যেন হিমালয় থেকে তুলে এনে আল্‌প্‌সের কোলে বসিয়ে দিয়েছে। কিছু পুঁথি ও বইপত্তরও এসে গেছে—একটি টিবেটান ইন্সটিটিউট গড়ে উঠছে। লামাজী বলে চলেছেন, 'এতো করছি কিন্তু আমাদের চ্যাংড়া ছোঁড়াদের এদিকে নজরই পড়েনা। ভারতীয় টুরিষ্টদেরই শুধু শুধু দোষ দিই কেন। আগে ছোঁড়ারা অন্ততঃ গাঁয়ের মধ্যে দেশী পোষাকটা পরতো। সে পাটও ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। আর ভাষা ? মনে হয় ওরা তিব্বতীর চেয়ে জার্মান ভাষায় অনেক সহজ।'

বোঝা গেল, এ হোল সেই চিরন্তন জেনারেশান গ্যাপ। অনেক ভেবে চিন্তে লামাজীকে থামাবার জন্য মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করি, 'লামাজী আপনার স্যাণ্ডালটি যে ইটালিয়ান ইটালিয়ান ঠেকছে!' দিন কয়েক আগে ইটালীতে ছিলাম। এটাই হোল সেখানকার আধুনিকতম ফ্যাশান।

বাক্যস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হোল, একবার নিচু নজর বুলিয়ে দিলেন, 'ঠিক ধরেছেন তো! আমি লামা, আমাকে যা দেবে তাই পরবো। বুড়োরা আছে, তাই টিকে আছি। এরপর কি করে যে চলবে, ভগবান তথাগতই জানেন!' একবার আড় চোখে ডাঃ ব্লাঞ্চের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'ছোঁড়ারা এখন এদেশী মেয়ে বিয়ে করতে পারলে আর ছাড়েনা। আমরা মিশে যাবো, মুছে যাবো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভগবান তথাগতের বোধহয় তাই ইচ্ছে।'

ইতিমধ্যে গাঁয়ের কিছু লোকজনও এসে পড়েছেন। সবাই অবশ্য তিব্বতী পোষাকে। অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েও কিছু কিছু দেখলাম। শুনলাম এই প্রধান লামা ছাড়া আরও পাঁচজন লামা আছেন এদেশে। ৬২৯ জন উদ্বাস্তু ছোট ছোট দলে ধীরে ধীরে আসেন এবং সবাইকে উত্তরপূর্ব সুইজারল্যাণ্ডে পুনর্বাসন করা হয়। সেজন্যে এদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এখনও বজায় আছে। লামারা যে যার এলাকা ভাগ করে নিয়েছেন। দালাই লামার জন্মদিনে সবাই চেষ্টা করেন প্রধান লামার এই রিকন্ গাঁয়ে আসতে। সারা দিন ধরে চলে নাচ গান আর তিব্বতী মদ্য (ছ্যাং) পান। সবচেয়ে বড় তিব্বতী গ্রাম অবশ্য রিকন নয়—পেস্তালোৎসি। ছেলে মেয়েদের মধ্যে ১১৯ জনের জন্ম এদেশে। এরা মনে প্রাণে প্রায় সুইস। বয়স্কদের মধ্যে কয়েকজন দেশে ফেরার কথা বললেও, অল্প বয়েসীদের মধ্যে সে কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। তবে কেন জানিনা এরা ফুটবল টিমের নাম দিয়েছেন 'লাগা বয়েজ'। কলকাতার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব আর কি।

পশ্চিম জার্মানীর মতো অতোটা না হলেও সুইজারল্যাণ্ডে শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, বিশেষ করে গাঁয়ের দিকে। তাই গাঁয়ের ছোট ছোট কারখানায় চাকরী পেতে তিব্বতীদের

কোন অসুবিধে হয়নি। জুরিখে অনেক তিব্বতী ছেলেকে ইলেকট্রিক ও কলের মিস্ত্রির কাজ করতে দেখেছি। ১৯৭০ সাল থেকে অবশ্য বিদেশী শ্রমিকদের ওপর এখানে কিছু কিছু বিধি নিষেধ চালু করা হয়েছে।

শুধু একটি ব্যাপারে দেখেছি ছেলে বুড়ো সবাই একমত। তা হোল, দেশ থেকে কিছু ইয়াক্ আনতে হবে। শীতের দেশে পার্বত্য অঞ্চলে ইয়াক যে কতো প্রয়োজনীয়, তা ওরা সুইস সরকারকে বোঝাতে পেরেছেন। শিগ্‌গীরই নাকি একটা বন্দোবস্ত হবে।

জুরিখে ফেরার পথে ভাবছিলাম—নিষিদ্ধ দেশের ইয়াক্ আর এই জার্মান ভোক্‌সওয়াগেন, এদের মধ্যে পার্থক্য হোল ঘণ্টায় তিন আর একশ' মাইল, আর যোগসূত্র হল এরা—সুইজারল্যাণ্ড 'প্রবাসী' ৮৪৮ জন প্রাণোচ্ছল তিব্বতী ভাই বোনেরা।

…প্রকৃতির এই বিরাট ও মহান্ রূপরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন-মৃত্যুর ভেদাভেদ বোধও যেন লুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয়, জন্ম-মৃত্যু — সে যেন এক অবিচ্ছিন্ন-সুরের খেলায় বিভিন্ন সপ্তক মাত্র। পরস্পর-বিসম্বাদী নয়, একের রেশ অপরের মধ্যে সহজেই মিলিয়ে যায়। সুরের অনন্ত খেলা চলতে থাকে।

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সমীরকুমার বসুর

শৈলাবাসে ক'দিন

ধ্যান গম্ভীর হিমালয় মানুষকে করে তোলে উদাস—সন্ন্যাসী। যে একবার হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার অবলোকন করেছে সেই হয়েছে "সন্ন্যাসী"। হিমালয়ের আকর্ষণ তাকে করেছে গৃহছাড়া বার বার। অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের যেন শেষ নেই। প্রতিক্ষণে তার রূপ মানুষকে করেছে অবাক প্রাণ হয়েছে আকুল। হিমালয়ের এই পথে আছে যত দুঃখ কষ্ট, ততই আছে সুখ আনন্দ। এর মধ্যে মানুষ খুঁজে পেয়েছে শান্তি। প্রাত্যহিক কঠিন বাস্তব জীবনের সকল শ্রান্তি থেকে পায় মুক্তি। একঘেয়েমি জীবনের অন্তরালে নিশ্ছিদ্র শান্তির খোঁজে আমার মনও হয়ে ওঠে ব্যাকুল। তাই তো বার বার ছুটে যাই হিমালয়ের পাদদেশে।

১৯৭০ সালের মার্চ্চ মাস। মনে হল ঘুরে আসি পরম শান্তির আস্তানায়। বেরিয়ে পড়লাম নৈনিতালের উদ্দেশ্যে। রাত্রি ৮/৫৫ মিঃ সময় ট্রেন হাওড়া ষ্টেশন থেকে ছুটে চলল। পরদিন বৈকাল ৪টার সময় লক্ষ্মৌ ষ্টেশনে। এখান থেকে কাঠগুদাম। টিকিট কেটে চেপে বসলাম ট্রেনে। রাত্রি ৯/১৫ মিঃ সময় আমাদের নিয়ে গাড়ী যাত্রা করল কাঠগুদামের পথে। পরদিন সকাল ৮ টায় নামলাম কাঠগুদামে। খুব হাল্কা লাগছিল মনটা। এই তো এসে গেছি আমার পরম শান্তির স্থানে। ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছে বাস এবং প্রাইভেট ট্যাক্সি। বাসে প্রচণ্ড ভীড়। তাই শেয়ারে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। পরিচ্ছন্ন পথে ঘুরে ঘুরে পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করে; কখনও এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ের বুক চিরে এগিয়ে চললাম আমরা। হাজার হাজার ফিট উঠছি আবার নামছি। ঘণ্টা তিনেক পরে পৌছালাম নৈনিতাল। "তাল" অর্থ হ্রদ। নৈনির হ্রদ—তাই নৈনিতাল। ছবির মত সুন্দর করে সাজানো এই ছোট্ট নৈনিতাল শহর। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন শহর। ছোট বড় বহু হোটেল আছে। ভারি সুন্দর এই হ্রদ বা লেক। নৈনিতালের স্বপ্ন-সৌন্দর্য্য, এই লেক। অনেক সুন্দর সাজানো নৌকা আছে। এক টাকার বিনিময়ে এই নৌকায় চড়ে চিত্ত বিনোদনের অপূর্ব্ব সুযোগ। নৈনিতালের প্রাকৃতিক আকর্ষণ আছে। এখানকার বাজারটি ছোট্ট এবং সুন্দর। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ থেকে বিলাস সামগ্রী সবই মেলে এখানে। এখানকার "চায়না পিক" থেকে শত শত মাইল দূরের শুভ্রতায় আচ্ছাদিত হিমালয়ের শৃঙ্গমালা দেখা যায় যদি প্রকৃতি বিরূপ না হন। নৈনিতালকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কৌসানির পথে।

কৌসানির ডাকবাংলোর ব্যবস্থা করতে গেলাম আলমোড়া। সব ব্যবস্থা সেরে পরদিন প্রত্যুষে বাসে চড়লাম। চার ঘণ্টার পথ। বসেছিলাম ড্রাইভারের পাশে আপার ক্লাসে। পেছনে স্থানীয় অধিবাসীর প্রচণ্ড ভীড়। ওদের দুর্ব্বোধ্য কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি। ওদের ভাষা বোঝার

ব্যর্থ চেষ্টা করছি, আবার পরক্ষণে হিমালয়ের শত সহস্র রূপের মধ্যে পড়ে ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। এত রূপ—এত ঐশ্বর্য্য! এও কি সম্ভব? কিছুক্ষণ বাস চলার পর একটি জায়গায় বাস থামলো—শুনলাম এখানে টোল ট্যাক্স দিতে হবে। ট্যাক্স মিটিয়ে বাস আবার চলতে শুরু করল। কয়েক ঘণ্টা চলার পর একটি ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামে এসে বাস থামলো। ড্রাইভার সাহেব নেমে গেলেন। আমাদের বাসের ইঞ্জিনের ডালা খুলে বিশ্রাম দেওয়া হল। আমাদেরও বিশ্রাম। নেমে এলাম বাস থেকে, ঘুরে দেখলাম এই পাহাড়ী গ্রাম। বেশ ভাল লাগল। রেডিও বাজতে শুনলাম। সভ্যতার, আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে শত সহস্র মাইল দূরের নিশ্চিন্ত পাহাড়ের কোলে। দেখলাম এক জায়গায় বেশ ভীড়। ছুটে গেলাম। দেখলাম একটি লোক "পকৌড়ি" ভাজছে আর একটি ছেলে সকলের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। আমিও কিনে ফেললাম কিছু। ভারি সুন্দর লাগল। এর মধ্যে ড্রাইভার সাহেব বাসে চড়ে বসে বার বার হর্ণ বাজিয়ে যাত্রীদের ডাকছে। ছুটে এসে চড়ে বসলাম নিজের স্থানে। আবার যাত্রা শুরু। হাজার হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের বুক চিরে সকাল প্রায় দশটার সময় নামিয়ে দিল কৌসানিতে। দেখলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে ছোট্ট দু'একটি দোকান। একটি দোকানঘরের মধ্যেই ডাকঘর। অতি দরিদ্র অধিবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী চড়া দামে মেলে এই দোকানে। বেশ কিছু পথ চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে এসে পৌঁছালাম ডাকবাংলোয়। আলমোড়া থেকে আনা পরিচয় পত্র দেখে পরিচারক আমাদের ঘর খুলে দিল। কুলি মালপত্র সব ঘরে তুলে দিল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমার বহু প্রতীক্ষিত দিগন্ত প্রসারি শুভ্রতায় আচ্ছাদিত ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে। বার বার মনে হতে লাগল—আমি নিদ্রিত, না জাগ্রত? একি স্বপ্ন, মায়া না সত্য! এত রূপ — এত ঐশ্বর্য্য! একি সম্ভব? —প্রাণভরে দেখলাম সামনে বিরাজিত ঐ স্তব্ধ মহাকাল। অনাদি অনন্তকাল ধরে বিরাজিত সত্য ও চির শান্তির প্রতীক ঐ দেবতাত্মা হিমালয়কে।

হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গগুলির মধ্যে অন্যতম নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, পাঞ্চুলীর রূপ মাধুর্য্যই কৌসানির বৈশিষ্ট। —বাংলোর পরিচারক আমাদের খাবারের সব বন্দোবস্ত করে দিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়তে থাকে। গায়ে গরম জামা রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝলমলে শিখরদেশ বিলুপ্ত হয়ে যায় মেঘের কোলে। এ এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিছু আগে যে শৃঙ্গগুলি তার ঐশ্বর্য্যমহিমায় ঝলমল করছিল এই মুহূর্ত্তে তা অদৃশ্য। হিমালয়ের বুক জুড়ে চলতে থাকে মেঘ আর আলোর লুকোচুরি খেলা।

কৌসানির বুকে নেমে আসে সন্ধ্যা। প্রকৃতি হয়ে আসে শান্ত। অন্ধকারের কোলে বিলীন

হয়ে যায় ঐ গিরিরাজ। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হিমেল হাওয়ার গতি যায় বেড়ে। পাহাড়ের কোলে দেবদারু, পাইন বনের মধ্যে দিয়ে যখন এই বাতাস ঝড়ের মতো বয়ে চলে তখন মনে হয় যেন পৃথিবীর বুকে চলছে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য—এখনই বোধহয় পৃথিবী যাবে ধ্বংস হয়ে!

ভোর হবার আগেই ঘুম গেল ভেঙ্গে। বহু প্রতীক্ষিত আশা নিয়ে বাংলোর জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন গিরিরাজ ও প্রকৃতির দিকে। ধীরে ধীরে আকাশ হয়ে উঠলো লাল। গভীর নিদ্রার কোল থেকে জেগে উঠছে প্রকৃতি—জাগছে গিরিরাজ হিমালয়। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে অরুণালোকের দীপ্তি। মনে হচ্ছে উত্তাল তরঙ্গিত বিশাল সমুদ্র হঠাৎ কার ইঙ্গিতে হয়ে গেছে নিশ্চল। শৃঙ্গের বরফে অরুণালোক প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে লাগল। নয়নমেলে দেখলাম আর উপলব্ধি করলাম সত্যকে। এখন বুঝলাম ঐ "স্তব্ধ মহাকাল" কোন্ যাদুমন্ত্রে মানুষকে করে গৃহছাড়া।

এবার আমাদের আবার যাবার পালা। এগিয়ে চলার এসেছে ডাক। হে গিরিরাজ হিমালয়, বিদায়ের বেলা জানাই তোমারে প্রণাম············।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের

পারিজাতের সন্ধানে

শৈশবের কথা। একদিন আমাদের ইস্কুলের মাঠে শ্রীবুদ্ধ বসু তাঁর হিমালয়-অভিযানের রঙীন ছায়াচিত্র 'মানস সরোবর নন্দনকানন' দেখাচ্ছিলেন। হিমালয়ের ভুন্দর নদী উপত্যকার দুর্গম প্রদেশে এই নন্দন-কানন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ও সুন্দর পরিবেশের মাঝে প্রস্ফুটিত নানা রঙের নানা জাতের অপূর্ব কুসুম সমাবেশের মাঝে একটা সাদা রঙের বড় পদ্মের মত ফুলের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন এটাই হচ্ছে স্বর্গের পারিজাত বা ব্রহ্মকমল ফুলের ছবি। আজও সেই ছবিটা আমার মনে স্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে। সেদিনই ঘরে ফেরার পথে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে হিমালয়ের এই অমূল্য ফুলটিকে নিজের চোখে গাছে ফুটন্ত অবস্থায় স্বাভাবিক পরিবেশের মাঝে দেখব। শাশ্বত সুন্দর যুগ-যুগান্তের কুসুম-শোভা-সমারোহ দেখে চোখ ও মনকে সার্থক করব।

পরবর্তী জীবনে হিমালয়-প্রেমিক মানুষের কাছে এই ফুলের বর্ণ-গন্ধ ও রাজকীয় অবস্থিতির গল্প আমার শৈশবের আকাঙ্খাকে আরও প্রবল করে তোলে। দেবভূমি হিমালয়ের সব ফুলের মাঝে দেবপূজার এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়েছে তাকে সম্রাটের সম্মান। জ্যোর্তিময়, সুনির্মল শুভ্র-কান্তি পুষ্প, যার তীব্র গন্ধ ও স্নিগ্ধরূপ দশদিক বিমোহিত করেছে তাকে চর্মচক্ষে দেখতে প্রাণে জেগেছে উদগ্র বাসনা। কিন্তু দেখার সে চরম সুযোগ মেলা শক্ত। তার দর্শন পেতে হ'লে যেতে হবে দেবতাত্মা হিমালয়ের অন্দর মহলে। দিতে হবে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মূল্য। তাই চেয়ে থাকি মিলনের শুভলগ্নের অপেক্ষায়—কল্পনায় দিনের মালা গেঁথে ভবিষ্যতের দিকে।

অবশেষে হিমালয়ের হাঁটাপথের নিমন্ত্রণ এল। গহন-গিরি-কন্দরের নিমন্ত্রণ। হিমবন্তের হিমশীতল অন্তরের ডাকের স্নেহ-আমন্ত্রণ। দেহের অনু-পরমাণুতে উপলব্ধি করি সেই জন্ম-জন্মান্তরের আহ্বানের ইঙ্গিত। একদিন পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম গঙ্গোত্রীর মন্দির চত্বরে। পূজারী সস্নেহে স্মিতহাস্যে অকারণে হাতে তুলে দিলেন মন্দিরের দেবতার নির্ম্মাল্য কয়েকটি শুকনো ব্রহ্মকমল ফুলের কুঁড়ি। মাথাপেতে গ্রহণ করি সেই স্নেহের দান। মন তবু তৃপ্ত হয় না। এ যে বৃন্তচ্যুত ব্রহ্মকমলের হৃতশ্রী রূপ। মন চায় গাছের ডালে ফুটে থাকা হিমালয়ের খেয়ালী হাওয়ায় আন্দোলিত ফুলের স্বাভাবিক রূপ-সৌন্দর্য্য পান করতে। যে রূপে সে বার বার নিজেকে আন্দোলিত করে স্বাগত জানায় যাত্রীকে। আবার এগিয়ে চলি, গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ হ'য়ে তপোবনের পথে। কিন্তু তবু পথে তার দেখা মিললো কই? এবার এলাম কেদারে। আবার সেই বৃন্তচ্যুত ব্রহ্মকমলের দর্শন। যাওয়া হোল না বাসুকীতালে। ফলে অদেখা রয়ে গেল গাছে ফোটা

ব্রহ্মকমলের। এলাম বদরিনাথে। এগিয়ে গেলাম বসুধারা পর্যন্ত। হায়, এ পথেও দেখা পেলাম না আমার সেই শৈশবের স্বপ্নের ফুলের! ব্যথাভরা মন নিয়ে পথ চলি।

ঠিক এমনি ভাবে বোধহয় আকুল হ'য়ে পুরাকালে ব্রহ্মা কেদারনাথে এসে কঠিন পাহাড় আর বরফের মাঝে শিবের অর্চনার জন্যে একটি ফুলও না পেয়ে মনের দুঃখে একদিন কেঁদে ছিলেন ভোলানাথের পদপ্রান্তে। সে কান্নায় কেদারনাথের মন গললো। ফলে তাঁরই কৃপায় ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দু মিলিত হয়ে রূপনিলো এক অনিন্দ্যসুন্দর পুষ্পের। ব্রহ্মা আনন্দে সেই শ্বেত পুষ্প হাতে নিয়ে অর্চনা করলেন কেদারনাথের। সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা ব্রহ্মাকে বর দিতে চাইলেন। ব্রহ্মাও সঙ্গে সঙ্গে বর চেয়ে বসলেন যে প্রতি বছর এই সময় যেন এখানে এই শুভ্র পুষ্প পাহাড়ের ধারে ধারে প্রস্ফুটিত হয় "ব্রহ্মকমল" নামে, আর এই ফুল দিয়ে কেদারনাথের অর্চনা করলে তিনি যেন সেই ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন।

ভগবান পরিশেষে প্রসন্ন হলেন আমার প্রতি। লোকপালের পথে আর নন্দন-কাননে প্রথম সার্থক হ'ল আমার সেই স্বপ্ন। দ্বিতীয়বার রূপকুণ্ডের পথে কৈলুবিনায়কের পদতলে ও বগুয়াবাসায় দেখলাম অগুন্তি ব্রহ্মকমল ফুল। দু'-তিন হাত উঁচু গাছ। পাতাগুলো লম্বা, মাটিতে ছড়ান আর সে ছড়ান পাতার মাঝখান থেকে উঠেছে রজনীগন্ধার মত একটি ডাঁটি বা ডাল। আর এই ডালের মাথায় একটি বৃহদাকার শ্বেত পদ্মের মত ঈষৎ নীলচে আভাযুক্ত সাদা পাঁপড়ির মাঝে রাজকীয় ভঙ্গিতে ফুটে আছে ব্রহ্মকমল! একটি গাছে একটি ফুল। রাস্তার দু'ধারে ফুটে আছে অজস্র। অকৃপণ, অসংখ্য শ্বেত পুষ্পের স্তবক। মাথার ওপর সুনীল আকাশ। চারিদিকে গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণীর প্রাচীর আর তার মাঝে শুভ্র ফুলের জগৎ। অপূর্ব নয়নাভিরাম সে কুসুম-শোভা। তীব্র গন্ধে চারিদিক আমোদিত। নেশাধরা বাতাসে দশদিক প্লাবিত। স্নিগ্ধ অথচ প্রফুল্ল ভাব জাগায় মনে। আনন্দের আতিশয্যে আলিঙ্গন করি আমার প্রাণের ধনকে। হারিয়ে ফেলি নিজেকে অসীম সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে। পরক্ষণেই আবার মনে মনে ভাবি পাহাড়ের বুকে পদ্মফুল! আমরা ত' সবাই জানি পদ্মফুল জলেই ফোটে। অবশ্য স্থলপদ্ম স্থলে ফুটলেও পদ্মের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। কিন্তু পাহাড়ের বুকে ফোটা ব্রহ্মকমলের রূপ তো জলের শ্বেত কমলেরই অনুরূপ। এদের মধ্যে আছে চেহারার প্রচুর মিল।

উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এর বটানি নাম হোল SAUSURIA যা হিমালয়ের কয়েকটি বিশেষ স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সাধারণতঃ ১১০০০´ ফিট থেকে ১৫০০০´ ফিটের মধ্যে জন্মাতে দেখা যায়। এই ফুলের রূপের বাহার বেশী করে ফোটে জুলাই-আগষ্টে, বর্ষার জল পাবার পরে। সেপ্টেম্বর ও

অক্টোবরে ফুল ঝরার পালা। গাছের বীজ শীতকালে ঘুমিয়ে থাকে সাদা বরফের তলায়। শীতের শেষে মে-জুন মাসে চারা গাছের জন্ম। এইভাবে ফুলের জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলছে অনাদি অনন্তকাল ধরে। এর জ্যোতির্ময় শাশ্বত শ্বেতরূপের আলোয় আমার কাছে চাপা পড়ে গেছে সমগোত্রীয় ফেনকমলের রূপমাধুর্য্য। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বলে ফুলের নাকি স্বতন্ত্র বাসস্থান, জন্ম ও জাতিভেদ আছে। যে জায়গায় ও যে আবহাওয়ায় বা যে পরিবেষ্টনে যে ফুলের জন্ম হবার কথা সেখানেই সেই সব ফুলের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই বোধহয় হিমালয়ের মাত্র বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলেই ব্রহ্মকমলের বাসস্থান। আশ্চর্য্য হয়ে দেখি ৮,০০০´ ফিট নীচে এলেই সঙ্গে আনা ফুলের রূপ-মাধুর্য্য কেমন যেন বিকৃত হয়ে যায়। ফুল-সম্রাট ব্রহ্মকমল স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি। মানুষের বিস্ময়ের বস্তু। তাই মনে হয়, এই বিস্ময়কর আয়ুর্ব্বেদীয় গুণসম্পন্ন ফুলের সন্ধানেই মানুষ একদিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে হিমালয়ের কয়েকটি দুর্গম ও দর্শনীয় স্থানকে। এর অনিন্দ্য রূপকান্তি প্রতিবার আমাদের দুর্গম ও কঠিন হিমালয় পথাতিক্রমণের মাঝে প্রাণে দিয়েছে স্নিগ্ধ ধারার পরশ। ফলে প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলময় হিমালয়ের প্রতিটি পথই আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে দেবতার মন্দির। ফুলের অকলঙ্ক শুভ্রতায় সেই দেবতার প্রকাশ। সেই তো পরমতীর্থ। এর মাঝেই দেখেছি দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মংগলঘট।

হিমালয়ের খেয়ালী হিমেল হাওয়ায় ঝুরু ঝুরু দোল খাওয়া ব্রহ্মকমল ফুলের শ্বেতসত্বাটি তাই আজও আমার মানস-নয়নে এক স্বর্গীয় দ্যুতিতে ভরিয়ে তোলে। এর মাতাল করা গন্ধে নেশার রোমাঞ্চ দেহের সর্বসত্বাকে এখনও বারে বারে শিহরিত করে। সে দেখার পরম-লগ্নের মুহূর্তের অনুভূতির উষ্ণতার স্মৃতি আজও ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের আবেশ হিল্লোলে ভরিয়ে তোলে। জীবনের শূন্য ভিক্ষাপাত্র হিমালয়ের এই মংগল-শঙ্খ সদৃশ ব্রহ্মকমল ফুলের পরশের কণায় সোনা হয়ে গেছে। দেখেছি এর মাঝে স্রষ্টাকে খুঁজে খুঁজে আর তাই দু'হাত ভরে আমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপহার ব্রহ্মকমল ফুল কুড়িয়ে এনেছি আমার ধূলির ধরণীতে, স্বর্গের দরজা থেকে।

কুমারেশ ঘোষের

হাতের কাছেই বাংলাদেশে

দু'যুগ পরে এক নতুন যুগের প্রভাতে আমাদের পুরোন বাংলার মাটিতে আবার আমরা এসে দাঁড়ালাম। —পশ্চিমবঙ্গের আমরা বাঙ্গালী—ইংরেজের বাঁশে আর পাক-পাকানো দড়িতে বাঁধা নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে গেলাম পূব-বাঙ্গালী ভায়েদের সঙ্গে হাত মেলাতে মন মেলাতে। —এই মিলন ব্যবস্থাটি করেছিলেন, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ৫ই মার্চে; এবং আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক এবং বেশ কয়েকজন সাহিত্য-রসিক দু'বাস ভর্ত্তি হয়ে রওনা দিলাম নতুন বাংলাদেশ দর্শনে: জয় ভারত! জয় বাংলা!

সম্মেলনের অন্যতম কর্ণধার ডাঃ কালিকিংকর সেনগুপ্ত মশায়ের সঙ্গে গাড়ি চেপে ঐ ভোর সাড়ে ছটাতেই দেখি সত্ত জাগা বিধান সরনির ঐ কার্যালয়টি ইতিমধ্যেই বেশ সরগরম। আশ্চর্য, লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী দেখি সেই দূর-দখিনের গড়িয়া থেকে রেনুকা করের সঙ্গে গাড়িতে কখন যেন এসে অফিস ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। সঙ্গে কর্তা নেই। কারণ, আমাদের মত তাঁর মাথার স্ক্রু-টা ঢিলে নয়। —আর ভয় পেয়ে গেলাম, দেখি, অফিসঘরে এককোণে কয়েক আঁটি খড়! —আমাদের খাদ্য নাকি?

সম্পাদক সুরেন নিয়োগী মশায়কে ধরলাম। করুণ-বচনে বললাম, হ্যাঁ মশায়, তা খাদ্যের ব্যবস্থাটা করলেনই যখন, তখন ঐ সঙ্গে একটু চুনি-ভুষি হলে···। —পরে ভুল ভাঙলো। বাসে উঠে দেখি, ওটা খাওন-এর নয়, শয়ন বা 'বস'নের ব্যবস্থা। —বাসের গায়ে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সালু-সাঁটা। কাজেই ওপার-বাংলার চেক পোষ্টে কোন চেকিং নেই। শুধু সাদর আহ্বান। হাসি মুখ। —পেট্রাপোল আর বেনাপোলের মাঝখানের নতুন-গড়া ভ্রাতৃত্বের পোল দিয়ে আমরা এগুতে লাগলাম পীচ পালিশ পথে। ডানদিকে সেই কলকাতা-যশোরের রেলপথ আর দু'ধারে চাষের মাঠ।

পশ্চিমবঙ্গের মাঠের সঙ্গে এই বাংলাদেশের মাঠের কোন তফাৎ নেই। চাষী চাষ করচে লাঙল দিয়ে। ন্যাংটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। আমের মুকুল ছেয়ে আছে গাছে গাছে। আর দেখি ছোট ছোট খেজুরগাছের বুকে বাঁধা রসের ভাঁড়। খাজুরী-বিবি বুঝি অল্প বয়েসেই রসবতী যুবতী। —আর সেই মানুষগুলো? তেমনিই আছে। রহিম চাচা, মরিয়ম চাচী, এরফান, হাবুল সর্দার, ফাজিল প্রামানিকরা। এদের অনেকেই আমাদের কাছে পালিয়ে এসেছিল প্রাণের ভয়ে, এখন ফিরে গেচে নিজেদের ঘরে—ভাঙা ঘরে, পোড়া ঘরে, খালি ভিটেয়। —হ্যাঁ, তফাৎ

আছে। তাদের ঘর দরজা আজ ভাঙা। কত আপনজনের রক্তে তাদের মাটিও রাঙা। তবে সেই মাটিতেই ফসল ফলাতে তারা বদ্ধপরিকর। সবুজ ফসল, প্রেমের ফসল। তাই তাদের শক্ত হাতে লাঙল ধরা।

মাঝে চাষীদের লাঙল চষা দেখে ভাবছিলাম, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটির কথা: ওরা চাষ করে! রাজা বদলায়, ওরা বদলায় না। ওদের কাজও থামে না। সে সব আগে হতো। যখন রাজারা একটি মাঠ ঠিক করে নিয়ে বলতো, আরেরে, পাপিষ্ঠ পাপাচার! আয় তোকে দিই আছাড়! এখন লড়াই মানে রীতিমত নড়া-চড়াই। এখন যুদ্ধ করে 'রাজায়-রাজায়' উলুখড়ের প্রাণটা যায়। ভিটে মাটি ছেড়ে পালাতে হয়। —ঐ চাষীদের তাই অনেকেই চাষ-বাস ফেলে পালিয়েছিল, এখন ফিরে এসেচে ঘরে। চাষ করচে, বাস করবার ঘর বাঁধচে। —দেখলাম, ঘরের টিনের চাল নেই, পাকা দালানের দরজা-জানালা নেই— অনেক কিছুই নেই।

খাদ্যেরও অভাব। দুপুরে যশোর সহরের কাছে চাচড়ায় এসে বাস দাঁড়ালো। ছোট্ট বাজারটা চঞ্চল হয়ে উঠলো, —আমাদের দেখতে, ব্যবসায়ীরা জিনিষ বেচতে। বি-এ অনার্স পড়া দুটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। বাসের মধ্যে এলো সন্দেশের থালা হাতে লুঙ্গী পরা ছেলেরা—বিক্রীর আশায়। কিনলাম, ননীতোলা দুধের ছানার সন্দেশ—আমাদের রাতাবী সন্দেশের সাইজ, দাম কুড়ি পয়সা, কিন্তু স্বাদ নেই। তাদের একজনকে জিগ্যেস করলাম, নাম কি তোমার? বললে আবদুল রউফ। যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলে? কোথায় আবার, আপনাগোর ছাশে। ডাব খেলাম, ছোট সাইজ—তিরিশ পয়সা। ভারতীয় পয়সা বেশ চালু, পাক-পয়সা এখনও অচল হয়নি। আর মন দুজনেরই সমান এখন।

ডাব-সন্দেশ খেয়ে বুঝলাম, ওপারের বাংলা-মা এখনও দীন-দুঃখিনী, নিজেরই এখন উদরান্নের চিন্তা, তাই তাঁর উদার হাত বাড়াতে এত ঔদাসীন্য। —ওখান থেকে সাগরদাঁড়ির পথে মনিরামপুর, তারপর পড়লো কেশবপুর। মোদক মশায়ের একটা খাবারের দোকানে নিমকি সিঙ্গাড়া আর কাঁচা গোল্লা, কিনে খেলাম অনেকেই। বিস্বাদ না হলেও, আহা-মরি স্বাদের নয়। পান খেলাম, কলকাতার মতই এক খিলি পাঁচ পয়সা। একটা ওখানকার মার্কা দেশলাই কিনলাম, সাইজ ছোট, দাম দশ পয়সা। —ওখানে আলাপ হলো ডাঃ সুকল্যাণ কুমার ঘোষের সঙ্গে। ওখানেই ডাক্তারী করে। প্রাণের আবেগে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। আলাপ হলো প্রমোদ কুমার দত্তের সঙ্গে। যশোরের মধু-সংঘের সদস্য। অনেকেই বাড়িয়ে দিলেন খাতা কলম। স্মৃতি স্বাক্ষর চাই।

পরে আট-দশ মাইল খোয়ার রাস্তায় ঝাঁকানি খেতে খেতে এলাম শেষে কবি শ্রীমধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি গ্রামে। রাস্তার ধুলোয় ধূসরিত হয়ে গেলাম বাসের সবাই আমরা—তীর্থরেণু। বেশ-বাস হলো গেরুয়া। মনও তখন রাঙানো। শান্ত, সুন্দর, শ্যামাঙ্গী গ্রামখানি। আর আম-কাঁঠালের গাছের মধ্যে, বড় একটা দীঘির পাশে বিরাট একখানা জমিদার-বাড়ি। জীর্ণ। ভগ্ন। তবু যেন ধ্যানমগ্ন। সামনে একটা বেদী। তাতে কবির মূর্তি। তলায় লেখা সেই 'দাঁড়াও পথিকবর—!' —আমরা দাঁড়ালাম। ফটো তুললাম। ভাষণ দিলাম, স্মৃতি পূজা করলাম এবং সম্মেলনীর পক্ষ থেকে আশাপূর্ণা দেবী বেদীতে বসালেন স্মৃতি-ফলক। তারপর আমরা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। একটা ইঁটের ঢিপিতে দেখলাম একটা বোর্ড লাগানো 'কবির জন্ম গৃহ'। সামনেই একটা তুলসী মঞ্চ। থাকবেই তো! এই গৃহেই তো একদা এক হিন্দু শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যিনি পরে খৃষ্টান হয়েছিলেন, অথচ হিন্দুর রামায়ণকে বিষয়বস্তু করে লিখেছিলেন অমিত্রাক্ষরে কবিতা লিখে স্বর্ণাক্ষরে নাম রেখে গেচেন বাংলার ইতিহাসে এবং পরে মানুষ খৃষ্টান মধুসূদন দত্ত হয়েছেন কবরস্থ।

বাড়ির পুকুরঘাটটায় গিয়ে ভাবলাম, কবি এই ঘাটে বসে তেল মেখে কী স্নান করেন নি কখনো? করেচেন হয়তো! গেলাম সেই কপোতাক্ষ নদীর তীরে। ছোট নদী। আজও তেমনি বয়ে চলেচে তরতর করে। নদীর ধারে তৈরী হয়েচে নতুন মধুসূদন পাঠাগার। একটি বড় স্কুল বাড়িও। —ফেরবার সময় কবির বিরাট ভগ্ন বসতবাটির দিকে আর একবার চেয়ে দেখলাম। এ সংসারে কিছুই চিরদিন থাকে না। —না থাকে। ইঁট পাথরের রাজপ্রাসাদ থাকে না, থাকে কল্পনার রাজপ্রাসাদ। কবি-কল্পনায় স্বর্ণলঙ্কার রাজপ্রাসাদ আজও জ্বলজ্বল করচে।

রাস্তায় আমাদের বাসের পেছনের ডবল চাকার একখানা গেল ফেঁসে। তবু কোনরকমে নেংচে নেংচে আমরা হাজির হলাম যশোরের দোর গোড়ায়—রেল গেটের কাছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার একটা টায়ারের দোকান দেখতে পেয়ে থেমে গেল। ভাবটা, ঢের চলেচি আর তো যাবো না। —আমরা বাস থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই একটা চায়ের দোকান। নোংরা। উপায় কি? বৈকালিক 'গরম-জল' পেটে না পড়ায় কেমন যেন পড়ো পড়ো ভাব। চাঙ্গা হওয়া দরকার। তাই গরম জলে কাপটা যথাসাধ্য ধুইয়ে তাতে গরম রঙীন জল পান করা গেল। মনকে প্রবোধ দিলাম, সিলেটের চা-বাগানের চা তো এখনো আসেনি।

চারধারে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখছিল। তাদের একজনকে জিগ্যেস করলাম, যুদ্ধের সময় তোমরা কোথায় ছিলে? —একজন বললে, গাঁ-র মদ্দি পলায়ে গিস্‌লাম। —আর

একজন বললে, কলকাতায়। —আর একজন যা বললে, তা শুনে চমকে উঠলাম আমরা। বললে, এখানে থাকলি কী দশা হতো ভাখবেন ? ভাখবেন মড়ার মাথা ? —চা-ওলা বললে, যান না, ভাখে আসেন। কাছেই। পাশেই আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন, বললাম, যাবেন ? —তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললেন, না, না। ওসব আমি দেখতে পারবো না। —আমরা পাঁচ ছ'জন গেলাম ছেলেদের সঙ্গে। সঙ্গে এলেন অধ্যাপিকা কৃষ্ণা চ্যাটার্জিও। ভেতরে একটি পাড়ার মধ্যে। রায়পাড়া। দেখলাম, কতগুলি পাকা বাড়ী। বাড়ির ছাদে মেয়েরা দাঁড়িয়ে। লাউডস্পীকারে গান ভেসে এলো। এগিয়ে দেখি, একজায়গায় পিকনিক হচ্চে। ছেলেমেয়েদের ভিড়। পাশ দিয়ে ঢুকলাম একটা বাগানে। দেখি, একজায়গায় হাড়ের পাহাড় আর একজায়গায় বহু নর-কংকালের মুণ্ড আর হাড়।

একটি যুবক এসে দাঁড়ালো। কাটা সার্ট-প্যাণ্ট পরা, ব্যাক-ব্রাশ করা, হাতে সিগ্রেট। পরিচয় হলো। নাম, মহম্মদ খায়রুজ্জমান। মুক্তিবাহিনীতে ছিল। সেজন্যে তার দুই চাচা-কে হত্যা করেচে পাক সৈন্যরা। তাঁরা তখন খাচ্ছিলেন। —খায়রুজ্জমান পাশেই একটি বাড়ি দেখিয়ে বললে, ঐ বাড়িটি ছিল পিলখানা। লোক ধরে এনে জবাই করা হতো। —সামনেই একটি গর্ত দেখিয়ে বললে, এই কূয়োর মত গর্ত খুঁড়ে তাতে একসঙ্গে কবর দিতো ওরা। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েচে মাংসগুলো, এখন পড়ে আচে হাড়। আরো ছিল—বহু লরীতে করে সরানো হয়েচে। এগুলো রাখা হয়েচে সাংবাদিকদের দেখাবার জন্যে। —আরো দেখালো, এগুলি মেয়েদেরই কংকাল। অত্যাচারের পর হত্যা করেচে। ঐ দেখুন শাড়ি-ব্লাউজের টুকরো, চুলের গোছা। —দেখলাম। বললে, একটার মুণ্ডের কানে মাকড়ি ছিল, একজন জার্মান সাংবাদিক নিয়ে গেচে চেয়ে দেশে দেখাবার জন্যে।

ই-পি-আর, পুলিশবাহিনীর লোকেদেরও মেরে ফেলে এখানে পুঁতেছিল। ঐ দেখুন, তাদের জামার টুকরো। আর ঐ দেখচেন দুটো হাড় দড়িতে বাঁধা—দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে এনে ছিল তার প্রমাণ। —ফিরে এলাম বাসের কাচে। —ওদিকে আর একখানা বাস আগে পৌঁছে গেচে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে। আমরা তখনও পৌঁছুইনি দেখে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেচে। দেখি আমাদেরই শ্যাম ধর তাঁর গাড়ি নিয়ে এসেচেন, আমাদের ধরে নিয়ে যেতে। আশাপূর্ণা দেবী, কৃষ্ণা চ্যাটার্জি আর আমি রওনা দিলাম তাঁর গাড়িতে। —গেলাম যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে। দোতালা বাড়ি। বিরাট লাইব্রেরী। থরে থরে বই পত্রিকা সাজানো। বসে পড়বার চমৎকার ব্যবস্থা। দেওয়ালে নানারকমের বাণী আর কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীদের ছবি। দুটো লিখে আনলাম—

'বইয়ের সব চেয়ে বড় শত্রু
নির্দয় পাঠক।'

'দুনিয়াটাই বিরাট একটি বই।
চড়তে গেলে লাগে বইয়ের মই॥'

গ্রন্থাগারিক মহম্মদ এ, এস, এম, আজাহার বললেন, আল্লার ইচ্ছেয় পাক-গুণ্ডাদের হাত থেকে লাইব্রেরীটা রেহাই পেয়ে গেচে। নইলে খুবই ক্ষতি হতো। —বললাম, বইয়ের মর্ম ওরা বোঝে না, তাই। মহম্মদ আজাহার বললেন, আরো বড় করা দরকার লাইব্রেরী। একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন এই দেখুন, কত বই প্যাক করা পড়ে আছে, খুলতে পারিনি। আরো বললেন, এবার কলকাতায় গিয়ে চার হাজার টাকার বই কিনেচি—আর দান হিসাবে পেয়েচি প্রায় এক হাজার টাকার বই। —আমরা যাবার একটু আগে লাইব্রেরী হলে চলছিল, সাপ্তাহিক সাহিত্য বৈঠক। উপস্থিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ হলো। হলো মন-দেয়া-নেয়া। মনে হলো, কতদিন পরে যেন ফিরে পেলাম আপনজনকে।

আলাপ হলো মহম্মদ শহীদুল ইসলাম (টুকু)-র সঙ্গে, অরুণকুমার ভট্টাচার্য, মহম্মদ আবদুল হামিদ, আবদুল হান্নান, এম, আবদুল মুজাদের-এর সঙ্গে, আলাপ হলো আজাদ ও পূর্বদেশ পত্রিকার যশোরের সংবাদদাতা মহম্মদ আবুল হোসেন মীর-এর সঙ্গে আর লাজুক মেয়ে মিস্ সাহিদা বেগম এগিয়ে এলো তার অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে। —কতকগুলি 'যষ্ঠি-মধু' নিয়ে গেছলাম, দিলাম তাদের। গ্রন্থাগারিককে উপহার দিলাম আমার কবিতার বই 'কখনো মেঘ কখনো তারা।' —শুধু নাম সই নয়। ঠিকানাও। পত্রালাপ করতে হবে। তারাও লিখে দিলো ঠিকানা। খাতায় কিছু লিখে দিতে বললে সবাই। একটি কথাই জাগলো মনে, তাই লিখলাম খাতায়-খাতায়—। —প্রাণের প্রতিবেশী পেলাম।

ডাক পড়ল পাশেই টাউনহলের ময়দানের মিটিংয়ে যেতে হবে। এমন ঘরোয়া অমায়িক গল্প আলাপ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না মাইক-মার্কা সভায়। তবে না গেলে হারাতে হতো অনেক কিছুই। —যশোর মধুসূদন দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদার রশীদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভা শুরু হলো। তিনি এক ফাঁকে বললেন, জানেন, আগে পাক-রাজত্বে এই কলেজের নাম ছিল এম-এস কলেজ। এখন ফিরে এসেচে পূর্ব নাম। ভাষণে বললেন, দুই বাংলার মাঝখানে এতদিন প্রাচীর গাঁথা ছিল, তারই ফাঁক-ফোকর দিয়ে আমরা যথাসাধ্য দেখবার চেষ্টা করতাম ওপার বাংলাকে। আজ হঠাৎ আমরা এভাবে আমাদের মধ্যে পাবো ভাবতেই পারিনি।

—সম্মেলনের সহ-সভাপতি ডঃ কালিকিংকর সেনগুপ্ত বললেন, আমাদের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। প্রাচীর ভেঙে যেতেই ছুটে এসেচি।

আশাপূর্ণা দেবী বললেন, আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি এক। সেই বন্ধনেই আমরা একসাথে বাঁধা। —আমি বললাম, আমরা আমাদের ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতির সেতু দিয়ে এসেচি ভাইয়ের কাছে, নিজের দেশে। —বললাম, হ্যাঁ, এই যশোর আমার দেশ! আমি যশুরে। আমার পিতৃদেব মন্মথ নাথ ঘোষ জাপান থেকে চিরুণী শিল্প শিখে এসে তাঁর এই দেশেই বসিয়েছিলেন প্রথম চিরুণীর কারখানা। সেই থেকেই নাম হয়েচে—যশোরের চিরুণী।

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা চ্যাটার্জি গাইলেন, 'আ মরি বাংলা ভাষা'। —তারপর লাইব্রেরী হলে গিয়ে চা-পানের ব্যবস্থা। —অতিথি সেবা বাঙ্গালীর ঐতিহ্য। —আমরা তৃপ্ত হলাম। দেহে মনে। —আবার চললো খাতায় খাতায় নাম সই। শুধু সই নয়, ঠিকানাও। শুধু সই নয়, কিছু লেখা···। —লেখা? লিখলাম খাতায় - খাতায় প্রাণের কথা! —প্রাণের প্রতিবেশী পেলাম।

প্রকৃতির ধ্যান করে নৈতিক উন্নতি আমার কতখানি
হয়েছিল জানিনা। কিন্তু একটা লাভ হয়েছিল—প্রকৃতির
বিচিত্র ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য আমার চোখে ধরা দিয়েছিল,
তাছাড়া সহজেই মনে একাগ্রতা আনতে পেরেছিলাম।

শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের

জটার দেউল

"...তাড়াতাড়ি লেবে যান! এ লাও ওখানে যাবে না"—মাঝি বলে ওঠে। আমার অবস্থা তখন চুপশে যাওয়া বেলুনের মত। কারণ অশেষ কৌশল আর বিশেষ শারীরিক দক্ষতা ও পটুতা—এসবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তবে নৌকায় উঠেছি। কিন্তু সেই পথে ফিরে গিয়ে আবার যে অন্য নৌকায় উঠব, এ উৎসাহ আর ছিল না। বললুম—তা হলে পথে কোথাও নামিয়ে দিও—কারণ এ ভাঁটার সময় যে কষ্ট করে বদরপীর, সোনাপীর মায় তাবৎ পানির পীরের দোয়া চাইতে চাইতে তোমার নৌকায় উঠেছি—এখন আরাম করে বসে কোথায় তাঁদের শুকরিয়া জানাব—তা আর হ'ল না। মাঝি হেসে ওঠে, বলে আপনি স্থির হ'ন, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

বেরিয়েছি জটার দেউল দেখতে। বয়সে এ মন্দির কনিষ্ঠ কি বয়োজ্যেষ্ঠ এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক থাকুক, আমার মাথাব্যথা ছিল না—দেখার লোভ বড় ছিল। —সেই কোন ভোরে এসপ্ল্যানেড থেকে ডায়মণ্ডহারবার তারপর আবার বাসে রায়দীঘি। এপার রায়দীঘি ওপার কঙ্কণদীঘি—মাঝে বয়ে চলেছে মণি নদী। ওপারে নেবে জটার রাস্তা—হাঁটা পথ, ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে—মাইল পাঁচেক তো বটেই—মথুরাপুর থানার ১১৬ নং লাটে।

কিন্তু এই ভাঁটায় নৌকায় ওঠা যে এত কষ্টের তা ধারণা ছিল না। যদিও ওপর থেকে পাটাতন করা আছে, তা আবার মাঝে মাঝে জোয়ারের জলে ভেঙে গেছে—জেগে আছে শুধু মোটা খুঁটি তাকেই নির্ভর করে—সাবধানে পা ফেলে যেতে হ'বে। কোন রকম অসাবধান হ'লেই নিচে কাদায় পড়তে হ'বে।

চব্বিশ পরগণা, বিশেষতঃ দক্ষিণ অংশ, আজও সাধারণ মানুষের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত। অনেকের মতে এ অঞ্চল আগে ভাটি প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। তারপর গঙ্গার প্রবাহ নানাভাবে ভূমি গঠন করেছে দক্ষিণ দিকে—অনেক ভাঙা, অনেক গড়া চলেছে। দক্ষিণ দিক নিচু হ'য়ে সমুদ্রের সংগে সমতল হয়েছে। আবার ঝড়ে, জলস্ফীতিতে ভাটি অঞ্চল ডুবে গিয়েছে—আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে—নদীর গতিপথ পালটেছে।

জটার দেউল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যতটুকু জানা যায় বনভূমি পরিষ্কার করে যখন বসত পত্তন করা হয়, তখনই নাকি প্রায় ষাট ফিট উঁচু এ দেউল আবিষ্কার হয়। জনশ্রুতি হিসাবে কেউ বলেন

জটাধারী শিব ছিলেন এ মন্দিরের আরাধ্য দেবতা। আবার কেউ বলেন, নরখাদক জটাধারী এক বাঘ এ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল তাই জটার দেউল। অন্যমত হ'চ্ছে প্রতাপাদিত্যের জয়স্তম্ভ এটা, ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরী হয়। কেউ অনুমান করেন আদিতে এটা একটা বৌদ্ধ চৈত্য ছিল। কাছাকাছি ১২৭ আর ১২৮ নং লাটে বিরিঞ্চির মন্দির, ভরত রাজার মন্দির ও ভরতগড়ে কিছু পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে—ভরত নামে কোন এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁরই কীর্ত্তি।

আর যাই হোক, এ মন্দির কবে যে তৈরী হ'য়েছিল তা সঠিক জানা যায় না, গবেষণাও কিছু হয়নি। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জটার দেউলের কিছু উত্তরে এক তাম্রলিপি পাওয়া যায়—তার ভাষ্য অনুসারে ৮৯৭ শকাব্দে বা ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্তচন্দ্র এ মন্দির তৈরী করেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এ তাম্রলিপি চুরি যায়।

কিন্তু কে এই রাজা জয়ন্তচন্দ্র—ইতিহাসে কি তার উল্লেখ পাওয়া যায়? —জটার দেউল, রেখা দেউল, শিখরযুক্ত নাগর দেবালয়ের এক বিশেষ রীতি যা উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ হ'য়েছিল, বাংলার মন্দির স্থপতিরা যে নিষ্ঠার সংগে তার কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, তা এ মন্দির দেখলে বোঝা যায়। —পরিত্যক্ত, দেবতা ও সংস্কার বিহীন এ মন্দির দেখে শুধু একটা কথা মনে হচ্ছিল—আমাদের চরম উদাসীনতা। সংরক্ষণ করা দূরে থাকুক—সংস্কার যা হ'য়েছে তাতে মন্দির আরও শ্রীহীন হ'য়ে পড়েছে। উপযুক্ত সংরক্ষণ আর সংস্কার যদি না হয়, তবে এমন একটা সুন্দর নিদর্শন আর বেশীদিন টিঁকে থাকবে না। পথ চলতেই আনন্দ, তাই পথ বার বার ডাক দেয়, আর চলার নেশায় যাত্রী ছুটে চলেন, আমাদের এই বাংলার বাইরে। কিন্তু এখানে কাছেই দেখা ও জানার কিছু রয়েছে তার দিকে একটু চোখ ফেরালে ক্ষতি কি?

প্রভাত কুমার গাঙ্গুলীর

কাঞ্চনজঙ্ঘার আশে পাশে

হঠাৎ পাশ থেকে আমার হাতটা ধরে কে যেন হ্যাঁচ্‌কা টান মারলো! কিছু বুঝে ওঠবার আগেই আবার এক টান! হাত থেকে প্রায় খসে যাওয়া দড়িটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাগিয়ে ধরে প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি মিঃ গম্বু স্বয়ং। কিন্তু এ কি ধরণের রসিকতা! আমার হাতের দড়িটা (Belaying Rope) যে আর একজনের জীবন-রজ্জু। মাত্র কয়েক ফিট নীচে লেফ্‌টেন্যান্ট দাস বরফের খাড়া দেওয়াল বেয়ে বরফ কুঠারের (Ice-Axe) সাহায্যে ধাপ কেটে কেটে ওপর থেকে নীচে নামবার চেষ্টা করছেন। ভারসাম্যের একটু এধার ওধার হলেই তাঁর হুমড়ি খেয়ে পড়বার সম্ভাবনা। আর পাথরের মত জমাট কঠিন বরফে ধাক্কা খেতে থাকলে দফা একেবারে শেষ। একমাত্র ভরসা আমার হাতের দড়ি যেটা তাঁর কোমরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আর সেই দড়িই যদি হাতছাড়া হোত—তাহলে?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব বুঝতে পেরে গম্বু সাহেব হা হা করে হেসে উঠলেন। হাসির শব্দে আমার সংবিত ফিরে এল। উত্তেজনার আধিক্যে ভুলতে বসেছিলাম যে আমি একজন শিক্ষার্থী। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে প্রায় ১৬,০০০′ ফিট উচ্চতায় রাতং হিমবাহের ওপর দাঁড়িয়ে কঠিন বরফে ধাপ কাটার কসরৎ শিখতে একে অপরকে সাহায্য করছি। আর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমি কতটা সচেতন ও নির্ভরযোগ্য তারই পরীক্ষা করছিলেন যিনি সেই মিঃ নোয়াং গম্বু শুধু আমাদের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষকই নন, সারা বিশ্বে একমাত্র পর্ব্বতারোহী যিনি পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্টে দু'বার (১৯৬৩ ও '৬৫ সালে) পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সর্ব্বকালের সকল পর্ব্বতারোহীদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ সেই দুরধিগম্য হিমাদ্রি শিখর এই সদাহাস্যময় ছোটখাট মানুষটির কাছে একাধিকবার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

দার্জিলিং এর 'হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটের' বেসিক কোর্সের শিক্ষার্থী হিসাবে আমরা এখানে এসেছি। অনেকদিন আগে আর একবার এসেছিলাম দার্জিলিংএ বেড়াতে। ম্যালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দেখে মোহিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ধবলগিরির ঐ তুষার রাজ্যের একেবারে অন্দর মহলে গিয়ে প্রবেশ করতে পারব কোনদিন। —ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী এসেছেন বেসিক ট্রেনিং নিতে। এঁদের মধ্যে অল্প কিছু সিভিলিয়ান। বাকীটা আর্মি বা ঐ জাতীয় কিছুর। সিভিলিয়ানদের মধ্যে দুজন কাশ্মিরী। জম্মু 'মাউন্টেনীয়ারিং এণ্ড হাইকিং'এর সভ্য। বোম্বাই ও গৌহাটির মাউন্টেনীয়ারিং

ক্লাব থেকে একজন করে এসেছেন। আর পশ্চিমবাংলা থেকে আমরা চার জন কোলকাতার মাউন্টেনীয়ার্স ক্লাবের সদস্য।

দার্জিলিং-এ আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব হোষ্টেলে। শিক্ষার্থীদের ৮টি গ্রুপ বা রোপে ভাগ করে প্রত্যেক রোপে একজন করে শেরপা ওস্তাদ (Instructor) নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এঁদের ওপরে ছিলেন স্বনামধন্য মিঃ তেনজিং নোরগে ও মিঃ নোয়াং গম্বু যথাক্রমে ডিরেক্টার ও ডেপুটি ডিরেক্টার অফ্ ফিল্ড ট্রেনিং হিসাবে। এছাড়া প্রিন্সিপ্যাল লেঃ কর্ণেল মিঃ এ, এস, চীমা তো আছেনই। —মিঃ চীমা সন্তভারপ্রাপ্ত সুতরাং অধ্যক্ষ হিসাবে এটাই তাঁর প্রথম কোর্স।

কোর্সের শুরুতে সপ্তাহ খানেক যাবৎ প্রতিদিন ভোরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হোত ইনষ্টিটিউট থেকে প্রায় ম্যাল পর্য্যন্ত ২/৩ মাইল রাস্তা দৌড়াদৌড়ি করিয়ে। ব্রেকফাষ্টের পর শৈলারোহণ (Rock climbing)। নীচে লেবং-এর কাছে—তেনজিং ও গম্বু 'রকে' ওঠানামার নানান কৌশল শেখাতেন। ফিরে দুপুরে লাঞ্চ। তারপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদিন থিয়োরেটিক্যাল ক্লাশ, কোনদিন ফিল্ম শো ইত্যাদি। সন্ধ্যার আগে ছুটি পাওয়া ভার। পাহাড়ে চড়ার পোষাক-আশাক (Kits) সব এখান থেকেই দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে। সেইসব মালপত্র রুকস্যাকে (Ruck sack) ভরে কাঁধে নিয়ে এরমধ্যে একদিন টাইগার হিলে গিয়েছিলাম হেঁটে। পরদিন সূর্য্যোদয় দেখে আবার পায়ে হেঁটে ফেরা।

বেস ক্যাম্প 'চৌরিংকিয়াং' এর দূরত্ব দার্জিলিং থেকে প্রায় ৭০ মাইল। পর্ব্বত-সঙ্কুল সিকিম হিমালয়ের পশ্চিমাংশে এর অবস্থান। চৌরিংকিয়াং-এর কাছেই আমাদের মূল শিক্ষাক্ষেত্র 'রাতং হিমবাহ' (Rathong Glacier)। প্রাথমিক পর্ব্বের শিক্ষাক্রম শেষ করে দার্জিলিং থেকে চৌরিংকিয়াং পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পার্ব্বত্যপথ পিঠে ২০ কিলো ওজনের বোঝা চাপিয়ে কয়েকদিন হেঁটে আসতে দেহের শক্তি সামর্থ্য প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে কাঁধের যন্ত্রণা অসহ্য মনে হয়েছিল। বিষফোড়ার মতন ব্যথা। তার ওপরেই তুলে নিতে হয়েছিল বোঝা। আর পথের তো কথাই নেই।

প্রথম দিনেই আমরা প্রায় ৬,০০০ ফিট নেমে রঙ্গীত নদী পেরিয়ে সিকিমের 'নয়া বাজারে' তাঁবু ফেলেছি। রঙ্গীতের ওপারে বাংলা তথা ভারতের সীমান্ত, এপারে সিকিম। তারপর অল্প কিছুটা পথ জীপে এবং বাকীটা পায়ে হেঁটে সিকিমের পশ্চিম দিক বরাবর ক্রমাগত উঠে এসেছি। উঠে

এসেছি বলা ঠিক হচ্ছে না। কারণ পাকদণ্ডির পথ কখনো ৩,০০০´ ফিট নেমে নদী সমতলে মিশেছে আবার ৪০/৫০ ফিট নড়বড়ে বাঁশের ঝুলা পেরিয়ে সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে এসেছে ৪,০০০´ ফিট পর্য্যন্ত। ফলে সারাদিনের পথ চলায় আমরা উচ্চতা লাভ করতে পেরেছি অল্পই। লোকালয় ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়েছে। কখনো গহণ বনের ভেতর দিয়ে কখনো বা উচ্ছলা নদী রাতং-ছু'র পাড় দিয়ে পাথরের বড় বড় বোল্ডারে পা রেখে রেখে পথ চলা। সিকিম-হিমালয়ের ছবির মত সুন্দর সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। চরম পরিশ্রান্ত হয়েও থমকে দাঁড়াতে হয়েছে চিত্রার্পিতের মত। সঙ্গের ওয়াটার বটলের জল ততক্ষণে নিঃশেষিত। জলের আশায় ক্রমাগত হেঁটে নিরাশ হয়ে যখন বোতলটাকেই আছড়ে ভাঙতে উদ্যত হয়েছি ঠিক সেই মুহূর্তে মরুভূমির মাঝে মরুদ্যানের মত দূরে দেখা গেছে পর্ণ কুটিরের রেখা। সেই কুটীরের ভেতর থেকে কাঁকন-পরা-হাত তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়েছে পেতলের ঘটি ভর্ত্তি পাহাড়ি দধি; সঙ্গে একটুকরো সলজ্জ হাসি। তৃষ্ণা দূর হয়েছে। শরীরের অবসাদ কেটে গিয়ে নব উদ্যমে আবার পা বাড়িয়েছি। যেতে যেতে ভেবেছি কোন্‌টা বেশী উদ্দীপক? ঘটির দধি, না গ্রাম্য বালার মিষ্টি হাসিটি!

চৌরিংকিয়াং পৌঁছবার আগেই রাত্রি কেটেছে একটা পাহাড়ি জঙ্গলে তাঁবুর মধ্যে। এ জায়গাটার নাম জেমলিংগাঁও। উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফিটের মত। যখন পৌঁছলাম তখন চারিধারের বনানীতে সবুজের সমারোহ। কিন্তু বিকেলের দিকে ঝির ঝির করে বরফ পড়া শুরু হোল। প্রথমে অল্প পরিমাণে আঁশের মত হালকা হালকা। তারপর সাবুদানার মত অনবরত একনাগাড়ে। বরফের ভারে তাঁবুর ওপরকার আস্তরণ ঝুলে পড়তে লাগল। এইভাবে সারারাত ধরে বরফ ক্রমাগত পড়েই চলল। পরদিন ভোরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখি তুষারপাত বন্ধ হয়েছে আর সেই সঙ্গে হিমালয়ের অতি চমৎকার মহা-মৌনী এক নৈসর্গিক দৃশ্য রচিত হয়েছে। সেই নিবিড় সবুজ বনানীকে যেন কোন্ অদৃশ্য শিল্পী টুকরো টুকরো বরফের আভরণে থরে থরে সাজিয়ে তুলেছে আশ্চর্য্য নিপুণতায়। শ্বেত-সবুজের সেই নয়নাভিরাম দৃশ্যটি আমার উত্তর জীবনের বিষন্ন দিন গুলিকে রাঙিয়ে রাখবে বহুদিন।

পিঠের বোঝাটাকে সামলে সদ্য বরফ পড়া পিচ্ছিল পথে সন্তর্পণে পা ফেলে দিনের শেষে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলেছি এক পাহাড়ের মাথায় যার নাম চৌরিংকিয়াং। উচ্চতা ১৪,৫০০´ ফিট। এখান থেকে হবে আমাদের ফিল্ড ট্রেনিং। কিন্তু ট্রেনিং শুরু হবার আগেই বিপত্তি দেখা গেল। আমাদের জওয়ান বন্ধুদের কয়েকজন ও রাজধানীর একজন সিভিলিয়ান এই দীর্ঘ পথশ্রম জনিত ক্লান্তি ও উচ্চতা জনিত পীড়ায় (High Altitude Sickness) আক্রান্ত হয়ে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রিন্সিপ্যাল কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন না।

কারণ ইনষ্টিটিউটের ইতিহাসে কয়েকটি বিয়োগান্ত ঘটনা ইতিপূর্ব্বে ঘটে গেছে। যার মধ্যে কেবল শিক্ষার্থীরাই নেই আছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ মেজর নন্দু জয়ালের মত অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী যিনি উচ্চতাজনিত কাল-ব্যাধি Pulmonary-œdemaয় আক্রান্ত হয়ে পাহাড় থেকে আর ফিরে যেতে পারেননি। যেমন পারেননি এই সেদিন ভারতবর্ষের কুশল পর্ব্বতারোহী মেজর হর্ষবর্দ্ধন বহুগুণা। একমাত্র ভারতীয় সদস্য যিনি ১৯৭০ সালের 'আন্তর্জাতিক এভারেষ্ট অভিযানে' স্থান পেয়েছিলেন।

বেস ক্যাম্পে পৌঁছেছিলাম ২০শে মার্চ্চ তারিখে। আর আজ ২৫শে। ২১ তারিখে এখানকার বিভিন্ন ধরনের শৈল প্রাচীরে আরোহণ অবরোহণের অভ্যাস করেছি। এক সময় সামনের পাহাড়টার মাথায় চড়ে প্রিন্সিপ্যালের নির্দ্দেশে ওস্তাদজী লাটু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আশেপাশের শৃঙ্গগুলির সঙ্গে। কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব নিকটে থাকলেও আশেপাশের শৃঙ্গগুলি আড়াল করে রাখার জন্য বেস ক্যাম্প থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যায় না আমাদের সামনেই কাবরু-ডোম (২১.৬৮৮´)। তার উত্তর পশ্চিমে কাবরু (২৪.০৬২´). সাউথ কাবরু ও দক্ষিণ পশ্চিমে রাতং (২২,০০০´) শৃঙ্গ। রাতং এর ঠিক উল্টোদিকে কোকতাং (২০,১৬২´) ও ঐ গিরিশিরার পূর্ব্ব প্রান্তে ফ্রে-পিক (১৯,১৩০´)। কোকতাং আর রাতং-এর মধ্যিখানে একটা গিরিসঙ্কট—রাতং লা (১৭০৫০´)। গিরিসঙ্কট শেষ হয়েছে নেপালের সীমানায়। অতএব আমরা সিকিম-নেপাল সীমান্তের খুব কাছাকাছিই আছি। রাতং হিমবাহের পশ্চিম অংশ আরও ওপারে। আমাদের মূল শিক্ষাক্ষেত্র হিমবাহের পূর্ব্ব অংশে। এই কয়েকদিনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে এই হিমবাহের ভয়াবহ অথচ বিচিত্র চরিত্রের রূপ উদ্‌ঘাটন করতে। পায়ে দশ পাউণ্ডের জুতোর (climbing Boot) তলায় লোহার কাঁটা (crampon) লাগিয়ে এর ওপরে হাঁটা চলা, দড়ি ধরে বা ধাপ কেটে ওঠানামা অভ্যাস করেছি। বরফের বিরাট গুহার ওপর থেকে কখনো দড়ির সাহায্যে ৩০/৪০ ফিট নীচে মরণ ঝাঁপ দিয়েছি (Over-Hung Rappeling) কখনো বা গভীর খাদের (crevasse) ভেতর থেকে দড়ির সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করে আনবার কৌশল শিক্ষা করেছি।

শিক্ষার চূড়ান্ত পর্ব্ব হবে আগামী কাল এবং পরশু দু'টি শৃঙ্গ অভিযানের মাধ্যমে। ফ্রে-পিকের পাশে চতুর্দ্দিকে শুভ্রতার মাঝে কালো চকচকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপর একটি শৃঙ্গ এর উচ্চতা ১৭৩৮০´ ফিট। সতের হাজার ফিট পর্য্যন্ত বরফে ঢাকা বটে কিন্তু শেষটুকু মসৃণ পাথর। ঐখানেই হবে আমাদের শৈলারোহণের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

২৬শে মার্চ্চ, ১৯৭১। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী সকাল সাতটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে রুকস্যাক

কাঁধে নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম! মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। বাঁশির আওয়াজের সঙ্গে চলা শুরু হোল। এ কয়দিন যেদিকে গেছি সেদিকে নয়। আমাদের তাঁবুর পেছন দিকে হিমবাহের Terminal Moraine এর বোল্ডারের মাথায় পা রেখে লাফিয়ে চলা। বেশীর ভাগ পথটাই এই রকম। বাকীটা ঢালু পাহাড়ের গায়ে জুনিপারের (ধুপগাছ) ঝাঁকের মাঝে পা রেখে কোনক্রমে ভার সামলে চলা। শেষটা পাথর আর নরম বরফের পিচ্ছিল পথে চলতে হ'ল লাফিয়ে ও ডিঙ্গিয়ে। ভয় হচ্ছিল যদি সে রকম পা হড়কায় হাঁটু তো ভাঙবেই, ক্যামেরাটা বুকে ঝোলানো আছে, সেটাও দু'টুকরো হবে।

বরফের রাজ্য পেরিয়ে রিণাকের কালো পাথরের বেসের কাছে এসে ওস্তাদজীদের নির্দেশে রোপ অনুযায়ী ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে শিখরের দিকে এগুতে লাগলাম। সতেরো হাজার ফিটের ওপর শুরু হোল রক্ ক্লাইম্বিং। আমাদের রোপ ইনষ্ট্রাক্টার মিঃ নোয়াংফিন্জো বরাবরই দুঃসাহসী। যেধার থেকে ক্লাইম্ব করালেন পড়লে পড়তে হবে সোজা ২।৩ হাজার ফিট নীচে। যাই হোক শিখরে যখন উঠলাম তখন মাত্র বেলা সাড়ে ন'টা। খুবই আনন্দ হচ্ছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি দ্বিতীয় কি তৃতীয় উঠেছিলাম। এখান থেকে সমস্ত পিকগুলো দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। অনেক ছবি তুললাম। সিকিম হিমালয়ের পবিত্রতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আবার দেখতে পেলাম। কাবরুর বাঁ দিকে যপুনো (১৯,৫৩০´), পানডিম্ (২২,০১০´) প্রভৃতি আরও কয়েকটা শৃঙ্গ দেখা গেল যেগুলোকে দার্জিলিং থেকে আমরা দেখেছিলাম। খানিকক্ষণ এখানে থাকার পর আবহাওয়া ক্রমশঃ ভারী হয়ে এল। সমস্ত পিকগুলো আস্তে আস্তে মেঘে ঢেকে যেতে লাগল। রাতং শৃঙ্গের ওপর তুষার ধ্বসের (Avalanche) গুরু গম্ভীর আওয়াজ সবাইকে সচকিত করে তুলল। গম্বু সাহেবের নির্দেশে এবার আমরা নেমে চললাম। পুনরায় বেসের কাছে যখন এলাম তখন বেলা প্রায় এগারোটা। বাস্কেট থেকে ড্রাইলাঞ্চ বার করে খাওয়া হ'ল। তারপর পাহাড়ের এমন একটা সংকীর্ণ স্থানে আমাদের নিয়ে আসা হ'ল যেখান থেকে নীচে তাকাতে বেশ ভয় করে। শুনলাম এখান থেকে দড়ি বেয়ে নীচে নামতে হবে (Long Sling Rappeling)। তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। এ্যাঙ্কর করে বিলে রোপ, র‍্যাপেলিং রোপ খাটিয়ে রুকস্যাক, আইস এ্যাক্স পিঠে নিয়ে দড়ি ধরে নেমে যাওয়া চলল রোপ অনুযায়ী। প্রায় তিনটে নাগাদ আমরা বেস ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সবাই খুব পরিশ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে গরম চা আর বিস্কুট পাওয়া গেল।

শেখারির আগুনে ভিজে বুট, মোজা প্রভৃতি শুকিয়ে নিলাম। বিকালে রোল কলের সময় মিঃ গম্বু জানালেন এবারের কোর্সে তিনি এবং সমস্ত ওস্তাদজীরা খুব খুশী। বিশেষ করে আজকের অভিযানে। যাই হোক আগামী কাল শেষ পরীক্ষা। আরও উঁচু একটা পিক

অভিযাত্রীর স্বপ্ন

কাবরু ও কাবরুডোম।

সিকিম।

দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

শিল্পের আহ্বান

কৈলাস মন্দির - ইলোরা

অনিল ঘোষাল ॥

শিল্পীর সজ্জা

লক্ষণ মন্দির - খাজুরাহো।

ডাঃ নিরঞ্জন বসু ॥

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

সারনাথ মন্দির।

অজয় চক্রবর্ত্তী ॥

ক্লাইম্ব করার চেষ্টা হবে। তার নাম 'পালং'। উচ্চতা ১৯ হাজার ফিটের মত। যেতে হবে অনেকখানি তাই ভোর সাড়ে চারটেয় বেড টি আর সাড়ে পাঁচটায় মার্চ শুরু হবে।

সেই যে ম্রিণাকের চূড়ায় থাকতে আবহাওয়া খারাপ হয়েছিল তারপর থেকে সমানে বরফ পড়ে চলেছে। ঐ তুষারপাতের মধ্যেই আমরা দেড়শ' ফিটের পিচ্ছিল দেওয়াল দড়ি বেয়ে নেমেছি এবং পরে বেস ক্যাম্পে পৌছেছি। রাত্রে আবহাওয়া আরো খারাপ হ'ল। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকে আর মেঘের ডাকে মনে হ'ল আকাশটা যেন খেপে গেছে। এ সময় এই উচ্চতায় বৃষ্টি হয় না। তুষারপাত চলে প্রবলভাবে। অথচ আজ সকালেও আকাশটা কত সুন্দর ছিল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকলাম। রাতে ভাল ঘুম হ'ল না। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। মাথার কাছে তাঁবুর একটা ছোট ছিদ্র দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

শেষ রাতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বন্ধু দেবুর ডাকে ঘুম ভাঙলো। আমরা দুজনে একই তাঁবুর বাসিন্দা। বাইরে চায়ের কেটলী হাতে আমাদের কুক লামাজী দাঁড়িয়ে। বেড টি খেয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোলাম। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিন এই সময় অল্প অল্প আলো ফোটে। আজ নিকষ কালো অন্ধকার। মনে হ'ল আকাশে এখনও প্রচুর মেঘ জমে আছে। যাইহোক ওর মধ্যেই টর্চ হাতে করে প্রাতঃকৃত্য সারতে হল। আর ব্রেকফাষ্ট শেষ হতে না হতেই ফল্-ইনের বাঁশি বেজে গেল। তাড়াতাড়ি লাইনে এসে দাঁড়ালাম। গম্বু সাহেব সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বোতলে জল ও প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন। আমার হঠাৎ খেয়াল হ'ল র‍্যাপেলিং গ্লাভস্‌তো নেওয়া হয়নি। ওটা তাঁবুর মধ্যেই রয়ে গেছে। ছুটলাম তাঁবুর দিকে। ওদিকে ততক্ষণে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুতে গ্লাভস্ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেটা বেরুলো স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে। ব্যাগের গরমে শুখোবার জন্য রেখেছিলাম।

সঙ্গীরা এদিকে ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। রুকস্যাকটা কাঁধে তুলে আইস এ্যাক্স হাতে নিয়ে আমি প্রায় দৌড়াতে লাগলাম ওঁদের ধরার জন্য। কিন্তু সারা পথ বোল্ডারে ভরা। দ্রুত চলি সাধ্য কি! ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। আবহাওয়া একেই খারাপ ছিল। হঠাৎ একটা ঘন সাদা মেঘের আস্তরণে চারিদিক ঢেকে গেল। তিন হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। রাস্তা চিনে চলাই দায় হল। বাঁদিকের চড়াইটা বেয়ে উঠব না সোজা চলব বুঝতে পারলাম না। চারিধারের পাথরের বোল্ডারে পায়ে চলার কোনরকম চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা বৃথা। এলোমেলো

চড়াই ভাঙাতে পরিশ্রম অনেক বেশী হতে লাগল। চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পেলাম না। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর কুয়াশা একটু কাটতে অনেক নীচুতে একটা কালো মাথা নড়াচড়া করছে বলে মনে হ'ল। তাড়াতাড়ি নেমে কাছে এসে দেখি আমাদের পাণ্ডাদা। কোর্সের সব চেয়ে বয়স্ক শিক্ষার্থী। পাণ্ডাদাকে দেখে আমি অবাক। গতকাল বিকাল থেকেই ঠিক ছিল উনি এবং আরো কয়েকজন শারীরিক অসুস্থতার জন্য আজকের অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন না। পাণ্ডাদা নিজেও তাই জানতেন। কিন্তু সকালে হঠাৎ খেয়ালের মাথায় বেরিয়ে পড়েছেন। কিছু-মাত্র প্রস্তুত হবার সুযোগ পাননি এমনকি ব্রেকফাষ্ট পর্য্যন্ত করা হয়নি। কিন্তু ক্রমশঃই বুঝতে পারছেন কাজটা ঠিক হয়নি। শরীরে তেমন জুৎ পাচ্ছেন না। তাই ফিরে যাবার ইচ্ছা। উনি এ যাবৎ আমাদের সঙ্গে সব কাজই ঠিকমত করেছেন। শেষ দিনেও যাতে বাদ না পড়েন তাই ভেবে তাঁকে সঙ্গে আসবার জন্য উৎসাহ দিলাম। কিন্তু তাতে ফল হ'ল খুব খারাপ। উনি কিছুদূর গিয়েই থামলেন ব্রেকফাষ্টের জন্য। বাস্কেট বার করে খাওয়া দাওয়া সারতে বেশ কিছু সময় গেল। বরাতক্রমে নরম বরফে পায়ের ছাপ এতক্ষণে চোখে পড়েছে। তাই ধরে চলতে লাগলাম। কিছুদূর যাবার পর কুয়াশার আবরণটা কেটে গেল। দূরে একটা বরফ ঢাকা পাহাড়ের অনেক উঁচুতে আমাদের সঙ্গীদের রঙ বেরঙের জ্যাকেট গুলো দেখা গেল। ওঁদের কাছে পৌঁছবার জন্য আমি মনে মনে অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম। কিন্তু পাণ্ডাদার গতি ক্রমশঃই কমে আসছিল। আবার সব মেঘে ঢেকে গেল। দূরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করে বরফের পাহাড়টার ওপরে ওঠবার পর একটা রিজ বা গিরিশিরা পেলাম এবং সেটা ধরে সন্তর্পণে চলতে লাগলাম। অবশেষে আমরা একটা শৃঙ্গের ওপরে উঠে এলাম। কারা যেন কাপড়ের ছোট ছোট লাল নীল পতাকা টাঙিয়ে রেখে গেছে। বুঝলাম এটারই নাম 'সাংরী'। উচ্চতা, রিণাকের মতই কিন্তু অনেক বেশী শ্রমসাধ্য। বেসিক কোর্সের শিক্ষার্থীরা অনেক সময় এখানে এসেই থামে। কিন্তু এবারে আমাদের যেতে হবে আরও অনেক উঁচুতে। পাণ্ডাদা বসে পড়েছিলেন। ওঁকে টেনে তুললাম। ঠাণ্ডায় বরফের ওপর বেশীক্ষণ বসে থাকলে হাত পা জমে যাবে। তুষারক্ষতে (Frost Bite) আক্রান্ত হবারও সম্ভাবনা। যতদূর পারা যায় এগুনো যাক। পাণ্ডাদার সঙ্গে কিছুক্ষণ চলার পরেই বুঝেছিলাম আমার আগের সঙ্গীদের ধরার চেষ্টা দুরাশা। আবার ওনাকে একলা ছেড়েও এগুতে পারছিলাম না।

যাই হোক আবার চড়াই ভাঙা শুরু হোল। এবারে পথ ভীষণ খারাপ। পা ফেলা যাচ্ছেনা ঠিকমত। বরফ আর পাথরের চোরা ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে। একটু বেকায়দা হলেই ভেঙে যাবে। পাণ্ডাদা আর চলতে পারছেন না। সাংঘাতিক রকম কাশতে শুরু করলেন। মনে হ'ল লাংসটাই বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। পকেটে স্ট্রেপসিল লজেন্স ছিল, বার করে দিলাম। দুজনে মিলে

ভাগাভাগি করে আমার বোতলের জলও শেষ। ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়লাম। এই অসুস্থ লোকটাকে নিয়ে কি করি! নিজের ওপরেই রাগ হতে লাগল। শেষে কি আমার জন্য একটা লোকের বেঘোরে প্রাণ যাবে? আরও কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলাম আমার সতীর্থরা নেমে আসছেন। ওঁদের দেখে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু এর মধ্যেই ওঁরা ঘুরে এলেন নাকি? না। আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল থাকায় পালং শীর্ষে আর পৌছান সম্ভব হয়নি। গম্বু সাহেব ফেরবার হুকুম দিয়েছেন। কারণ তুষার ধ্বস নামতে পারে আর বরফের চোরা ফাটলে পড়ে গেলে তো কথাই নেই। তাই আমাদের থেকে আরও কিছুটা উঁচু থেকে ওরা নেমে আসছেন সারি সারি দড়ি বেঁধে। শুনলাম এখানকার উচ্চতা নাকি প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার ফিট। ওস্তাদজীরা আমাকে আর পাণ্ডাদাকে এই ভাবে বিনা দড়িতে এতদূর আসতে দেখে খুবই অবাক হলেন। মৃদু ভৎ'সনাও করলেন এই হঠকারিতার জন্য। কিন্তু সংক্ষেপে সব শুনে বুঝলেন। ভয় ছিল আমার রোপ ইনষ্ট্রাক্টার ফিন্‌জো আর গম্বু সাহেবকে নিয়ে। আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম দলছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য এই শেষ দিনেতেই আমার রেকর্ডের বারোটা বেজে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম ওঁরা দুজনেই আমাকে খুব উৎসাহিত করলেন। স্বার্থপরের মত পাণ্ডাদাকে বরফের রাজ্যে একা ফেলে চলে আসিনি শুনে ওঁরা খুব খুশী এবং এটা যে মৌখিক নয়—পরে আমার সার্টিফিকেটের গ্রেডিং দেখে সেটা নিশ্চিত বুঝেছিলাম।

যে পথে এসেছিলাম আবার সেই পথেই ফেরা। পাণ্ডাদাকে ওস্তাদ দানাম গিয়ালজী সবার আগে ধরে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা কিছুটা পথ পরস্পর দড়ি বেঁধে এবং পরে দড়ি খুলে নামতে আরম্ভ করলাম। ওঠার থেকে নামা যে কত মারাত্মক তা সেদিন বেশ বুঝেছিলাম। আসার সময় বরফের ওপরে যে পায়ের ছাপে পা রেখে রেখে উঠেছিলাম নামতে গিয়ে তার সুবিধা পেলাম না। এতগুলো লোকের পায়ের চাপে তা ভেঙ্গে গেছে। ফলে এক একটা পা রাখছি আর ৪/৫ ফিট হড়কে যাচ্ছি। বেস্ ক্যাম্পে পৌছালাম বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ। ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই চা পাওয়া গেল। আবার আড়াইটে নাগাদ চা বিস্কুট। কিছুক্ষণ পর কোর্স-সিনিয়র ক্যাপ্টেন সেন এসে জানালেন বিকালে আর রোল কল হচ্ছে না এবং আগামী কাল এখানে পুরো বিশ্রাম। তার মানে এবারকার কোর্স এখানেই শেষ হোল। পরশুদিন আমরা নেমে যাব দার্জিলিং-এর পথে যেখানে শহুরে স্বাচ্ছন্দ্যের সব কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রত্যেকেই চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত। একটা খুশীর হাওয়া বয়ে গেল তাঁবুতে তাঁবুতে।

কুমার মুখোপাধ্যায়ের

একালের গঙ্গাসাগর

'তারপর হোল কি—মহাদেবের পদসেবায় মগ্ন রয়েছেন পার্ব্বতী, এমন সময় কোথা থেকে এক ঝলক নোনা জল তাঁর গায়ে মুখে ছিটকে পড়লো। খুব ক্রুদ্ধ হলেন পার্ব্বতী, শুধোলেন শঙ্করকে —প্রভু তোমার চেয়ে বড় কে, যার এত বড় স্পর্দ্ধা? হাসলেন শঙ্কর। বললেন—সমুদ্রের জলে খেলা করছে গঙ্গাবাহন মকর। সেই জল ছিটকে এসেছে। দুঃখিত হলেন পার্ব্বতী। বললেন—মকর নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে বড়। তাই তার এত সাহস! তাহলে যাই মকরের কাছে, বড় যে তার সেবা করাই ভাল। এদিকে মকরের সেবায় উদ্যত হতেই পার্ব্বতীকে হাঁ হাঁ করে বাধা দিলো সে। অপ্রস্তুত হয়ে মকর বললো—বড় আমি নই, যে সাগরে আছি, সে অনেক বড় আমার চেয়ে। পার্ব্বতী চললেন সাগরের কাছে। সাগরও ছুটে এল হাঁ হাঁ করে। বললো—আমার চেয়ে অনেক বড় ধরিত্রী, যার বুকে আমি রয়েছি। সেবা যদি করতে হয় তারই করা ভাল। অগত্যা পার্ব্বতী গেলেন ধরিত্রীর কাছে। ধরিত্রী অপ্রস্তুত। তার কথা হোল, তার চেয়ে অনেক বড় বাসুকী নাগ, যে তাকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছে। নিরুপায় পার্ব্বতী গেলেন বাসুকী নাগের কাছে। বাসুকী নাগ তো হেসেই খুন। বললে—আমি আবার বড় কোথায়? আমি তো দুলছি মহাদেবের গলায়। লজ্জায় নতমুখী পার্ব্বতী আবার ফিরলেন শঙ্করের চরণে। বললেন—না প্রভু, তুমিই সবার বড়।'

গল্প শেষ করলেন কোন্নগরের বালবিধবা তীর্থযাত্রী বসনদি'। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আবার এক তীর্থমাহাত্ম্যের গল্প ফাঁদবার উদ্যোগ করলেন হালিশহরের বড় তরফের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বৃদ্ধা ত্রিনয়নীখুড়ী। 'তাহলে বলি শোন। এইরকম এক মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্য কাশীধামে—'

বিশাল এক পঞ্চাশমনী নৌকো চলেছে পঁয়ত্রিশটি যাত্রী নিয়ে গঙ্গাসাগর অভিমুখে। ছেড়েছে সন্ধ্যার মুখে কাকদ্বীপের অপরিসর গাঙের মুখে বাজারের ভাঙ্গাঘাট হতে। নৌকোর ছইএর ভেতরে ভুষোপড়া হ্যারিকেনের আলোতে সকলের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে সে এক মহাকলরবে সারা রাত কেটে যায় কোথা দিয়ে। বয়সের আন্দাজ নেই, তবু উনিশ থেকে উনআশী হবে নির্ঘাৎ। সেথো আছেন মগরার বৃদ্ধ হরিদাস দাদা। তাঁর হাতে কুল্যে চল্লিশটি টাকা দিয়ে নিশ্চিন্দি পাঁচদিনের তরে, এই শেষ পৌষের শীতে জড়োসড়ো নানা বয়সী মেয়ে পুরুষগুলি। কথায় বলে 'সর্বতীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। পৌষ সংক্রান্তির ভোরে পুণ্য সাগরস্নানে অক্ষয় মুক্তিপ্রাপ্তির সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না। কোলকাতার চাঁদপাল-ঘাট, বড়বাজার, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপের ঘাট থেকে এমন ছোট বড় কত নৌকোর মেলা

চলেছে সাগরদ্বীপে—গঙ্গাসাগর মেলায়। ভারতের উত্তরে জম্মু-কাশ্মীর থেকে সুরু করে দক্ষিণের কেরল পর্য্যন্ত নানা প্রান্তের মানুষের ভীড়। চাই কি দেখা মিলবে সুদূর ব্রহ্ম ও নেপাল থেকে আগত পুণ্যলোভাতুর কত শত তীর্থযাত্রীর।

কত দূর দূরান্তের মানুষ এসে যোগ দিলো সাগরস্নানে আর আমরা বাঙ্গলাদেশের মানুষ ক'লকাতার এত কাছে একটা দর্শনীয় স্থানে একটিবার ঘুরে আসবো না? এতো আর সেই আদ্দিকালের গঙ্গাসাগর যাওয়া নয়। যখন মানুষ বিষয়সম্পত্তি 'উইল' বা দানপত্র করে সাগরে রওনা হোত। আর ফিরি কি না ফিরি। শ্বাশুড়ী পুত্রবধূকে বলে যেতেন, 'বৌমা দেখো গরু দুটোর যেন অযত্ন না হয়, বুড়ো শ্বশুরকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। নিত্য নারায়ণ সেবা চিরকাল করে যেও' ইত্যাদি। পথে নৌকাডুবি, জলঝড়, ডাকাতি, ওলাওঠা, বাঘের পেটে যাওয়া তো ছিলই, তার ওপর পথের অনিশ্চয়তা, যাত্রীদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ, কত দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা নিয়ে সাগরস্নানে যাওয়া। আজকের গঙ্গাসাগর কত সহজ, কত স্বচ্ছন্দ, কত মনোরম। বড় বড় জাহাজ ছাড়ে ক'লকাতা থেকে, সোজা পৌঁছে দেয় মেলায়। দমদম থেকে ডাকোটা বিমান নামিয়ে দেয় রুক্ষ মাঠে এক ঘণ্টায়। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাঘ মার্কা বাস এসপ্ল্যানেড্ বা হাওড়া থেকে দশ টাকার যাতায়াতী টিকিটে সোজা নামখানায় আর সেখান থেকে লঞ্চে আড়াই টাকা ভাড়ায় একেবারে মেলায় পৌঁছে দেয়। ভোরে কলকাতা থেকে বেরিয়ে এই রাস্তায় বিকেলে পৌঁছে দেবে মেলায়। ক'লকাতা থেকে কুল্যে একশো মাইল পথ। ট্রেন পথ হলে কথাই ছিল না। ঐ যে কথায় বলে, এক নদী বিশ ক্রোশ। নামখানা বা কাকদ্বীপ পার হলেই বিশাল সব গাঙ্। এপার ওপার দেখা যায় না। নোনা জলের ঢেউ সেখান থেকেই—সমুদ্রের খাঁড়ি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ নজরে আসে। ক'ঘর চাষীর বাস। সুন্দরবনের এক একটি লাট। অবশ্য তীর্থযাত্রীর মনে শান্তি থাকে না, বিশেষ করে নৌকার যাত্রীদের। জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ, মানে 'সোঁদরবনের কেঁদো'।

হাঁ, আর একটা পথের কথা বলা হয়নি। কচুবেড়ের পথে গাঙ্ পার হয়ে পায়ে হাঁটা মেঠো পথ মাইল কুড়ি। সরকার ভাবছেন, এপথে একটি সাঁকো করে দিলেই এই রাস্তায় বাস একেবারে মেলায় পৌঁছে দেবে সাগর যাত্রীদের। এপথেও যাত্রী অনেক। যানবাহনে কড়ি যারা যোগাতে পারেনি, তারা শ'য়ে শ'য়ে এপথের যাত্রী। জটা-কৌপিনধারী সন্ন্যাসী আছে এপথে, শীর্ণ পা ফেলে বালির চড়ায় হাঁটে আর সেই যে মাথায় বিশাল পাগড়ীধারী রাজস্থানী চাষীর দল চলে ধূলিধূসরিত পায়ে গুটিগুটি, পেছনে চলে মেয়েরা। পরণে তাদের ময়লা কাঁচুলী আর রঙীন ঘাঘরা। পায়ের মল বাজে, ঝমর - ঝমর - ঝমর। —সাগরদ্বীপ। লম্বায়

প্রায় পঁচিশ মাইল আর চওড়ায় মাইল পনেরো। চব্বিশ পরগণার গা ঘেঁষে সাগর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান পাশ দিয়ে গঙ্গা-সুরধনী মাটি মাখা ঘোলা জলের রাশি নিয়ে মিশেছেন বিশাল নীল সাগরে। ওপারে মেদিনীপুর। মাঝখানে প্রায় দশ মাইল প্রসারিত গঙ্গার মোহনা। মুখেই আছে স্যাণ্ডহেড্ দ্বীপ। কলকাতাগামী জাহাজেরা এখান থেকেই নতুন যাত্রা সুরু করে পাইলটের সাহায্যে। অজস্র শেঁয়াকুল কাঁটার ঝোপঝাড়ে ভরা সাগরদ্বীপ। খাঁড়ির মুখে ভেসে থাকে গরুবাছুরের কঙ্কাল। তীরে আছে হেঁতালের বন। উত্তরে আশে পাশে ছড়িয়ে আছে গরাণ, বনঝাউ, গাব আর বাবলার বন। শ্রীভ্রষ্ট, জনহীন সাগরদ্বীপ। আজকাল দু'দশ ঘর চাষীর বাস হয়েছে এই অনুর্বর নোনাজলের রুক্ষ মাটি চষতে। কিন্তু এমনটি চিরকাল ছিল না। ১৬৮৮ সালের ভীষণ জলপ্লাবনে ভেসে গেল এখানকার কত হাজার মানুষ। এবার চেষ্টা হোল চাষ আবাদের। এবার এল ১৮৬৪ সালের বিরাট সাইক্লোন। সাগরদ্বীপের জনবসতি নিঃশেষে মুছে গেল। সুন্দরবনের জনহীন অরণ্যের অংশ হোল সাগরদ্বীপ। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসে গঙ্গাসাগর মেলা। পৌষসংক্রান্তি আর পয়লা মাঘের পুণ্যস্নানের আসর উপলক্ষে হঠাৎ যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠে অস্থায়ী এক আলো-ঝলমল শহর। নির্জন সাগর মোহনা মুখর হয়ে ওঠে লক্ষ মানুষের কল কোলাহলে আর দোকান-পশারীর হাঁকডাকে। বিশাল বালুচর আসন বিছিয়ে দেয় পূজা-পাঠ-স্নান-তর্পণ আর হোমকুণ্ডের। আবার রাতের জোয়ার সেই চর ডুবিয়ে দেয় তার নিত্যকার অভ্যাসে। এই খেলার শেষ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, গঙ্গাসাগর কি শুধু চিরকাল সারা ভারতের তীর্থযাত্রী মানুষের আকাঙ্খিত স্বপ্ন হয়ে থাকবে? তার বালুচরে কি লোলচর্ম, বলীরেখাঙ্কিত, স্থবির নারী পুরুষেরই শীর্ণ পদচিহ্ন আঁকা থাকবে? তার বিশাল গাঙ্ আর উদার নির্মেঘ আকাশে কি পর্যটক আর তরুণ প্রাণের ছায়া পড়বে না? ঐ যে আরাবল্লীর ঊষর মরুপ্রান্তরের দেশ থেকে এসেছে মোহন সিং, কিংবা গোমতী-ঘর্ঘরা-গণ্ডকের তীর থেকে এসেছে রাজদেও কাহার অথবা গুলঞ্চলতা দোলানো ইছামতীর শ্যামলতীরের প্রান্তর থেকে এসেছে চাষী দুখীরাম মণ্ডল, তাদের সারাবছরের সঞ্চয় নিঃশেষ করে—তারা এর উত্তরে পৌরাণিক গল্প শোনাবে। রামচন্দ্রের ত্রয়োদশ স্থানীয় পিতৃপুরুষ অযোধ্যারাজ সগর, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। শঙ্কিত হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তাঁর কৃতিত্ব বুঝি ম্লান হয়ে যায়। কৌশলে চুরি করে সেই যজ্ঞের অশ্বটি নিয়ে ইন্দ্র লুকিয়ে রাখলেন কপিল মুনির আশ্রমে। এ'দিকে সগরের ষাট হাজার পুত্র দেশবিদেশ খুঁজে শেষে কপিলমুনির আশ্রমে সেই অশ্বকে পেয়ে ভাবলেন, এই মুনিই তাহলে অশ্ব চোর। আঘাত করতেই মহাতেজা কপিলমুনির ধ্যানভঙ্গ হোল। বর্ষিত হোল চরম অভিশাপ। নিমেষে ভস্মীভূত হলেন সেই ষাট হাজার পুত্র। তবে সগরের আকুল কান্নায় মুনি আশীর্ব্বাদ করে বললেন, যদি মহাদেবের জটাজাল ছিন্ন করে

সুরধনীকে মর্ত্তে কেউ আনতে পারে, তার স্পর্শে মুক্তি পাবে এরা। ভাগ্যবান সগরের প্রপৌত্র ভক্ত ভগীরথ একদিন নিজ তপস্যায় প্রীত করিয়ে শঙ্খধ্বনি করে বরণ করে নিয়ে এলেন সুরধনীকে। সামনে পথ দেখিয়ে চলেছেন কিশোর ভগীরথ আর পিছনে মকর বাহিনী গঙ্গা বয়ে আসছেন কুলুকুলু ধ্বনিতে। চব্বিশ পরগণার হাতিয়াগড়ে এসে ভগীরথ পথ হারালেন। অনুরোধ করলেন সুরধনীকে—মা গো, তুমি শতধারে প্রবাহিত হয়ে মিশে যাও সাগরে। যেখানেই থাকুক সেই সগরপুত্রের ভস্মরাশি, তারা সকলেই মুক্তি পাবে। সে আজ কতকাল আগের কথা। গঙ্গার বিভিন্ন মোহনা আর শত শত ব-দ্বীপ দেখে সে গল্প সঠিক মিলে যায়। ভূগোল আর পুরাণ সাগর মোহনায় গঙ্গার মিলের মতই অপূর্ব্বভাবে মিলে যায়। তাইতো সাগর মেলায় চারটি মন্দির। কপিলমুনি, সগর রাজা, গঙ্গা আর ভগীরথ। ভক্তের দেওয়া এলাচদানা, সন্দেশ, বেলপাতা আর নির্মাল্যে ভরে যায় তাঁদের পূজাবেদী।

পবিত্র গঙ্গা আর পবিত্র সাগর। তাই সবচেয়ে পবিত্র তীর্থভূমি ভারতে, গঙ্গাসাগর। যেখানে দুই পূত সলিলরাশি ধুয়ে মুছে নিচ্ছে প্রতি বছর ভক্ত মানুষের যত কালিমা, যত মনস্তাপ। ভেসে যাচ্ছে নোনা জলে কত শত ডাব, বেল আর পত্র-পুষ্পের সঙ্গে শত সহস্র আর্তি আর কামনা, বাসনা। এখানে দাঁড়িয়ে মনে পড়বে সেই গোমুখের কথা। সেই উৎস থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সেরে গঙ্গা এসে মিলেছেন সাগর সখার বুকে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান সেরে ভক্ত মানুষের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারিত হয় সবিতা বন্দনা—'নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে, জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িণে—'। পূব আকাশে তখন কোন নিপুণ পটুয়ার তুলিকাস্পর্শে সারা দিগন্ত জুড়ে রঙের হোরী খেলা। কোন্ স্বপ্নলোকের দেশ থেকে রঙের পরীরা মুঠো মুঠো আবির ছুঁড়ছে সাগর মোহনার কালো জলে। উত্তরের হু হু করা হাড় কাঁপানো শীতল বাতাসে তখন তো শোনা যাচ্ছে না, সেই আদ্যিকালের সন্তানহীনা নারীর পুত্রলাভেচ্ছায় মানসিক করে প্রথম সন্তানটি বিসর্জ্জন দেবার দীর্ঘশ্বাস। তবু মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাসকে'। অমর হয়ে আছে সেখানে গঙ্গাসাগর। আর মনে পড়বে বঙ্কিমচন্দ্রকে। এই শেঁয়াকুল কাঁটার ঝোপজঙ্গলের পথেই কপালকুণ্ডলার খোঁজে নবকুমারের পথ পরিক্রমা। আর তো শোনা-যায় না সেই স্বর 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' তবু মনে হবে, বঙ্কিম ভুল লিখেছেন। নবকুমার আজও আছে। আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত নবকুমার আজও পথ হাঁটে এই রকম মকর সংক্রান্তির দিন, নির্জন দুপুরে, ঘন বনের মধ্য দিয়ে জলদস্যু অপহৃতা বনবালা কপালকুণ্ডলার সন্ধানে। চিরকালের পথিক, কৌতুহলী নবকুমারদের পরিক্রমা তো শেষ হয় না।

সাগর মেলার কিছুটা পূবে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নৌঘাঁটি ছিল। তাঁর জাহাজ নির্ম্মাণ ও

মেরামতি কাজের জন্য প্রচুর ফিরিঙ্গি কর্মচারী এখানে থাকতেন। এখান থেকে প্রতাপের রাজধানী ধূমঘাটে যাবার জলপথের নাম ছিল 'ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি'। আজ আর সে দুর্গ আর জাহাজঘাটা কিছুই নেই। তবু যদি মরচে পড়া দুটো লোহার কড়া দেখে আর ভাঙ্গা ছোট ইঁটের গাঁথুনির জাহাজ চলাচলের পথ দেখে কেউ অন্যমনস্ক হয়, তবে দোষ কি? পর্তুগীজ রডা আর কার্ভালোর কত স্মৃতি আর বিস্মৃত জনপদের কলকোলাহল তো এই নির্জন বালুচরেই সমাহিত হয়ে আছে। —সাগর মেলায় সমাগত শত শত নাগা সাধু, হাজার ভিখারী, দোকানী, পশারী অথবা লক্ষ তীর্থযাত্রী হয়তো জানে না এই মেলার গোড়াপত্তনের কথা। আজকের এই শত শত নৌকোর মাস্তুলের ভীড় করা আকাশে, উড়ন্ত গাঙচিলের ঝাঁকের মাঝে সেই আদিকালের গোড়ার কথাটি হারিয়ে গেছে। এই বিজলী বাতির রোশনাই, পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স, স্বেচ্ছাসেবী আর ভ্রাম্যমান সিনেমা, সার্কাসের তাঁবুর ভীড়ে সাগর মেলার সুরুর ঘটনাকে কে-ই বা মনে রেখেছে। বিখ্যাত ইংরেজ সেচ বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম্ উইলকক্স্ বলেছেন সেই কথা। দক্ষিণ বঙ্গে চাষের জল সেচের অপ্রতুলতা চিরকাল। আজকের এই বিশাল গাঙগুলি সে যুগে ছিল প্রত্যেকটি কৃত্রিম—মানুষের হাতে কাটা খাল। গঙ্গার মূল ধারা থেকে জলধারা সেচের সুবিধের জন্য এই সব খাল দিয়ে নিয়ে আসা হোত নানা স্থানে। ভগীরথ হলেন সেই সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং সেচ বিশেষজ্ঞ, যিনি সে যুগে এই সব খালগুলি খননের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। শত শত খালের এই জলধারা উর্ব্বর করলো দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে—শস্যসমৃদ্ধ হোল পশ্চিমবঙ্গ এলাকার এই 'সমতট' রাজ্য। অধিবাসীরা জয়ধ্বনি করলো বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার ভগীরথের। আড়ম্বর সহকারে উদ্বোধন হোল এই খালগুলোর। পত্র-পুষ্প-তোরণ শোভিত পথে ভগীরথ এলেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। বাৎসরিক মেলার প্রবর্ত্তন হোল এই ঘটনার স্মারক হিসাবে। পৌষ সংক্রান্তির এমনি একটি শীতের নির্মল প্রত্যুষে, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, পুরনারীদের হুলুধ্বনি, ঘণ্টা, কাঁসর আর শাঁখের আওয়াজে মুখরিত হোল সেদিনের সাগরদ্বীপ। সেই বিস্মৃত ঘটনাই আজকের সাগরমেলা।

তারপর একদিন শেষ হয়ে যায় সাগর মেলা। তিনদিনের অস্থায়ী তীর্থভূমি একদিন নিজেকে গুটিয়ে নেয় নিঃশেষে। ঘরে ফেরার পালা সুরু হয় তীর্থযাত্রীর, দোকানীর, সাধুর, বৈরাগীর, ধনী, নির্ধন সকলের। হাজার হাজার হোগলার চালা ভাঙ্গা হয়। দুটি ইঁটের ফাঁকে খড়কুটো জ্বেলে ভাতেভাত ফুটিয়ে খাবার কালো ছাই পড়ে থাকে। রঙীন কাঠের বাঘ, গিন্নী পুতুল, তালপাতার ভেঁপু, সস্তার হিমানী-পাউডার, কাঁচের চুড়ীর পশারীরা ঘরে ফেরে। কিন্তু পর্য্যটক মানুষের তাড়া নেই। সে যাকনা কেন সাগরদ্বীপের সামনে ধবলহাটির চরে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াক আনমনে। সাদা ঝিনুক বিছানো, লাল ছোট কাঁকড়াভরা বালুচরে, উদাসী সমুদ্রকে সকাল সাঁঝে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখুক। বন্য শূকরের খুরের দাগ ধরে হেঁটে চলুক সাদা বালিমাটির পথ

ধরে নিশানাহীন হয়ে। দীর্ঘ ছায়াপড়া বিষন্ন অপরাহ্ন বেলায় এক বন্দে হাজার গাঙ্‌ চিলের ডানায় সোনালী সূর্য্যাস্ত দেখুক। উত্তর মুখে খাঁড়ির পথ ধরে সাগরদ্বীপের বাতিঘরে যাবে সে। সুউচ্চ বাতিঘর স্তম্ভের সাদা জমির ওপর লাল ডোরাকাটা দাগ কার না ভাল লাগে। এখান থেকেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে নিত্য খবর যায় সমুদ্রের জল·ঝড়·কুয়াশা·তুফানের।

তারস্বরে কাঁসর বাজিয়ে একে একে নৌকোরা সাগরদ্বীপ ছেড়ে যাত্রা করে। উচ্চৈঃস্বরে মাঝিমাল্লারা সুর করে বলে ওঠে—'তেত্রিশকোটি দেবতার চরণ বন্দনা করে বল—বদর-বদর। দরিয়ার পাঁচপীরের নাম স্মরণ করে বল—বদর-বদর।' কেবল বিবাগী পর্য্যটক ঘরে ফেরে না। নির্জ্জন বালুকাবেলা পেরিয়ে সে পথ হাঁটে বাবলা ঝোপ ঢাকা পথে-বিপথে। দূরে দেখা যায় সমুদ্রকে—প্রতিটি তরঙ্গ-শীর্ষে তার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের রূপালী বর্ণচ্ছটা। হঠাৎ নজরে আসে এক জীর্ণ পর্ণকুটির। এই বিজন স্থানে মানুষের বাস! পরিচ্ছন্ন উঠানে বাঁধা দুটি গরু বাছুর। পথিক মাটির দাওয়াতে উঠে বসে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এক গৈরিক বসনধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রুর আড়ালে দীপ্ত হাসি। একহাতে জপের মালা আবর্ত্তিত হচ্ছে।

কথা বললেন,—'সাগরে এসেছো বাবা?' আবার প্রশ্ন—'তরুণ বয়সে তীর্থের পথে কেন?' পথিক বললে—'পর্য্যটনে বেরিয়েছি। পথও জানিনা, মতও বুঝি না। আপনারা সাধু, হয়তো ঈশ্বর সান্নিধ্যে অন্তরের চরম তৃপ্তি পেয়েছেন। কিন্তু পর্য্যটক পথিকের তৃপ্তি কোথায়?' ঘাড় নাড়লেন—'কিছুই পাইনি বাবা। জীবনভোর ভেক নিয়ে কাটানোই সার হোল। কিছুই হোল না।' পথিক প্রশ্ন করে—'পার্থিব জীবনের সকল সুখ-সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়ে এ সন্ন্যাসের অর্থ কি তাহলে?' সন্ন্যাসীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে—'হ্যাঁ বাবা, নিঃস্ব আমি। কোন অলৌকিক রহস্যের সন্ধান আমি পাইনি। দেখা পাইনি কারুর। কেউ আসেনি, কেউ না।' সন্দিগ্ধ পথিক বলে—'জীবনজোড়া অতৃপ্তি নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন?' সাধুর দু'চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হোল। জপের মালার আবর্তন স্তব্ধ হোল। 'না, কিছু পেয়েছি। এই সাগরচরে বছরের পর বছর কেটে গেল শুধু দু'চোখ ভরে দেখে।' একটু থেমে আবার বললেন—'প্রতিদিন ভোরে মোহনার দক্ষিণ কোণে সূর্য্য ওঠে, সাগরের জলে সোনা ছড়িয়ে। অপলকে চেয়ে থাকি। মন্ত্র ভুল হয়ে যায়। আজ মেলায় তীর্থ যাত্রীর ভীড় হয়েছে। তিনদিন বাদে সবাই চলে যাবে। তারপর পুরো একটি বছর আর মানুষের মুখ দেখা যাবে না। গ্রীষ্মের প্রত্যুষ, বর্ষার সকাল, শীতের দুপুর, আর বসন্তের সন্ধ্যা এমনি নির্জ্জন সাগর তীরে আমার একাই কেটে যাবে। এগিয়ে যাবো মৃত্যুর দিকে এক পা, এক পা করে।' পথিকের শেষ প্রশ্ন—'একা আপনার দিন কাটে? —না একা কৈ? ঐ যে ভগবতী রয়েছেন, ওঁর সেবা করি। ঘরে গোপাল রয়েছেন, তাঁকে দেখি আর এই সাগর মোহনা, মাথার ওপর অনন্ত নীল

মহাকাশ। একা কৈ ?' উদাসী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সন্ন্যাসী।

তারপর আবার বলেন—'কতদিন জ্যোৎস্না রাতে অস্থিরভাবে বালিচরে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হোত, আকাশ, সমুদ্র, নক্ষত্র যেন সবাই আমায় ডাকছে। ভুলে যেতাম, কুটির, আহার-নিদ্রা, আমার গোপালকে। শুধু মনে হোত, উত্তরের বাতাসে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। নোনা-জল পা ভিজিয়ে দিত। মাথার ওপর দপদপ করছে হাজার নক্ষত্র। সামনে অথৈ নীল সাগর। জ্যোৎস্নায় ঝক্‌মক্ করতো। মনে হোত, এই তো আমার নওলকিশোর এসেছেন। সেই শ্যামল গায়ের রঙ, সেই মাথায় বাঁধা চূড়া, গলায় বনমালা, চরণে নুপুর। উত্তরের বাতাসের গর্জন বলে ভুল করতাম। সে আমার গোপালের বাঁশীর সুর। পাথরের মিথ্যে পুতুল নয়। সে আমার সত্যিকার প্রাণের ঠাকুর—সত্যিকার গোপাল।' বৃদ্ধ বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চোখের কোণটা মুছলেন। —মানুষ দেবতাকে আজও বসাতে পারেনি প্রিয়জনের আসনে। দেবতাকে করেছে পূজো, দিয়েছে ভক্তি, দেয়নি ভালোবাসা। করেছে আরাধনা, দিয়েছে শ্রেষ্ঠ সম্মান, দিতে পারেনি ভালবাসা। —মানুষের ভালোবাসা বোধ করি শুধু মানুষের জন্যেই।

…অনেকের মন থাকে মুক্তি পায় না ; অংশত মুক্তি যদি পায়, পৃথিবী মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। তোমার প্রথম যৌবনের শক্তির তূণীর থেকে ক্ষমতার শরগুলি একে একে ছাড়ো। ক্লান্তিভরে খসে যেন পড়ে না হাত থেকে—তাহোলে শেষপর্য্যন্ত কিছুই হবে না, মনে থাকে যেন। কালো কাজল মেঘের তলায় বর্ষাশ্যামল স্তব্ধ অরণ্যের রূপ, তোমার মানবিক মনের বিলাস ও সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতাকে দূর করে দিয়ে তাকে দৃঢ়বদ্ধ ও উদার করুক। খুব বেড়িয়ে এসো চারিধারে। …

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয় কুমার হাটির

মহিলাদের থারকোট অভিযান—১৯৭২

মূল শিবির থেকে একাই চলেছি অগ্রবর্তী মূল শিবিরের দিকে। মালবাহকেরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। স্বপ্না, লক্ষ্মী আর শীলা গতকাল থেকে অগ্রবর্তী মূল শিবিরে আছে। শেরপা মিঃ টাসি আর লাকপাও আছে ওখানে। গতকালই পান সিংএর হাতে চিঠি পাঠিয়েছে স্বপ্না, জানিয়েছে অজস্র ফাটলে ভর্তি তুষার ময়দানের সামনে তারা বড় অসুবিধায় পড়েছে। জরুরী পরামর্শ আছে। যেতে লিখেছে আমাকে অগ্রবর্তী মূল শিবিরে। —আলো ঝলমল সকাল। সূর্য্য হাসছে। অথচ উৎকণ্ঠাভরা মন নিয়ে প্রায় ছুটেই উঠছি। গতকালই কলকাতা থেকে সুনীল চৌধুরীর চিঠি পেয়েছি, মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব ও এই অভিযানের উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। লিখেছে, কোন অস্বাভাবিক ঝুঁকি যেন না নেওয়া হয়। পাহাড় আছে, বরাবরই থাকবে।

অভিযানের বিগত দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতেই উঠছিলাম। মহিলা সদস্য পাঁচজন—স্বপ্না মিত্র—দলনেত্রী, লক্ষ্মী পাল—সহকারী দলনেত্রী, শীলা ঘোষ—ম্যানেজার, জি, ভরলক্ষ্মী—ট্রান্সপোর্ট অফিসার ও শ্রীমতী আভা ঘোষ—কোয়ার্টার মাষ্টার। চিকিৎসক হিসাবে লেখকের অন্তর্ভূক্তি। আভাদি গৃহস্থ বধূ—কিন্তু হিমালয়ও তার আর একটি সংসার, সুযোগ পেলেই সে হিমালয়ে ছুটে আসে। আর চারজন ছাত্রী। বাংলার মহিলা পর্বত অভিযাত্রী হিসাবে এরা স্বনামখ্যাতা। শেরপা সদস্যদ্বয় মিঃ টাসি ও লাকপা দুজনেই এই পথের পথিক। —আয়োজন শেষে কলকাতা থেকে বেরুতেই দেরি হয়েছিল—৪ঠা জুন। ভেবেছিলাম সবাই প্রলয়ঙ্কর পাহাড়ী বৃষ্টির কবলে পড়ব। কিন্তু এবার বর্ষা আসছে দেরিতে। প্রায় প্রতিটি দিনই ছিল পরিস্কার মেঘমুক্ত। উত্তরপ্রদেশ সরকার পরিবহনের জন্য কাঠগুদাম থেকে কাপকোট পর্য্যন্ত একটা পুরো বড় বাস দিয়েছেন। কাপকোট থেকে (৩৫০০ ফিট) পঁয়ত্রিশজন মালবাহক ও দুজন পথপ্রদর্শক (পান সিং ও লছমন সিং) নিয়ে পদযাত্রা শুরু প্রায় ৬০ মাইল—লোহারক্ষেত (৬৫০০´ ফিট), ঢাকুরী (৮০০০´ ফিট) হয়ে পিণ্ডারী নদী ডিঙিয়ে শেষ গ্রাম জাটুলি (৮০০০´ ফিট) ছাড়িয়ে দুন্দিয়াঢুং এর জঙ্গল অতিক্রম করে (৯০০০´ ফিট) সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকায় (১০.৫০০´ ফিট) অপূর্ব রূপবতী নদী সুন্দরডুঙ্গার উৎসস্থল পার হয়ে রডোডেনড্রন ও ধূপের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আনন্দলোক সুকরাম হিমবাহের পাদদেশে (১৩,৫০০´ ফিট) মূল শিবির স্থাপিত হল ১৩ই জুন।

যদিও জঙ্গল ও সঙ্কীর্ণ পথে চলতে হয়েছে, বিপদ তেমন হয়নি। মানুষ খেকো বাঘ দেখা দিয়েছে একটা লোহারক্ষেতে—১৩১ জন মানুষ খেয়েছে নাকি ইতিমধ্যে, কিন্তু আমরা খবর জেনেছি নিচে নেমে। তবে, সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল ভরলক্ষ্মীর। সুন্দরডুঙ্গা

নদীর ঢাল বেয়ে প্রায় কুড়ি ফিট নিচে গড়িয়ে পড়ল আইস্ এ্যাক্স ও রুকস্যাক্ সমেত। ছিল জঙ্গল আর পাথর। আগে ঘাসের জঙ্গল ধরেছিল আঁকড়ে—কিন্তু ছিঁড়ে যায়—তারপর একটা পাথর আঁকড়ে ধরে। সবার চোখের সামনেই মুহূর্তে এই কাণ্ড ঘটে যায়। পান সিং নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি ঝড়ের গতিতে—উদ্ধার করে আনে ওকে। প্রথম কথাই ও বলল—একটুও লাগেনি ওর কোথাও। সৌভাগ্য আমাদের। শীলাই প্রথমে দেখেছিল ওকে পড়তে, ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল। পরে সুন্দরডুঙ্গায় পৌঁছে কিন্তু বলেছিল, ও যখনই কলকাতায় হাঁটবে একা একা আর মনে পড়বে ভরলক্ষ্মীর এই পড়ার কথা, তখনই হাসি পাবে তার।

উঠছি অগ্রবর্তী মূল শিবিরের দিকে। বরফের ময়দান শুরু হয়ে গেছে। ভানোটি শৃঙ্গের পাদদেশ থেকে 'রেকি' করে নামছে দেখতে পাচ্ছি স্বপ্না-লক্ষ্মী-শীলা। —"দাজু-দাজু-জলদি আইয়ে—এ্যাভালাঞ্চ—এ্যাভালাঞ্চ!" —হঠাৎ লক্ষ্মী এবং শীলার ভয়ার্ত চীৎকারে পাহাড়গুলো কেঁপে উঠল। চমকে থমকে দাঁড়ালাম। শিউরে উঠলাম। বাকি পথটুকু পড়ি কি মরি করে এলাম। স্বপ্না-লক্ষ্মী-শীলা ততক্ষণে ফিরে এসেছে অগ্রবর্তী মূল শিবিরে। ক্লান্ত পায়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরছে—শেরপা লাকৃপা আর পিছনে তার রাম সিং। তাদের চোখে মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা। —ওপরের এক নম্বর শিবির গুটিয়ে ওরা ফিরে আসছিল। রাম সিং ঠিকমত চলতে পারছিল না। জুতোর সঙ্গে ক্র্যাম্পনপরা তার অভ্যাস নেই কোন জন্মে। প্রায় টলতে টলতে আসছিল, বরং বলতে পারা যায় লাকৃপা টেনে আনছিল কোমরের দড়ির টানে। লাকৃপাই হঠাৎ টের পায়। গুড়গুড় চির পরিচিত, চির ভয়াবহ শব্দ। অভিজ্ঞ শেরপার এতটুকু ভুল হয় না। পিছনে যম। রাম সিং বিরক্তই হয়। কিন্তু লাকৃপা ততক্ষণে দৌড় লাগিয়েছে, আর দড়ির টানে রাম সিং-এরও না ছুটে উপায় নেই। হুড়মুড় করে তুষার ধ্বস নামল তাদের পেছনে। রাম সিং এবার বুঝতে পেরেছে। লাকৃপা এখন থামতে চাইলেও সে আর থামতে রাজি নয়।

লছমন সিং ষ্টোভে বরফ গলিয়ে চা করছিল। সবাইকে দিল। সবাই বাইরে বসলাম। চোখে ভেসে উঠল জাটুলিতে রাম সিংএর বৌ, এক বছরের ছেলে ভম্বল আর তার বুড়ী মায়ের মুখ। রাম সিং আমাদের পুরানো বন্ধু। ১৯৬৯ সালে সুন্দরডুঙ্গা অভিযানে ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ ও কুশল সিংএর সঙ্গে সেও একটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করেছিল। জাটুলি থেকে আমারই অনুরোধে সে এই দলে যোগ দিয়েছিল। তার কোন কিছু হলে কিভাবে জাটুলিতে ফিরে যেতাম তার মা-বৌ-ছেলের সামনে? আর শেরপা লাকপা! তারও রয়েছে দুই ছেলে, এক মেয়ে, বৌ। বারবার হৃদ্‌কম্প হয়েছে আমাদের এসব ভেবে!

থারকোট শৃঙ্গের (২০,০১০´ ফিট) মুখোমুখি, সামনাসামনি দাঁড়ালে বরফের ময়দান, যেখানে তাঁবু-

গুলো রয়েছে, তার ডানদিকে সারি সারি দাঁত বার করা ভয়াবহ সব ক্রাটল, যেন ভেংচি কাটছে অভিযাত্রিনীদের। এই ভেংচির কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। মনে হচ্ছিল, ওগুলো বিরাট বড় বড় ট্রেঞ্চ। থারকোট শৃঙ্গকে দুর্ভেদ্য করে রাখার জন্যই ওগুলো যেন তৈরি করা। —এই অগ্রবর্তী মূল শিবির থেকেও থারকোটের দূরত্ব বেশ কিছুটা। আমাদের সামনে ডানদিকে সম-দ্বিবাহু ত্রিভুজের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থারকোট শৃঙ্গ। তার ঠিক বাঁ পাশেই তাঁবুর মত টেন্ট পিক। আরো বাঁ দিকে দুটি সূচালো অনামী শৃঙ্গ, টালখাওয়া গোছের, তার বাঁদিকে আরো একটি অনামী গম্বুজাকৃতি শৃঙ্গ, সকলের বাঁদিকে ভানোটি শৃঙ্গ (১৮,৫০০´ ফিট) এই ভানোটির বাহুর ওপর যে বরফের ময়দান, তার ওপরেই আমাদের বর্তমান অবস্থান। —এখান থেকে ভানোটি এবং তিনটি অনামী শৃঙ্গের অসংখ্য ক্রাটল ভর্তি মৃত্যুসঙ্কুল হিমবাহ এবং টেন্ট পিকএর হিমবাহ পার হয়ে—থারকোটের পাদদেশে সামান্য একটু সমতল জায়গা পেয়ে গতকাল এক নম্বর শিবির স্থাপনের জন্য তাঁবু ও রসদ রেখে আসা হয়েছিল। জায়গাটি প্রায় ভানোটি শৃঙ্গের সমান উঁচু। নন্দাদেবীর শিরা দেখা যায় খুব স্পষ্ট; এখান থেকে ভানোটি শৃঙ্গের সমান সমান আসা গেছে, মনে হয় (১৮০০০´ ফিট)।

ফিরে আসছিল গতকাল এক নম্বর থেকে মিঃ টাসি ও লাকপা। ওরা দুঃসাহসী: কোন দড়ি বাঁধা ছিলনা ওদের কোমরে। সামনে লাকপা, পিছনে মিঃ টাসি। দূরত্ব বড় জোর ১৫ গজ। টেন্ট পিকের হিমবাহ সবে পার হয়েছে। হঠাৎ দুজনের মাঝখান দিয়ে বিরাট একটা পাথর গড়িয়ে কোন্ অতলে চলে গেল ঘট ঘটাং করতে করতে। দার্জিলিং হিমালয়ান ইন্সটিট্যুটের সিনিয়র ইন্সট্রাকটর মিঃ টাসি তো থ! হিমবাহে এরকম পাথরের চাঁই! অস্বাভাবিক তো নিশ্চয়ই! কী ধরণের হিমবাহ এটি! —মিঃ টাসি পর্বতারোহী। সে ভাবতে পারে হিমবাহ নিয়ে, পাথরের আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে। কিন্তু আমাদের ভাবনা—ঐ পাথর যদি তারই মাথায় গড়াতো! অদ্ভুত হেসে ঘাড় বাঁকিয়ে তুরন্ত উত্তর তার—"এ্যায়সা হোতাই হ্যায়!" —তাই-ই যদি হয়, তাহলে ভরসাটা কোথায়? সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ টাসিও দুর্ভাবনায় পড়েছে। রাথাঙ্, কাব্রু কর্কড্, ত্রিশূলী প্রভৃতি দুঃসাহসিক অভিযানের বীর বিজয়ী সেনানী আজ চিন্তিত। গতরাত্রেও দুবার গুড়-গুড় আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে ওদের। ওদিককার পাহাড়গুলো যেন কামান দাগছে, কিছুতেই এগুতে দেবেনা।

মিঃ টাসি সব কিছু বুঝিয়ে বলল। প্রথম কথা, এক নম্বর শিবির যেখানে করা হয়েছিল সেখান থেকে আরো হাজার ফিট ওপরে দু'নম্বর শিবির করতে হবে। তার জন্য যথেষ্ট লোকবল দরকার। কিন্তু মালবাহকরা উচ্চতায় সকলেই অসুস্থ, কাউকে কাজে লাগানো যাবেনা। এমনকি গাইড

লছমন সিং-এরও রোজ মাথা ধরছে। রাম সিংও সেই রকম। এরা উঁচুতে কাজ করার উপযোগীই নয়। মালপত্র, তাঁবু, দড়িদড়া, যন্ত্রপাতি, রসদ বইবে কারা এই দীর্ঘ পথ? যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে কি করে সবগুলো শিবিরের মধ্যে? দ্বিতীয়তঃ হরদম তুষার ধ্বস নামছে। দুদিনেই বিপদের মুখে পড়েছে ওরা। মনোবলে ভাটা পড়েছে। তৃতীয়তঃ সন্দেহ প্রকাশ করছে মিঃ টাসি. দুর্গম এই পথ হয়ত সঠিক পথ নয়। সুকরাম নালা অনুসরণ করে উঠলে আমাদের ডানদিকের একটা গিরিশিরা বেয়ে মূল থারকোট পর্বতের হিমবাহ পাওয়া যেতে পারে। সেই হিমবাহ অনুসরণ করে উঠলে এতগুলো ফাটলওয়ালা বিশ্রী হিমবাহ পার হবার ঝুঁকি নিতে হয় না। চতুর্থতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা ও বরফে কারিগরীর জন্য আরও শেরপার দরকার। পঞ্চমতঃ আবহাওয়া ক্রমাগতঃ এত ভাল থাকার জন্যই হয়ত ফাটল ধরছে অহরহ বরফের স্তূপে, নামছে তুষার ধ্বস যখন তখন এবং বর্ষা নামারও বেশী দেরী নেই আর। পাহাড়ী বর্ষা একবার তার রূপ নিয়ে নামলে ফিরে যাওয়াই কষ্টকর হবে।

—"এবার তুমিই বল—" —"আরে কি মুস্কিল—আমি কি পর্বতারোহী নাকি! স্বপ্না-লক্ষ্মী-শীলা এবং মিঃ টাসি—তোমরাই ঠিক করবে—"

অনবরত তুষারধ্বস নামায়, দুর্ঘটনার ভয় থাকায় অহেতুক ঝুঁকি না নিয়ে ১৮,০০০´ ফিটের ওপর থেকে মহিলাদের থারকোট অভিযান পরিত্যক্ত হল। —নেমে আসছি ধীর পদক্ষেপে ওদের পিছু পিছু। থারকোট দু'দুবার ফিরিয়ে দিল। ফিরে চলেছি সুকরাম থেকে। আভাদিরা হরিণের পাল দেখেছিল সুকরামে, আমরা যেদিন ওপরে ছিলাম, সেদিন। এরাই নাকি নন্দাদেবীর বাহন—তথাকথিত 'থার'—এদেরই বাসস্থান থারকোট। এরা বুঝি বলতে এসেছিল,—"দুঃখ কোরোনা, আবার এসো আমাদের আঙিনায়, পথ চেয়ে থাকব!" আশার মরীচিকা বহু-বহুকাল আগে সুন্দরডুঙ্গার জলেও দেখাছিল এক পাহাড়ী মেয়ে। হঠাৎ সে পথ হারিয়ে আবিষ্কার করেছিল এই নির্জন নদী। আঁজলা ভরে জলপান ক'রে খেলার ছলে তার আঁচল ডুবিয়ে ছিল ঈগলচক্ষু জলে। আঁচল উঠিয়ে দেখে, একী! সোনার চুমকিতে ভর্তি তার আঁচল। কোথা থেকে এলো লোভ। ভূর্জগাছের বাকল কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে পুরো কাপড়টা তার জলে ডোবালো। হায়! স্রোতে ভেসে গেল তার কাপড়! কোথায় সোনা, কোথায় কী! লজ্জায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সে হিমশীতল জলে। খুঁজে পেলনা কেউ তাকে। রূপকথার নায়িকা হয়ে রইল। আজো মাঝে মাঝে কখনো কোন আনোয়াল সোনা খুঁজে ফেরে সুন্দরডুঙ্গা নদীতে। পেলেও পেতে পারে বুঝি সোনার কাপড়!

সোনার থেকেও দামী এই নদী—যেন মুক্তাধারা বইছে। লোভ বিসর্জন দিয়ে, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে

পাহাড়ী মেয়ে সুন্দরডুঙ্গাকে মুক্তানদীর রূপ দিয়েছে । —ফিরে চলেছি। পরিচিত এ পথের প্রতিটি পাথর, ঘাস, লতা, পাতা, ভূজগাছ হাত নাড়ছে। পাইনরা দুলছে। লাল রডোডেনড্রন সবে ফুটছে থরে থরে—আমাদের বিদায়ে যেন চোখ রাঙিয়ে ফেলেছে। অজস্র পাহাড়ী গোলাপের সমারোহ। হেমকমল, ফেন কমলের ছড়াছড়ি। ধূপের গন্ধের আলপনা। ঈগলেরা ডানা ঝাপটায়, মুনিয়াল, কালচুনা আর লম্বা লেজওয়ালা পাখি উড়ে যায়···

সেই সঙ্গে চলেছে এদেশের পাহাড়ের শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণীর রঙ বেরঙের মিছিল। দুবার আসার ফলে অনেকে বন্ধু হয়ে গেছে, অনেকের ঘরেই গেছি, রোগ, ব্যাধি সম্পর্কে অনেককেই পরামর্শ দিয়েছি। শোকে-দুঃখে, আনন্দে উৎসবে, বিপদে আপদে আমাদের পথ প্রদর্শক ও মাল-বাহকরাও একই পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছিল। কঠিন অথচ বিচিত্র, বহুবর্ণরঞ্জিত জীবন এই পাহাড়িয়াদের। শিখর জয় সব থেকে বড় কথা নয়। পাহাড় মানেই শুধুই পাথর নয়, বরফ নয়। মানুষের মনের ঘৃণা-অবিশ্বাস-সন্দেহের পাহাড় জয় করাই বড় জয়। ওরা নারী, মায়ের জাত। ওরা সহজেই জয় করেছে এদের মন। কত সাবলীল ভাবে সবাই ওরা গেছে রাম সিং-এর বুড়ী মার বাড়ী—নিকানো উঠানে বসে খেয়েছে গমভাজা, ওপরে যাবার আগে বারবার সাবধান করে দিয়েছে ওদের পাহাড়ী মেয়েগুলো। পান সিং এর কাছে লক্ষ্মী আজ থারকোট-দেবী। আভাদি খড়্গ সিং এর মা। শীলা - স্বপ্না - ভরলক্ষ্মীর সঙ্গে চন্দ্রাবতীর অদ্ভুত, অকল্পনীয় আত্মীয়তা। টি বি রোগে মুমূর্ষু এক রোগিনীর জন্য এদের চোখ ফেটে জল আসে। চোখে ভাসে সেই অপরূপ মাতৃমূর্তিগুলি! —এই জয়ের তুলনা কোথায়?

শিবনাথ পাঁজার

চাঁদীপুরে কয়েক দিন

সামান্য পাথেয় যোগাড় হতেই কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম উড়িষ্যার সমুদ্র সৈকতে চাঁদীপুর দেখতে যাব। কয়েক দিন তবু ট্রামবাসের হাত থেকে বাঁচা যাবে। ৫ই মার্চ ঠিক করলাম দোল পূর্ণিমা কাটাব চাঁদীপুরে। সেখানে উড়িষ্যা সরকারের ডাক বাংলো আছে। ট্যুরিষ্টস্ বাংলোয় থাকার সরকারী দক্ষিণার হিসাব দেখেই মাথা ঘুরে গেল। মাথাপিছু থাকার ভাড়া চার টাকা পঁচিশ পয়সা। যা হোক বেরিয়ে তো পড়া যাক, গিয়ে ঠিক করা যাবে।

৮ই মার্চ, রাতের ট্রেনে অর্থাৎ পুরী প্যাসেন্‌জারে যাত্রা করলাম। অজানা, অচেনা পথে পা বাড়াচ্ছি—তাই সকলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল আটটার পর বালেশ্বরে নামলাম। চাঁদীপুরের আশপাশে কিছু পাওয়া যায় না। বালেশ্বর বাজার থেকে পাঁচ ছ' দিনের প্রয়োজনীয় র‍্যাশন কিনে নেওয়া হল। দুপুরের খাওয়া সারলাম রেলওয়ে ক্যাটারিংএ। চাঁদীপুর সাত মাইলের পথ। পাকা বাঁধান রাস্তা। ট্যাক্সি করে রওনা হলাম। ধান কাটা হয়ে যাওয়া নির্জন মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা। কয়েক মাইল যাওয়ার পর পেলাম ভারত সরকারের প্রতিরক্ষার জন্য গোলাবারুদ পরীক্ষার স্থান "প্রুফ হাউস"। বিরাট কলোনী। সেটা পার হয়ে অনেকখানি যাওয়ার পর আমরা গন্তব্যে পৌঁছালাম। জিনিষপত্র নামিয়ে আমরা কয়েকজন দাঁড়ালাম, দু'জন গেল বাসস্থানের খোঁজে।

নীল জল দেখতে পাচ্ছি না—কারণ ওদের আসতে দেরী হচ্ছে তাই মনে মনে রাগও হচ্ছে। আধ ঘণ্টা পর ওরা ফিরল, বাংলোয় থাকার সুন্দর ব্যবস্থা, কিন্তু রান্না করতে দেওয়া হয় না। অথচ আমাদের সঙ্গে রান্নার জিনিষ রয়েছে। দলপতি বললেন, চল জিনিষপত্র নিয়ে সমুদ্রের দিকে যাই। সে কি? আমরা কি নীল আকাশের নীচে থাকব! দলপতি আমাদের সমুদ্রের কাছে একটি বাড়ীতে নিয়ে গেল। ময়ুরভঞ্জের রাজার বাগান-বাড়ী, বর্তমানে ভগ্নদশা। সুন্দর বাড়ী, কিন্তু জানলা দরজা চুরি হয়ে গেছে। বাড়ীটি এখন বন বিভাগের। এ্যাসবেস্‌টসের ছাউনি দিয়ে কয়েকটি ঘর বন-বিভাগ বাসোপযোগী করে নিয়েছে। ঠিক হল এখানেই থাকব। ঘর পরিস্কার করে নিয়ে গুছিয়ে বসার আগেই চা ও জেলী-রুটী হাতে পেয়ে গেলাম। চা পানান্তে চললাম সমুদ্র দেখতে। —তখন সন্ধ্যা হয় হয় আর কি। হু হু করে বাতাস বইছে। উত্তাল সমুদ্র অপরূপ লাগছে। নির্জন সমুদ্রতট। দীঘার সমুদ্রতট বেশ বড় কিন্তু চাঁদীপুরের সমুদ্র-তট তার তিন গুণ। মাটি সামান্য নরম বটে, তবে পা বসে যায় না। সামনে বিরাট বালিয়াড়ী চোখে পড়তে সকলে গিয়ে বসলাম। একে একে সকলেই তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা

জবাকুসুম সঙ্কাশং

কন্যাকুমারী।

দিলীপ ঘোষাল ॥

রাজোয়ারা

অম্বর প্যালেস্‌ - জয়পুর

রামরাঘব মৈত্র ॥
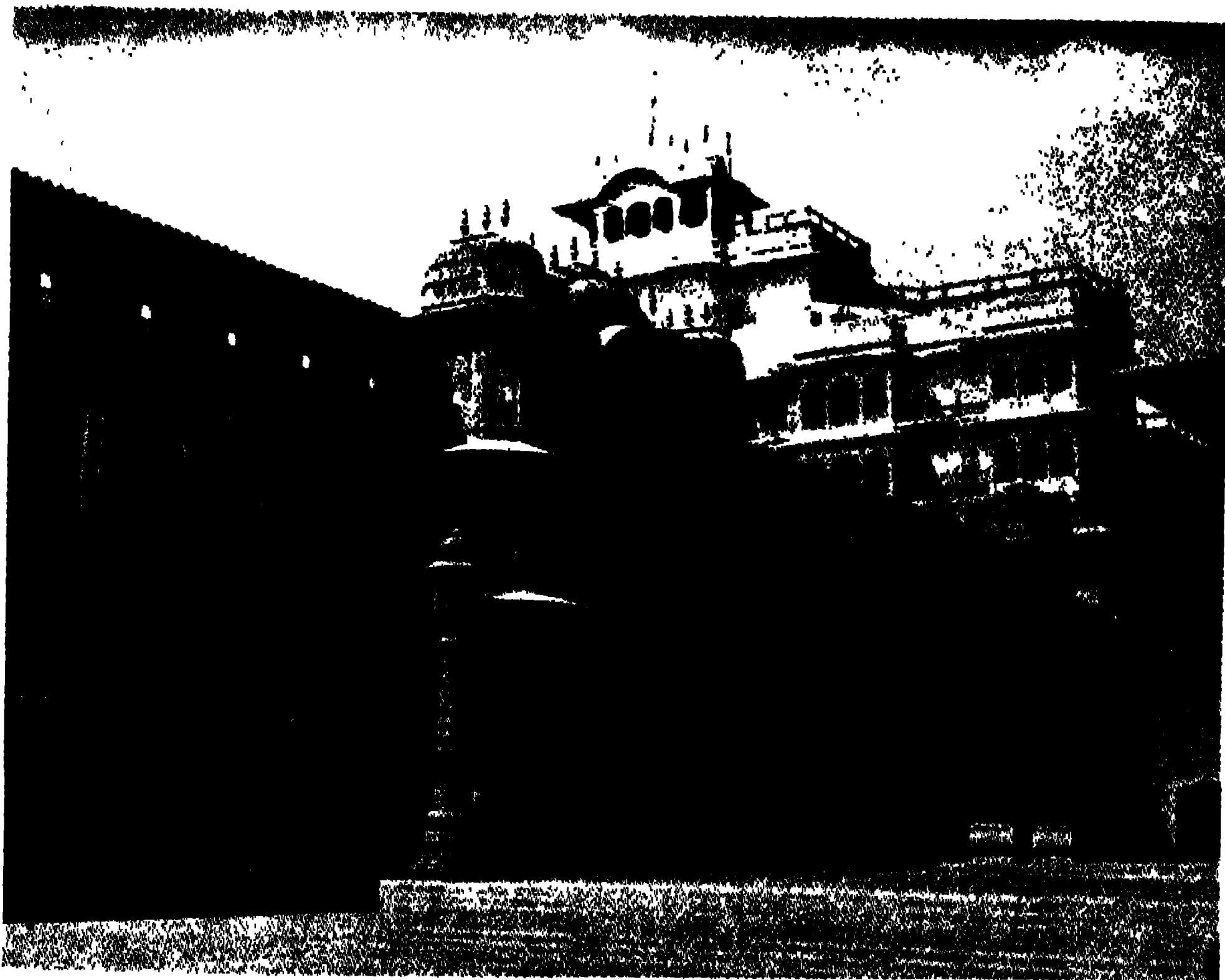
শৈলকুমারী

সরযূ নদী — কুমায়ূন

মনোমোহন ঘোষ ॥

স্তব্ধ অতীত
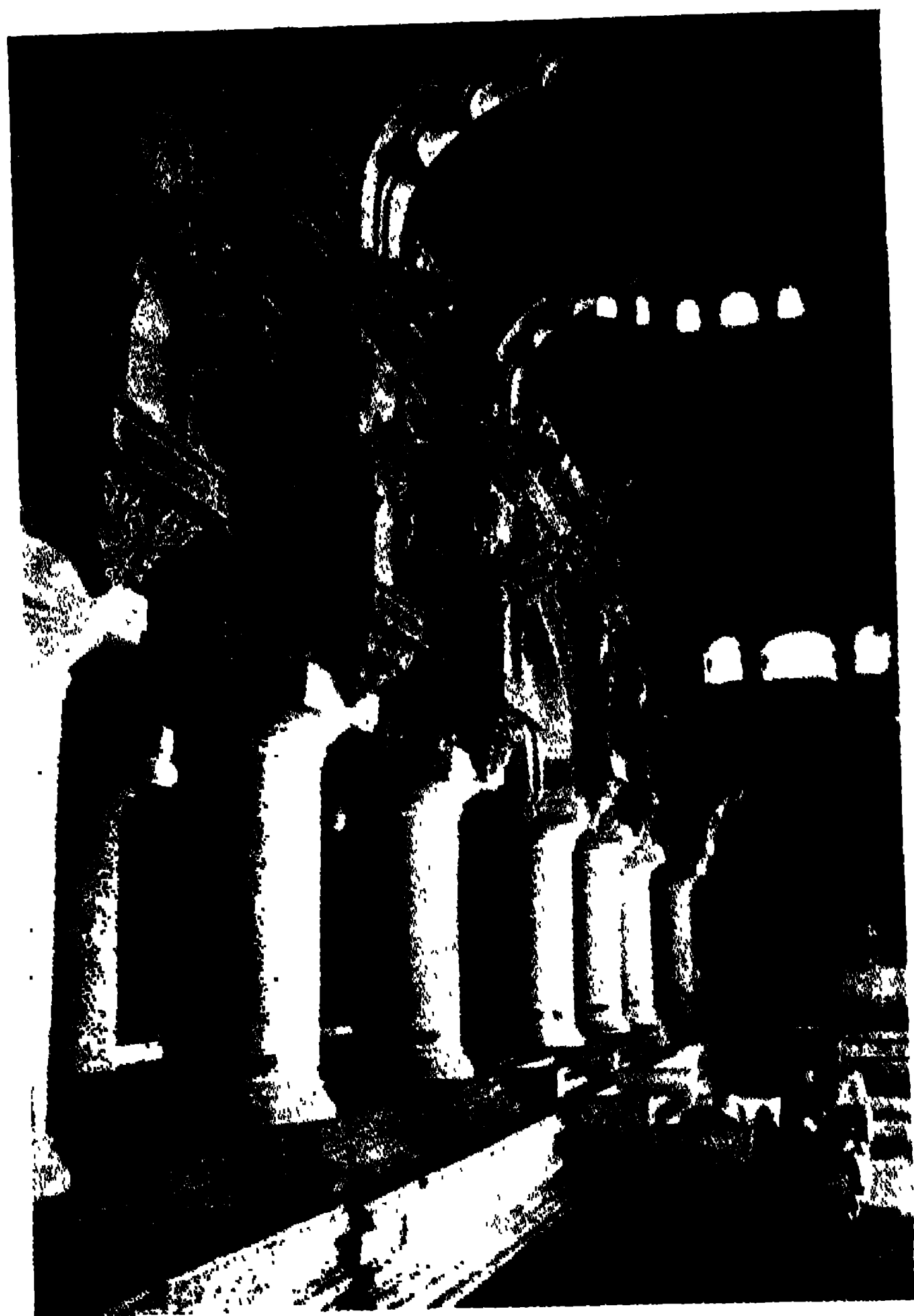
থিরুমল নায়েক প্যালেস্ — মাদুরা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

বলাতে লাগল। চাঁদনী রাত, প্রবল বাতাস বইছে, সামনে বিরাট বিক্ষুব্ধ সীমাহীন সমুদ্র—সব মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। হুঁশ হোল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে। নিজেদের রান্না করতে হবে—অতএব 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'। ব্যাজার মন নিয়ে আস্তানায় ফিরলাম। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে আবার বসলাম গিয়ে পূর্বের জায়গায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। কোথা দিয়ে একটা দিন কেটে গেল।······

বন্ধুর ডাকে ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। সূর্যোদয়ের দেরী নেই। অতএব চলো সমুদ্রের ধারে। সে কি অপূর্ব দৃশ্য। প্রথমে খানিকটা আলোর আভাস। তারপর আলো বাড়তে বাড়তে শেষপ্রান্ত থেকে গাঢ় লাল রং এর সূর্য উঁকি দিল। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ গোল আকার নিয়ে সূর্য যেন জলের ওপর ভাসতে লাগল। সমুদ্রের ওপর কোন দিন এত ভালভাবে সূর্যোদয় দেখিনি। দার্জিলিং-এ টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মধ্য থেকে সূর্যোদয় দেখেছি—সেও বড় সুন্দর কিন্তু আজকের দেখা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে চোখে মুখে। সামনে অথৈ জলরাশির আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর বিরাম বিহীন পাগলামী, আর পেছনে ঝাউবনের গভীরে বিদায়ী-রাত্রির বিলীয়মান অন্ধকারের রহস্যময় স্পর্শ। গোটা পরিবেশটার মধ্যে কেমন যেন ক্রমশর ইঙ্গিত।

তাড়াতাড়ি ফিরলাম—কারণ দু'বন্ধুর আসার কথা ছিল। তারা বেশ দেরী করেই এল। বন-বিভাগের এক জনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লাম বুড়ীবালামের তীরের উদ্দেশে। দু'মাইল পথ। এক পাশে গহন ঝাউবন আর কেয়া ঝাড় অন্য দিকে ধূ ধূ মাঠ। বুড়ীবালামের কাছে উপস্থিত হতেই মনে পড়ল বিপ্লবী বাঘা-যতীনের কথা—ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এই নদীরই কোন কিনারায় দাঁড়িয়ে। আজ আমরা সেখানে এসেছি পর্যটক হিসাবে। বর্তমান উড়িষ্যা সরকারের ফিসারিজ বিভাগের কয়েকটি লঞ্চ দেখলাম এখানে দাঁড়িয়ে। সমুদ্র ও নদীর মাছ ধরে ফিরছে মাঝিরা। নদী মাত্র একশ' গজ দূরে সমুদ্রে মিশেছে। নদীর ওপারে ঘন ঝাউবন। রোদ বাড়ছে, এবার ফেরার পালা কারণ পেটের আগুনও জ্বলছে। আস্তানায় ফিরে দেখি দু'টি বিদেশী পরিবার এসেছে সমুদ্রের ধারে সূর্যস্নান করতে। দূর থেকে তাদের মনে হচ্ছিল যেন কতগুলি মোমের পুতুল নিশ্চল হয়ে বালির ওপর শুয়ে আছে। আমরা ছুটি উপভোগ করি সারা সপ্তাহের বকেয়া কাজ নিয়ে আর ওরা আসে সব কাজ ফেলে।

যাই হোক রান্নার কাজ শেষ করে আমরা চললাম সমুদ্র স্নানে। প্রায় এক মাইল হেঁটে জলের ছোঁয়া পেলাম। সমুদ্রে তখন ভাঁটা। জলের রেখা হাঁটুর ওপর উঠল না। অথচ কিছুক্ষণ আগেও ছিল উত্তাল ঢেউয়ের মাতামাতি। শেষ পর্যন্ত পলিথিনের মগে করে স্নান সারতে হোল। মনের

দুঃখ চেপে রেখে বাংলোর কলের জলে গায়ের কাদা ধুয়ে নিলাম। খাওয়া সেরে সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়িতে দিবা নিদ্রার ব্যবস্থা করলাম। বেলা সাড়ে তিনটায় জঙ্গলের দিকে বেড়াতে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম সদলে। বাংলোর পাশ দিয়ে রাস্তা, বিরাট বিরাট ঝাউগাছ একে অপরের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করছে। প্রায়ান্ধকার জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাঁটছি অনেকক্ষণ—দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে। বুড়ীবালামের আধ মাইল দূর থেকে জঙ্গলের পথ ছাড়লাম, ক্রমশঃ মোহানার দিকে যাচ্ছি। ইচ্ছা ছিল লঞ্চ ধরে ফিরব কিন্তু সারেং রাজী হোল না। তাই গল্প করতে করতেই ফিরতে হোল।

পরদিন বেলা ১০টা নাগাদ কলকাতা থেকে আর এক বন্ধু এল। সঙ্গে নিয়ে এল রেকর্ড প্লেয়ার নিঃসঙ্গতা কাটল। শুরু হোল রবীন্দ্র সঙ্গীত, "পথের শেষ কোথায়"······গান শুনে স্নান করতে গেলাম—সমুদ্রে নয় পাশের একটি পুকুরে। তারপর খাওয়া সেরে ঝাউবনে দুপুরের আলস্য কাটানো। বিকেলে, বুড়ীবালামের তীরে সূর্যাস্ত দেখলাম। আমাদের স্মৃতির সংগ্রহে দিন শেষের সূর্যের সেই অপরূপ আলো তার স্থান অধিকার করে রইল।

মুখে গানের কলি আর পায়ে পায়ে হাঁটা—অনেকখানি পথ কিন্তু চলতে বেশ লাগছিল। ঠিক হ'ল এই সপ্তাহ এখানে থাকব। দোলপূর্ণিমার চাঁদনী রাতে চাঁদীপুরকে প্রাণ ভ'রে দেখে যাব। কিন্তু রাত ফুরোতেই দেখলাম বিধি বাম—এক বন্ধুর মনে না দেখা দিয়ে দেহে দেখা দিয়েছে বসন্ত। অতএব সব আশা ত্যাগ করে ফিরতেই হবে। বিকেলের পুরী প্যাসেঞ্জারে ফেরার জন্য বহু কষ্টে গাড়ী ঠিক করলাম। যথা সময় ট্রেন ছাড়ল। জীবনে প্রথম পাওয়া প্রেমপত্রটির মত তখন বসন্ত মন জুড়ে রয়েছে ফেলে আসা চাঁদীপুরের আকাশ, বাতাস, আলো-অন্ধকার। চোখ বুজলে দেখতে পাচ্ছি ঝাউবন আর সমুদ্র। ধীরে ধীরে নামছে রাত্রির অন্ধকার!
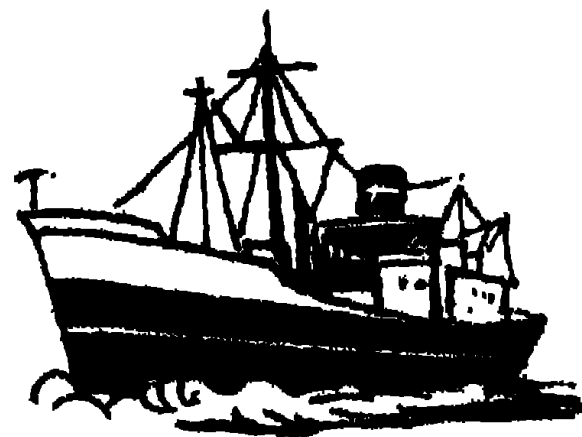
আমাদের ভ্রমণের লেখাগুলি পরিচালকদের নিজস্ব — তাই সেগুলি মোটামুটি যথাযথ রেখে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। — সম্পাদক

প্রথম ভ্রমণ : **দেওঘর — বৈদ্যনাথধাম** ॥ —কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৭১ সালের ১৩ই আগষ্ট আমাদের সমিতির বাৎসরিক ভ্রমণসূচীর প্রথম ভ্রমণ, দেওঘর-বৈদ্যনাথধাম যাত্রা। এটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমি আনন্দিত ও গর্ব্বিত হয়েছিলেম। কারণ, 'মনে ছিল আশা' প্রথম ভ্রমণটি সুষ্ঠু ও তৃপ্তিকর ভাবে পরিচালিত হলে, মনের বদ্ধমূল সংস্কার বলবে,— 'না, হে, নববর্ষের হালখাতায় যাত্রীদের শুভেচ্ছার পুঁজি ভালই জমা পড়েছে।'

হাওড়ার প্ল্যাটফরম্ যখন প্রায় ঘুমন্ত, সেই মধ্যরাত্রে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার আমাদের ২১ জন যাত্রী নিয়ে দুশো বারো মাইল পথ পাড়ি দিল। ভোরের শিশুসূর্য্য যখন উঁকি দিল ট্রেনের কামরার জানলায় তখন গাড়ি ছেড়েছে সীতারামপুর জংশন। জসিডি জংশনে গাড়ী বদল করার দায় নেই, কারণ দেওঘরের থ্রু কোচে বসে আছি। শ্রাবণের মেঘলা আকাশে দেওঘর তখন জমজমাট। ষ্টেশনের সামনেই প্রাতঃরাশ সেরে দেড় মাইল দূরে রওনা হলেম করনীবাদের পথে। আমার নিকট আত্মীয়া শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে একটি সুন্দর বাড়ীতে যাত্রীদল সাময়িক আস্তানা পাতলেন। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ নেই। ষ্টেশনের কাছে দুপুরের আহার সেরে দশখানি সাইকেল রিক্সা সারবন্দী রওনা হোল সাত মাইল দূরে 'তপোবন' এর পাহাড়ী পথে। বহুবার দেখা দেওঘরকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করার নেশা পেয়ে বসলো, এই কুড়ি জন সহৃদয় যাত্রীর সৎসঙ্গে এবং আনন্দোচ্ছল পরিবেশে।

দারুণ গ্রীষ্মে তপোবন পাহাড়ে ওঠা, পিপাসায় কাতর হওয়া এবং ফেরার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে একেবারে নাস্তানাবুদ হওয়া সবই যেন সেই আনন্দের সুরে সুখস্মৃতি হয়ে উঠলো। বালানন্দের সমাধি, তাঁর সাধনস্থান, আর সেই নির্জ্জন পাহাড়ী উপত্যকা পথে আমাদের সেদিনের ভ্রমণের সব উচ্ছাস ও আবেগ লিপিবদ্ধ করে রেখে এলেম চিরদিনের তরে। ফেরার পথে কুণ্ডায়

কুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দিরে আমরা প্রণাম রেখেছি আর সেই মন্দির প্রাঙ্গণে ও দীঘির পাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে এই অষ্টধাতুর জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তির আদি সেবকের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। আমাদের অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যা কাটলো করনীবাদে বিখ্যাত বালানন্দ আশ্রম ও ৺চারুশীলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত যুগল মন্দিরে। সারাদিন পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন ঘটলো যুগল মন্দিরের সেই শ্বেতপাথরের নাট-মন্দিরে দেহমন জুড়ানো দক্ষিণের শীতল বাতাসে। দলের ছেলেরা অনেকে নর্মদা নামক আশ্রমের দীঘির শীতল কালো জলে স্নান করলো, মহিলারা দেখলেন বালানন্দস্বামী ও রাধাকৃষ্ণের সন্ধ্যারতি ও শুনলেন বালানন্দস্বামী ও তাঁর প্রিয় শিষ্য মোহনানন্দ মহারাজের সাধনজীবনের নানা কাহিনী।

পরের দিন ১৪ই আগষ্ট, আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল বৈদ্যনাথজীর মন্দির দর্শন। অনেকেই স্নান সেরে অভুক্ত অবস্থায় বিগ্রহ দর্শন, স্পর্শন এবং পূজাপাঠ সাঙ্গ করলেন। বৈদ্যনাথ-মহাদেব বিগ্রহ নাকি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। তাঁকে ঘিরে সেই রামায়ণের যুগ থেকে অনেক গল্প, অনেক কথা, অনেক উপকথা। মন্দিরের পেছনে রয়েছে শিবগঙ্গা নামে বিশাল দীঘি। যাত্রীরা তাতেই স্নান সেরে মন্দিরে যান, অনেক নারী-পুরুষ 'দণ্ডী' খাটেন। বৈদ্যনাথ মন্দিরে নিত্যই যাত্রীর ভীড়, নিত্যই মহোৎসব। ভারতের নানা প্রান্তের মানুষ নানা তাঁদের কামনা, নানা তাঁদের উপচার। গঙ্গাহীন দেশে গঙ্গাজল বয়ে নিয়ে আসেন দূর ভাগলপুর—মোকামা—পাটনার মানুষ। দেওঘর একান্ন পীঠের এক পীঠ। দেবী বিমলা, ভৈরব বৈদ্যনাথজী। শিব ও শক্তির মন্দির যুক্ত রয়েছে শূন্য পথে লাল সুতোর ডোরে। মন্দির প্রাঙ্গণে তেত্রিশকোটি দেব দেবীর ভীড়। সবই মামুলী ধাঁচের মগধী মন্দির। দেওঘর মানেই বিখ্যাত পাণ্ডা আর স্বনামখ্যাত প্যাঁড়া। তবে পাণ্ডার সঙ্গে সামান্য বচসাও হোল না। দেওঘরে পাণ্ডার সঙ্গে দরকষাকষি বা হাতাহাতি না হলে ঠিক কেমন যেন তীর্থ দর্শন জমে না, এমন একটা প্রবাদ চালু আছে। বরং পাণ্ডাঠাকুরের মুখমিষ্টি ও প্যাঁড়া দিয়ে মিষ্টি মুখ সমস্ত ভ্রমণকে মিষ্টি মধুর করে তুললো।

শেষ পর্য্যায়ে ছিল দেবসঙ্ঘ মন্দিরে হৈমবতী-জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দর্শন। সাধন সমর সম্প্রদায়ের এই মন্দিরটির গঠন নৈপুণ্য ও শুদ্ধ এবং শান্ত পরিবেশ দর্শককে সহজেই আকৃষ্ট করে। সৌভাগ্য বশতঃ সেখানে মঠাধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। এখানকার সাধকবৃন্দ আমন্ত্রণ জানালেন—'আসবেন দুর্গাপূজায়। একটা নুতন ধরণের ভাবের পূজো দেখে যাবেন।' —আবার সেই হাওড়া থ্রু কোচ্—সেই মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ; দূর দুরান্তে গিয়েছি এক্সপ্রেস-মেল ট্রেনে, কোনদিন সুনজরে দেখিনি মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারকে। আজই প্রথম ভাল লাগলো তার এই মন্দগতি, তার এই ডুল্‌কি চাল।

এই ভ্রমণে জনপ্রতি খরচ হয় ৪০৲ টাকা।

দ্বিতীয় ভ্রমণ : **নৈনিতাল—রাণীক্ষেত** ॥ —অজয় চক্রবর্তী

২৪শে অক্টোবর শুভ রবিবার আমাদের যাত্রা শুরু হয় নৈনিতাল অভিমুখে। ট্রেনে রিজার্ভেশনের অসুবিধায় পনেরজন সভ্য নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি ট্রেনে একই রাত্রে যাত্রা শুরু হয় হাওড়া ষ্টেশন থেকে। ২৫শে অক্টোবর রাত নয়টার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সবাই একত্রে মিলিত হই লক্ষ্ণৌয়ের ছোট ষ্টেশনে। লক্ষ্ণৌ থেকে রিজার্ভেশনে নৈনিতাল এক্সপ্রেসে কাঠগুদাম অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর সকাল নয়টায় আমরা কাঠগুদাম এসে পৌঁছালাম। কাঠগুদাম থেকে সুন্দর সৌখিন ডি-লাক্স বাসে চড়ে সকলকে নিয়ে নৈনিতাল অভিমুখে যাত্রা করি। নৈনিতালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে ট্রেনের ধকল ভুলে যাই। সবাই তাকিয়ে আছেন কখন বহু প্রতীক্ষিত নৈনিতালে হাজির হতে পারি। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় আমরা নৈনিতাল লেকের কাছে এসে পৌঁছলাম। কুলী মারফৎ মালপত্তর নিয়ে পূর্ব নির্দ্ধারিত হিমালয়ান হোটেলে এলাম। আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু দুপুরের আহারাদির পর কেউই আর বসে থাকতে রাজী নয়। নৈনিতালে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলের সব ক্লান্তিই দূর হয়ে যায়। সবাই বেরিয়ে পড়ে নৈনিতালের বিখ্যাত নৈনী মন্দিরের ঠাকুর দর্শন করতে। ঠাকুরের দর্শন ও পূজা সেরে, মিউনিসিপ্যাল বাজার ঘুরে ফিরে আসে হোটেলে।

২৭শে অক্টোবর সকাল থেকে তাড়া পড়ে যায় সকলের শহর দেখার। ব্রেকফাষ্ট সেরে একদল যায় "চায়না পিক" দেখতে আর একদল যায় নৈনিতাল শহরের আশেপাশে। পরের দিন ২৮শে অক্টোবর একদল 'স্নো-পিক' দেখতে যায়। এখান থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত কুমায়ুন উপত্যকা ও তুষারশৈলী হিমালয়ের পাঁচটি শৃঙ্গ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। আর একদল চড়ে ঘোড়ায়, কেউবা করে নৌকা বিহার। আর সংসারী লোকেরা ঘুরতে থাকে বাজারে, নৈনিতালের কিছু স্মৃতি স্বরূপ বাজার করে নিয়ে যেতে।

২৯শে অক্টোবর রিজার্ভ বাসে বেলা এগারটা নাগাদ আমরা রাণীক্ষেতে এসে হাজির হই। আহারাদির পর আমরা রাণীক্ষেতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়ি আর ছুটে বেড়াই এক টিলা থেকে আর এক টিলায়। পরের দিন চার্টার্ড বাসে আমরা "চিপাটুলি" ফলের বাগান দেখতে যাই। রাণীক্ষেতের নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও হিমালয়কে এত কাছে পাওয়ার আনন্দ আমাদের সকলকে আকৃষ্ট করে তোলে।

৩১শে অক্টোবর প্রত্যুষেই রিজার্ভ বাস যোগে সকাল দশটায় ভারতের সুইজারল্যাণ্ড কৌশানীর

বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে নামলাম। কুলীসহযোগে জিনিষপত্র নিয়ে পাহাড়ের রাস্তা ধরে প্রায় ৭০০ ফিট ওপরে "অনাশক্তি আশ্রম" (গান্ধী আশ্রম) -এ দুদিনের মত আস্তানা নিলাম। এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। নীচ থেকে সামান্য পণ্য যা আসে তা'দিয়েই চালাতে হয়। এই আশ্রমে থাকতে গেলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় রামধুন গান গাইতেই হবে। কিন্তু খাওয়ার বহর দেখে পরের দিনই আমাদের জনা পাঁচেক সভ্য আলমোড়ায় ফিরে যান। কৌশানীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সত্যই সুইজারল্যাণ্ড। ছবির মত সাজান প্রকৃতি। কৌশানীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সকলকে অভিভূত করে তোলে। দুদিন থাকার পর ২রা নভেম্বর প্রত্যুষে অনেক কষ্টে বাস যোগাড় করে আমরা আলমোড়ায় এসে হাজির হই। ঝির ঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ক্রমে বাড়তে থাকে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া শুরু হয়। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি আর তেমনি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা আমাদের অবশ করে তোলে। যারা আগের দিন এসে পৌঁছেছিলেন তারাই ঘুরে বেড়াতে পেরেছে। পরের দিন ঐ বৃষ্টির ফাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ যে জায়গায় ধ্যান করতেন, সেই জায়গাটা দর্শন করি। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমাদের ধর্ম্মভাবের মানসিকতা সৃষ্টি করে। আমাদের এখানেই ভ্রমণ সূচী শেষ হয়। বেলা বারোটায় আমরা ঘরে ফেরার পথ ধরি। সন্ধ্যায় কাঠগুদাম ও রাত্রি দশটায় রিজার্ভেশন নিয়ে যাত্রা শুরু করি। অনেকে লক্ষ্নৌ ও বেনারস দেখতে নেমে যান। আমি ৫ই নভেম্বর কলকাতায় ফিরে আসি। —নৈনিতাল ভ্রমণে জন প্রতি ২১০ টাকা ধার্য্য করা হয়।

তৃতীয় ভ্রমণ : **রাজগীর—নালন্দা** ॥ -অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭১। শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় ২৯ জন যাত্রী নিয়ে সমিতির অফিসের সামনে থেকে আমাদের বাস ছাড়ল রাত ১০ টায়। পরদিন বড়দিন, বেলা ১টা নাগাদ বুদ্ধগয়া পৌঁছাই। সারাদিন বুদ্ধগয়া দেখে বিকেলে গয়ায় ফিরে আসি। ভারত সেবাশ্রমে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুপাদ মন্দির দর্শন করেন সকলে।

২৬ তারিখ, সকালেও মহিলারা মন্দিরে পূজো দিয়ে আসেন। জলযোগের ব্যবস্থা সেরে সকলে আবার যাত্রা করি রাজগীরের পথে। রাজগীরে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে আর এক প্রস্থ জলযোগ সেরে আমরা উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের পাচকেরা আহারের ব্যবস্থা পাকা করে রাখে। খাওয়া মিটিয়ে আমরা বাস নিয়ে চলে যাই "রোপওয়ের" কাছে শান্তিস্তূপ দেখতে।

সেদিন ছিল রবিবার। সুতরাং অগণিত ভ্রমণ পিপাসু ভীড় করেছে। টিকিট করে শান্তিস্তূপে যায়

কার সাধ্য ! কোনক্রমে সে ব্যবস্থা পাকা করে শান্তিস্তূপ দেখা শেষ করি। পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত দেখে মন ভরে যায়। ফেরার পথে অনেকেই রাজগীরের বাজার দেখতে যান। রাতের খাওয়া শেষ করে অনেকেই আবার কুণ্ডে স্নান করতে যান।

পরদিন সকালে বাস ছোটে নালন্দায়। দর্শনীয় সবকিছু দেখে দুপুরের খাওয়া সেরে পাওয়াপুরীর পথে যাত্রা করি। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর বাড়ী ফেরার পথ ধরি। নওয়াদা, ঝুমরি তিলাইয়া এবং রাজৌলীর গভীর বন পার হয়ে চলে আসি গোবিন্দপুরে। ওখানে রাতের খাওয়া সেরে, সারারাত একটানা বাস চালিয়ে ভোরবেলায় উত্তরপাড়ায় ফিরে আসি। এই ভ্রমণে মাথা পিছু খরচ পড়ে ৬৫ টাকা। প্রতিটি যাত্রীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা মনে রাখার মত।

চতুর্থ ভ্রমণ : **দক্ষিণ ভারত** ॥ দেবদাস লাহিড়ী ও পঙ্কজ দেব

২৩শে জানুয়ারী ১৯৭২, নেতাজীর জন্মদিনে ১১-৪০ মিঃ হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে রওনা দিলাম মাদ্রাজ অভিমুখে। ২৫শে বেজওয়াদায় আমাদের রিজার্ভ বগিকে মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেসে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করায় ঐ দিন সন্ধ্যায় মাদ্রাজ পৌঁছতে পারি।

পরদিন প্রজাতন্ত্র দিবস ও ২৭শে ইদ উপলক্ষে ছুটি থাকায় বাস পেতে খুব অসুবিধা হয়। কোনক্রমে বিলাসবহুল (লাক্সারি) বাস যোগাড় হয়। কোচ থেকে বাসে এসে উঠি কিন্তু যাত্রার শুরুতেই এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বাধা পাই। এই ভাবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় নষ্ট করে, ছুটে চলি পক্ষীতীর্থের দিকে। পক্ষীতীর্থে পাখি আসে প্রসাদ খেতে বেলা সাড়ে এগারোটায়। আমরা পাঁচশো সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন ওপরে উঠি তখন প্রায় দেড়টা বাজে, পাখি উড়ে গেছে। ওখান থেকে যখন মন্দিরে যাই তখন মন্দিরও বন্ধ। নীচে নামলাম, বাস ছুটল মহাবলীপুরমের দিকে। পথেই খাওয়া সেরে নিতে হল। মহাবলীপুরমের মন্দির দর্শন সেরে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালাম। এখানে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। সকলে মনের আনন্দে ছোটাছুটি করতে থাকল। সকলকে ডেকে নিয়ে গাড়ীতে তুললাম। চারটে বাজতে চলেছে, আমাদের কাঞ্চীপুরম যাওয়ার প্রোগ্রাম বানচাল না হয়ে যায়। খুব দ্রুত বাস চালিয়ে কাঞ্চীপুরমে হাজির হই। মন্দির দেখে রাত্রেই কোচে ফিরে আসি। ফিরে দেখি কোচে আলো নেই, জলও তথৈবচ। চেষ্টা সত্ত্বেও সে রাত্রে কোন কিছুর ব্যবস্থাই রেল কর্তৃপক্ষ করল না।

২৭শে জানুয়ারী আজ এই কোচ ছেড়ে এগমোর স্টেশন থেকে রাত ৭-৩০ টায় নতুন কোচ ছুটবে

পণ্ডিচেরীর দিকে। মালপত্র নামিয়ে তুলতে হবে এগমোর কোচে। সকাল থেকেই লরীর ব্যবস্থা করা ও ইয়ার্ড থেকে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া, কুলি যোগাড় করা ইত্যাদিতে মেতে রইলাম। কিছুই ব্যবস্থা করা গেল না—অমানুষিক পরিশ্রম করে মালপত্র বইতে হল। অন্যেরা ট্যাক্সি করে মাদ্রাজ শহরের টুকিটাকি দেখতে চলে গেলেন। কিছু সংখ্যক সভ্য আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। সারাদিন পরিশ্রম করায় রাত্রের খাওয়া বাইরেই সারতে হোল।

২৮শে জানুয়ারীর সকালে পণ্ডিচেরীতে হাজির হই। সকলে বাসযোগে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, সমাধিক্ষেত্র, শ্রীমার-ঘর, অরোভিল, সমুদ্র সৈকত দর্শন করেন। রাত সাড়ে সাতটায় গাড়ী ছাড়লো ত্রিচিনাপল্লীর দিকে। পরদিন সকালে ত্রিচিতে নামলাম—থাকব দু'দিন—অতএব তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। স্টেশনের বাইরে বাস। মাইল দেড়েক দূরে জম্বুকেশ্বর মন্দির ও শ্রীরঙ্গম মন্দির। এই পথে ঘন ঘন বাস যায়। আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে যাত্রা শুরু করলাম। বাসে জম্বুকেশ্বর ও হাঁটা পথে শ্রীরঙ্গম মন্দির দর্শন করলাম। বাচ্চারা মুক্ত বাতাসে ফাঁকা রাস্তায় হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে চললো। পথ কম নয় প্রায় এক মাইল। মন্দিরে পুজা সেরে বাসে করে কোচে ফিরলাম।

৩০শে সকালে আমরা রকটেম্পল—গণেশ মন্দির দেখতে গেলাম। প্রায় তিনশ' সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরে উপস্থিত হলাম। রকটেম্পল থেকে ত্রিচি সহরটা ভারি সুন্দর দেখায়। ফেরার পথে সুন্দর বাজার অর্থাৎ শাড়ীর দোকান চোখে পড়ল। কে যে কোন দোকানে ঢুকে পড়লেন বুঝতে পারলাম না। দুপুর একটা নাগাদ কেনাকাটা করে সকলে কোচে ফিরে আসেন। ৩১শে দু'মাইল লম্বা পাম্বান সেতু পেরিয়ে বেলা এগারোটায় রামেশ্বরে হাজির হলাম। আহারাদির পর টাঙ্গা করে রাম-ঝারোকা, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দেখে সন্ধ্যায় রামেশ্বরের আরতি দেখে কোচে ফিরে আসি। রাতে গাড়ী চলে মাদুরা অভিমুখে।

পয়লা ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ন'টায় মাদুরা স্টেশনে নামলাম। মাদুরায় দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দির। স্টেশন থেকে আট মাইল পথ। দুপুরের খাওয়া সেরে সকলেই বেরিয়ে পড়লাম মন্দির দেখতে। কাছেই থিরুমল নায়েকের প্রাসাদ ও টেপাকুলম। এখানে এসে সকলের বাজার করার হিড়িক পড়ে যায়। মীনাক্ষী মন্দিরের রূপ ও সৌন্দর্যের কথা ভোলার নয়। দু'তারিখে ভোরে আমরা ত্রিবান্দ্রমে হাজির হই। বাসে করে পদ্মনাভন মন্দির দেখতে যাই। কিন্তু লুঙ্গি না থাকায় অনেকেরই মন্দির ঢোকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েরা মন্দিরে প্রবেশ করেন। আমরা এই ফাঁকে খাবার কেনার কাজ সারি। কেরলের সমুদ্র সৈকত, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারী দেখে ফেরার পথ ধরি। দুপুরের খাওয়া সেরে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ বাস চলে কন্যাকুমারীর পথে। সন্ধ্যা

সওয়া ছ'টা নাগাদ কন্যাকুমারী পৌঁছাই। সবাই দেখতে ছুটল সূর্যাস্ত, আমরা গেলাম ধর্মশালা খুঁজতে। জলখাবার সেরে সবাই গেলেন কন্যাকুমারী দর্শন করতে কিন্তু আবার দেখা দিল সেই লুঙ্গী সমস্যা। সামুদ্রিক ঠাণ্ডা থাকায় অনেকেরই আলোয়ান তখন লুঙ্গীর কাজ করলো। কুমারীর আরতি ও সৈকতে দাঁড়িয়ে চন্দ্রোদয় দেখে সকলে ফিরলেন। ভোরে সকলে গেলেন কুমারীর মঙ্গলারতি দেখতে, পরে সূর্যোদয়। তিন সমুদ্রের মিলনস্থানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়—পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় কিনা জানিনা।

তিন তারিখে নব নির্মিত বিবেকানন্দ রকটেম্পল দেখতে যাই। ওপারে লঞ্চে যেতে হয়। পরিচ্ছন্ন মন্দির, মন্দিরে স্বামীজির দণ্ডায়মান ব্রোঞ্জ মূর্তি। এখানে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে ধর্মশালায় ফিরে আসি। অনেকেই স্থানীয় জিনিষপত্র কেনাকাটা করেন। দুপুরের আহার সেরে কুমারীকে শেষ দর্শন করে, আবার বাসে চড়ে বসি। বাস ছুটে চলে ত্রিবান্দ্রম অভিমুখে। পথে সুচীন্দ্রম মন্দির। কিন্তু দর্শনের সমস্যা সেই এক লুঙ্গী চাই। আমাদের মনে হয় মাদ্রাজ ছাড়বার পর সব যাত্রীর লুঙ্গী পরে নেওয়া উচিৎ তা-নাহলে পথে কোথায় মন্দির পড়বে এবং দেখতে গেলেই বাধা পেতে হবে। কোচে ফিরলাম রাত সাড়ে দশটায়। পরদিন রাত পর্যন্ত বিশ্রাম থাকায় সকলে মনের ইচ্ছামত ঘুরতে পারলেন। রাত সাড়ে ন'টায় গাড়ী ছাড়ল। পাঁচ তারিখে ফিরলাম মাদুরায়—সেখান থেকে ত্রিচি ও রাত দেড়টায় তাঞ্জোরে পৌঁছলাম।

ছ'তারিখে সকালে গরুর গাড়ী রিক্সা ভাড়া করে বৃহদীশ্বর মন্দির দেখতে গেলাম। সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ, প্রবেশের মুখে কালো কষ্টি পাথরের নন্দী চোখে পড়ল। মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখে কোচে ফিরলাম। রাত আটটায় চিদাম্বরমে উপস্থিত হলাম। জানলাম সেদিন "আস্মান" উৎসব। রাত ১২টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে। মাইল খানেকের মত পথ আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম হাত-পাকে চালিয়ে নিতে। নটরাজ ও পার্বতী মূর্তি দর্শন করে উৎসব দেখে ফিরে এলাম। পরদিন সবাই ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ালেন। রাত আটটায় গাড়ী ছাড়ল। আট তারিখে এগমোরে ফিরলাম। যাদের মাদ্রাজের আশপাশ দেখা হয়নি তারা গেলেন, আন্নাদুরাই পার্ক ও সী-বীচ দেখতে। বাকিরা সব গেলেন পথের শেষ সঞ্চয় খরচ করতে।

ন'তারিখে কোচ ছেড়ে মালপত্র লরী করে মাদ্রাজ স্টেশনে ফিরে এলাম। স্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করে ওয়ালটেয়ারে সকালে ছ'ঘণ্টা কাটাবার ব্যবস্থা করা হল। দশ তারিখে ওয়ালটেয়ার হাজির হলাম। অল্প সময়ের মধ্যে বন্দর ও সমুদ্র সৈকত দেখে নেওয়া গেল। বিকেলে গাড়ী ছাড়ল। উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত যাত্রা করে এগারো তারিখে বিকেলে হাওড়ায় ফিরলাম। এই সুদীর্ঘ

যাত্রাপথে ব্যথা বেদনা যেমন পেয়েছি তেমনি আমন্দের সঞ্চয়ও কিছু তুলে রেখেছি মনের মণি-কোঠায়। এই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন ২১ জন মহিলা নিয়ে মোট ৪৭ জন, এবং খরচ জনপ্রতি পড়ে ৩৭৫৲ টাকা।

পঞ্চম ভ্রমণ **বাসযোগে, কামারপুকুর—জয়রামবাটী ॥** শ্রীশম্ভুনাথ মুন্সী ও ডাঃ নিরঞ্জন বসু

আমাদের ভ্রমণের মধ্যে এই ভ্রমণটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। বহু ব্যক্তি ঐ তারিখের আগে থাকতেই অফিসে অনুসন্ধান করতে আসেন যে, এ বছরেও ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা। আকর্ষণের প্রধান কারণ যুগপৎ ভ্রমণ ও পুণ্যার্জন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার জন্মস্থান এবং পথে ৺তারকনাথ দর্শনের সুযোগ সাধারণতঃ মেলে না— তাই আমাদের যাত্রীদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা (২৮) পুরুষের (১২) চেয়ে বেশী।

২৬শে জানুয়ারী সকাল ন'টায় যাত্রা সুরু করে প্রথমে তারকেশ্বরে পৌছলাম। অসম্ভব ভীড় —সুতরাং লাইনে দাঁড়িয়ে পূজা দিতে গেলে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরা সম্ভব নয়। কিন্তু তারই ফাঁকে যখন কয়েকজন মহিলাকে পূজা ও দর্শনের পুণ্য অর্জন করে ফিরে আসতে দেখা গেল তখন সত্যিই অবাক হলাম। এখানেই যে যার খাওয়া সেরে নিলেন। আমাদের চার্জ ছিল খাওয়া বাদে সভ্যদের ১০৲। —তারপর জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম বেলা দেড়টায় পথে হরিণখোলার ভাসমান কাঠের পুল। আজও কংক্রীটের ব্রীজ তৈরী শেষ হল না। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকল মহলেই স্বীকৃত, তবুও পুলের সামান্য বাকী সংযোগটুকু সম্পূর্ণ করতে মাসের পর মাস যেতে যেতে বছরও পেরিয়ে যায়—ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে! জয়রামবাটী পৌছালাম সাড়ে তিনটে নাগাদ, শুনলাম বিকেল চারটেয় মন্দির খুলবে। —অগত্যা আশেপাশের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখে বেড়াতে লাগলাম। শ্রীমার নিত্যপদসেবায় ধন্য পুস্করিণী আজ শ্রীহীন। যে দেবীর পদতলের মৃত্তিকা সেবনে শ্রীমা কঠিন রক্ত অতিসার রোগমুক্ত হন। সেই জাগ্রতা দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তি দর্শন করে ধন্য হলাম—অপরূপ মূর্তি। ইতিমধ্যে শ্রীমার মন্দির খুলে গেছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীমার বিভিন্ন সময়ের দুষ্প্রাপ্য ফটো একসাথে বাঁধান দেখলাম—এটিও বিশেষ আকর্ষণীয়। তারপর শ্রীমার বাড়ী ইত্যাদি দর্শনান্তে চা পান শেষ করে কামারপুকুর যাত্রা করলাম সওয়া পাঁচটায়।

কামারপুকুরের মন্দিরটি বড়ই মনোরম—প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ফুলের অপরূপ শোভা—ওরকম গাঁদা

ফুল সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। পরমপুরুষের ব্যবহৃত সংরক্ষিত দ্রব্য সকল, তাঁর নিজ হস্তে রোপিত আমগাছ প্রভৃতি দর্শন হল। অনেকে পুণ্যার্জনের জন্য এখানে এক রাত্রি বা তিন রাত্রি বাস করেন এবং তার ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের সাথে পূর্বে পত্রালাপে স্থির করে নিতে হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগল। ফেরার পথে পাড়ি দিলাম—উত্তরপাড়ায় পৌঁছলাম রাত সাড়ে ন'টায়।

ষষ্ঠ ভ্রমণ : **নেপাল** ॥ —সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বছরের সর্ব্বশেষ ভ্রমণ, নেপাল — ট্রেনযোগে। ১৮ই মার্চ্চ রাত ন'টা পঞ্চাশ মিনিটে মিথিলা এক্সপ্রেসে সমস্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করি এবং ঠিক সময়েই সমস্তিপুর পৌঁছাই; এরপর দু'বার গাড়ী বদল করে যথাক্রমে দ্বারভাঙ্গা ও রক্সৌল-এ আসি। রক্সৌলে দেড় ঘণ্টা দেরীতে পৌঁছানোর জন্য সে রাত্রে আমরা রক্সৌল রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে থাকার ব্যবস্থা করি কিন্তু বিলম্ব হেতু সে রাতে আমরা সকলেই একরকম উপবাসে কাটাই। —২০শে মার্চ্চ সকালে আমরা বীরগঞ্জের ল্যাণ্ড কাস্টমসের অফিসে আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করিয়ে নেপালের মধ্যে প্রবেশ করি। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী 'সাহা ট্রান্সপোর্টে'র বাসে সকাল ন'টায় বীরগঞ্জ থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর দিকে রওনা হই। পথিমধ্যে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করি ও বেলা তিনটে নাগাদ দামানে আসি। এখানকার টাওয়ার দেখার জন্য অনেকে যান কিন্তু বাস চালকের 'বাদল্ ছ' অর্থাৎ মেঘ করেছে বলায় অনেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন এবং অনেকে তাঁদের বাইনোকুলার খুলে টাওয়ার থেকে দূরের পাহাড় দেখার ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে ফিরে আসেন।

২০শে মার্চেই সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা নাগাদ পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী কাঠমাণ্ডু শহরের নিউ সেণ্ট্রাল লজে এসে পৌঁছাই। —পরদিন অর্থাৎ ২১শে মার্চ্চ সকালে আমরা স্কুটার ট্যাক্সিযোগে শ্রীশ্রীপশুপতি নাথ ও শ্রীশ্রীগুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির দর্শনে রওনা হই। সকলের পূজাপাঠ ও দর্শন সারতে দু'তিন ঘণ্টা সময় যায় এবং বেলা বারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে আসি। এদিন মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করি স্থানীয় মারোয়াড়ী হোটেলে। ঐদিনই সভ্যদের অনুরোধে আমরা শ্রীশ্রী৺দক্ষিণাকালী দেখতে যাই। পথে গাড়ীর গোলমালে আমাদের কিছুটা পথ হেঁটে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। সোনা দিয়ে মোড়া শ্রীশ্রী৺মায়ের মূর্ত্তি ঠিক আমাদের সচরাচর দেখা শ্রীশ্রী৺কালী মূর্ত্তির মতো বলে মনে হয় না। তা' ছাড়া পাশাপাশি গণেশ ইত্যাদির মূর্ত্তিও আছে। আমাদের অনেকে এখানে পূজো

দিলেন। এখানে পাণ্ডার কোনও বালাই নেই। এখানে মহিষ, ছাগল, মুরগী ও মুরগীর ডিম বলি হয়।

২২শে মার্চ্চ আমরা একটি স্টেশন-ওয়াগন ভাড়া করে নেপালের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে বেরোলাম। প্রথমে পাটান (ললিতপুর) ও স্বয়ম্ভুনাথ দর্শনান্তে একটি সুন্দর উদ্যানে বসে আমরা খাওয়ার পর্ব্ব সমাধা করি এরপর আবার আমরা বুঢ়া নীলকণ্ঠ, ভাতগাঁও (ভক্তপুর), বিমানঘাঁটি ও বোধনাথ স্তুপ দেখা শেষ করে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে আসি। দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে ভক্তপুরে (Centre of Devotees) মল্লরাজাদের অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন দেখি। পাটান অর্থাৎ ললিতপুর (City of Beauty) আরও পুরাতন শহর। এখানকার নিদর্শনগুলি যত্নের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে।

সংস্থা-নির্দ্ধারিত ভ্রমণসূচী শেষ করে ২৩শে মার্চ্চ আমরা সূর্যোদয় দেখতে নাগরকোট যাই। রাত তিনটের সময় সাজ-সাজ রব পড়ে যায় সদস্যদের মধ্যে এবং অনেকে এর মধ্যে আবার স্নান পর্বও সেরে নেন। যথা সময়ে গাড়ী এসে হর্ণ দিয়ে আমাদের আরও দ্রুত প্রস্তুতির ইসারা দেয়। —ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে নাগরকোট পৌঁছাই কিন্তু ওখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকায় অনেকে গাড়ীর মধ্যে বসে বসেই সূর্যোদয় দেখার আনন্দ উপভোগ করেন। আমরা নাকি চিরকাল বিদেশী ট্যুরিষ্টস্ বা ভ্রমণকারীদের থেকে পিছিয়ে আছি! কিন্তু এবার বোধহয় তার ব্যতিক্রম হল! —কয়েকটি সখের ভ্রমণকারী এসেছিলেন ইতালী থেকে, তাঁরা ত' ঠাণ্ডা হাওয়ার ভয়ে আর এগোলেন না। কিন্তু আমাদের দলের পাঁচ-ছ'জন অনায়াসে সব থেকে উঁচু চূড়ায় উঠে সূর্যোদয় দেখলেন। এরপর আমরা প্রাতঃরাশ সেরে বেলা দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। আমাদের নির্দ্দিষ্ট দিনের রিজার্ভেশন না পাওয়ায় ফিরতি রিজার্ভেশন একদিন আগে করতে হয়েছিল। অর্থাৎ ২৫শের বদলে ২৪শে মার্চ্চ, আমরা সাতজন কলকাতায় ফিরলাম, বাকী চার জন মজঃফরপুর ঘুরে একদিন পরে ফিরলেন। এই ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীরা সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হন। এই ভ্রমণে চারজন মহিলা সহ মোট এগারো জন অংশগ্রহণ করেন।

দশ বছরে **যাত্রীর** পদচারণা

অঞ্চল / রাজ্য	সংখ্যা	লেখক
অন্ধ্র প্রদেশ		
তিরুপতি	চতুর্থ	কার্ত্তিক পাঠক
আসাম		
গণ্ডারের দেশ কাজিরাঙ্গা	ষষ্ঠ	দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়
জয়ন্তীর গুহামন্দির ও গারোপাহাড়	অষ্টম	কমলা মুখার্জী
কামরূপ কামাখ্যার দেশে	দশম	দেবু লাহিড়ী
আন্দামান		
আজকের আন্দামান	তৃতীয়	সরোজ গুহরায়
আমেরিকা		
চিঠির মাধ্যমে	অষ্টম	জনৈক বিদেশী
ইতালী		
দেশে দেশে চলি ভেসে	দশম	বিভাস মিত্র
উত্তর প্রদেশ		
গোমুখী গঙ্গা	প্রথম	পরাশর
লাহুল উপত্যকা	,,	হিমাংশু ভট্টাচার্য
কুমায়ুনের তিনটি হ্রদ	দ্বিতীয়	বীরেন সরকার
বিন্ধ্যাচল	,,	অসিতবরণ ভট্টাচার্য
রূপকুণ্ডের পথে	তৃতীয়	সুজল কুমার মুখোপাধ্যায়
গঙ্গার উৎসমুখ	,,	কমলা মুখার্জী
কুমায়ুনে কয়েক দিন	পঞ্চম	কার্ত্তিক পাঠক
জাহ্নবী যমুনার তটে তটে	ষষ্ঠ	প্রণব চৌধুরী
শেষ সংগ্রাম (মানা অভিযান)	,,	প্রাণেশ চক্রবর্তী
যে পথে সকলেই গেছে (কেদার-বদরী)	,,	মনোমোহন ঘোষ
তুষার ঝঞ্ঝা (কেদার পর্বত)	সপ্তম	সুজল মুখোপাধ্যায়
পিণ্ডারী অঞ্চলে কাফ্‌নি হিমবাহ	,,	নিতাই রায়
হিমতীর্থ (বসুধারা)	,,	অতীশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভয়াল ! সুন্দর !! পিণ্ডারী	,,	অমিয় কুমার হাটি

অঞ্চল / রাজ্য	সংখ্যা	লেখক
রোন্টি অভিযান	সপ্তম	সুজয়া গুহ
মানব তীর্থ রূপকুণ্ড	অষ্টম	দিলীপ মুখোপাধ্যায়
নন্দাদেবী ১৯৫১	,,	সুজল মুখোপাধ্যায়
সাঙ্‌টাঙ্‌ শৃঙ্গ ২১,৭৫০´	,,	নিতাই রায়
নন্দন বনে তুষার ঝড় (কালিন্দী খাল)	,,	অমিয় কুমার হাটি
কুমায়ূনের হিমবাহ	নবম	মনোমোহন ঘোষ
শিবলিঙ্গের কোলে	দশম	সুজয়া গুহ
ডুন্দিয়াঢণ্ডে বৃষ্টির কারাগারে	নবম	অমিয় কুমার হাটি
উড়িষ্যা		
পাষাণ কবিতা কোনারক	তৃতীয়	পরাশর
উড়িষ্যার ডায়েরি	পঞ্চম	দিলীপ মুখোপাধ্যায়
মোটর সাইকেলে পুরী	দশম	সনৎ কুমার ঘোষ
কাশ্মীর		
আজকের কাশ্মীর	প্রথম	সুনীল সরকার
অসময়ে অমরনাথ	নবম	নিতাই রায়
কোলহাই হিমবাহের পথে	দশম	দিলীপ মুখোপাধ্যায়
গোয়া		
গোয়া দেখে এলাম	সপ্তম	বিমল কুমার মিত্র
তামিলনাড়ু		
তীর্থভূমি ত্রিচিনাপল্লী	তৃতীয়	অনিল কুমার ঘোষাল
দাক্ষিণাত্যে এক পক্ষ	চতুর্থ	রণেন গুহ
নেপাল		
নেপাল যাত্রীর ডায়েরি	চতুর্থ	পরাশর
অজ্ঞাত নেপাল	পঞ্চম	কমলা মুখার্জী
ত্রিশূলী গণ্ডকীর উৎস গোসাইকুণ্ড	অষ্টম	কমলা মুখার্জী
পাঞ্জাব		
বিপাসার তীরে	দ্বিতীয়	পরাশর
পশ্চিমবঙ্গ		
রাঙামাটির দেশ	প্রথম	মনোমোহন ঘোষ
ফিরে দাও সে অরণ্য	,,	কুমারেশ ঘোষ
বাসা ছেড়ে বাসে	দ্বিতীয়	কুমারেশ ঘোষ

অঞ্চল / রাজ্য	সংখ্যা	লেখক
দুয়ার হইতে দুই পা ফেলিয়া	তৃতীয়	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সপ্তগ্রাম	চতুর্থ	প্রভাস চন্দ্র পাল
গঙ্গাযাত্রা	,,	কুমারেশ ঘোষ
শুশুনিয়ায় শৈলারোহন শিক্ষা	,,	শঙ্কু মহারাজ
পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী	,,	বলরাম দাস
হারিয়ে যাওয়া জনপদ	,,	মনোমোহন ঘোষ
গৌড় মালদা	পঞ্চম	অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবন	,,	প্রশান্ত চৌধুরী
গড়মান্দারণ ও জয়রামবাটি	,,	শঙ্কু মহারাজ
মায়াপুর	,,	হিরন্ময় ভাদুড়ী
শৈলনগরী দার্জিলিং	সপ্তম	সমীর কুমার বসু
মুর্শিদাবাদ, তারাপীঠ ও বক্রেশ্বর	অষ্টম	প্রদীপ্ত দেব
পর্বতারোহণে বাংলাদেশ	,,	প্রাণেশ চক্রবর্তী
সন্দকফ্ ও ফালুট	নবম	শিবনাথ পাঁজী
ইডেন থেকে জম্বু	,,	প্রাণেশ চক্রবর্তী
জয়দেব কেঁদুলি	দশম	নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়
হিমালয়ের মিছিল	,,	অমিয় কুমার হাটি
ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে	,,	হিরন্ময় ভাদুড়ী
পঃ পাকিস্তান		
কাশ্মীর থেকে খাইবার	চতুর্থ	অমল মুখোপাধ্যায়
বিহার		
অতীতের সাক্ষী	দ্বিতীয়	মনোমোহন ঘোষ
রাজরাপ্পা (হাজারিবাগ)	,,	সুনীল সরকার
রাজগীর নালন্দা	তৃতীয়	রণেন গুহ
পথ বড় না পথিক বড়	ষষ্ঠ	অমিয় কুমার হাটি
ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ	দশম	দ্বৈপায়ন
মধ্যপ্রদেশ		
খাজুরাহো	তৃতীয়	কার্ত্তিক পাঠক
শিল্পতীর্থ	চতুর্থ	কমলা মুখার্জী
চলুন পাঁচমারী পাহাড়ে	সপ্তম	কুমার মুখোপাধ্যায়

Gram :WULFCRANE, CALCUTTA. PHONE : 45-0069 & 45-3637

WULFRUNA ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED

Structural, Mechanical & Crane Engineers.

P12/1 (Part of No. 1) Taratalla Road, Calcutta-53.

(MEMBER INDIAN ENGINEERING ASSOCIATION CALCUTTA)

MAIN PRODUCTS OF MANUFACTURE

GROUP—A : Light, Medium and Heavy Mild Steel Structurals, like Ducts, Chutes, Hoppers, Panels, Coal Bunkers, Boiler Column, Supporting Structurals and Big Chimneys of 120ft Ht x 15ft Dia.

GROUP—B : Light, Medium and Heavy Pressure Vessels, Air Receivers, Storage Tanks, Coolers, Condensers, Chemicals and Pharmaceutical Equipments and Stainless Steel Fabrication.

GROUP—C : Different types of Material Handling Equipments and Cranes, like H.O.T. Cranes, E.O.T. Cranes and Semi—E.O.T. Cranes upto 20 Tons capacity, Jib Cranes upto 5 Tons Capacity and Goliath Cranes upto 20 Tons Capacity.

GROUP—D : IMPORT SUBSTITUTIONS—
Boiler Stokers, such as Dump Grate Stokers, Chain Stokers, Carrier Bar Stokers for different capacities, Collector Plates for Electrostatic Precipitators

GROUP—E : Erection and Civil Engineering Jobs

GROUP—F : NEW DEVELOPMENT ITEMS—
Small Diesel Engine/Petrol Engine Operated Mobile Cranes Centrifuge or Hydro Extractors, High Pressure Pumps, Portable Shearing Machines, Fork Lifts upto 2 Tons Capacity and Class II Duty Electric Hoists of 1, 2, 3, 5, 7½ and 10 Tons Capacities

দেশবাসীর জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধ তৈরি করা
—৩৭ বছর ধরে এই আমাদের লক্ষ্য
দেশের সামাজিক লক্ষ্য পূরণে এই আমাদের প্রাথমিক কাজ। আমাদের জন্ম যে শুধু ভারতে, তাই নয়, মনে-প্রাণেও আমরা ষোল আনা ভারতীয়।
অসুখ-বিসুখ ঠেকিয়ে দেশবাসী যাতে নিরোগ জীবনযাপন করতে পারেন, সেজন্যে আমরা বানিয়ে চলেছি নানা ধরনের ওষুধ। আর নিত্যনতুন গবেষণার মাধ্যমে সমানে করে চলেছি রোগ নিরাময়ের কাজ।
আজ আমরা অনেক রকমের ওষুধ, ইঞ্জেকসন আর রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুতকারক। আমাদের প্রচেষ্টা যে বিফলে যায়নি, গত সাঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের শ্রীবৃদ্ধির খতিয়ান দেখলেই তা বোঝা যাবে। নিজের দেশবাসীর জন্যে কিছু করতে পারা -এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে।
ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস
কাজ করে চলেছে
আপনার জন্যে
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

SARLA ENGINEERING WORKS

101/C, BRINDABAN MALLICK LANE,

HOWRAH-4

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

[১৮৬০ সালে সমিতি আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ]

৯১ ডি, জয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

উত্তরপাড়া, হুগলী।

●

১৯৭৩–৭৪
সালের
কার্য্যকরী
সমিতি

●

☐ সভাপতি :
শ্রীশম্ভুনাথ মুন্সী

☐ সহঃ সভাপতিদ্বয় :
ডাঃ নিরঞ্জন বসু
শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়

☐ সম্পাদক :
শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায়

☐ সহঃ সম্পাদক :
শ্রীপ্রসূন দেব

☐ কোষাধ্যক্ষ :
শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

☐ সহঃ কোষাধ্যক্ষ :
শ্রীশিবনাথ পাঁজা

☐ সদস্যবৃন্দ :

শ্রীঅনিল কুমার ঘোষাল

শ্রীদেবদাস লাহিড়ী

শ্রীদেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅজয় চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদেব কুমার দত্ত

শ্রীলাল গোপাল চক্রবর্ত্তী

We are Grateful to you- our kind Patrons!

Aukhoy Coomar Laha
Bally Jute Co. Ltd.
Bosmit
Benimadhab Tah & Sons (P) Ltd.
Bengal Transport Service
B. K. Agarwala & Co.
Calcutta Mettallizing Co.
Craftswell Agency
Cottage & Small Scale Industries (Handloom) Govt. of W. B.
Duncan Brothers & Co. Ltd.
Das Medical Stores
Esarbi Enterprises
Finlay Insulations
Fabin (India)
G. D. Pharmaceuticals (P) Ltd.
Industrial Minerals & Mill Stores Traders
J. M. Enterprises.
K. Manibhai & Co.
Light Corner
M. M. G. Corporation
Maharaja Bakery & Confectionery
Madhu Jayanti Private Ltd.
Nandikeshwari Iron Faundry (P) Ltd.
N. G. T. Engineering (P) Ltd.
P. S. Raval & Associates.
Rampratap Brijmohan
Ray-Mec
Sarla Engineering Works
Sarda Industries (P) Ltd.
Shree Jhawar & Co.
Steelways
Stores & Timber Trading Co.
S. N. Roy & Sons
Shaw Wallace & Co, Ltd.
Social Welfare (Govt of West Bengal)
Technofabs
Transport Wing of India
Tourist Bureau (Govt. of West Bengal)
United Vegetable Manufactures Ltd.
Unique Metal Industries (P) Ltd.
United Commercial Bank
Wulfruna Engineering Co. (P) Ltd.

★ 'যাত্রী'তে প্রকাশিত রচনাসম্ভার লেখক-লেখিকা বৃন্দের নিজস্ব মতামত। এ বিষয়ে স্বভাবতঃই সমিতির কোন দায়িত্ব নেই।

লিখন করেছি চয়ন

লিখন করেছি চয়ন

॥ আমাদের সমিতির লক্ষ্য ॥

★ ভারতের যে কোনও প্রান্তে পর্যটন ও অভিযানকে সংগঠিত করা এবং উৎসাহ দেওয়া—

★ সমিতির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্যদের মধ্যে পর্যটন সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা—

★ পর্যটন সম্বন্ধে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং সভা ও সম্মেলন আহ্বান করা--

★ সদস্যবৃন্দ, শুভাকাঙ্খী ও জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ভাব-বিনিময় ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা—

★ পর্যটনে উৎসাহদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প ব্যয়ের পর্যটক নিবাস নির্মাণের প্রচেষ্টা—

★ ভারতে পর্যটন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ অধ্যয়ন ও মত বিনিময় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুশীলন করা, এ কাজে পর্যটক, বিভিন্ন ভ্রমন-রসিক ও সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা—

★ সমিতির সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন করা—

★ দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থাপনা এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা—
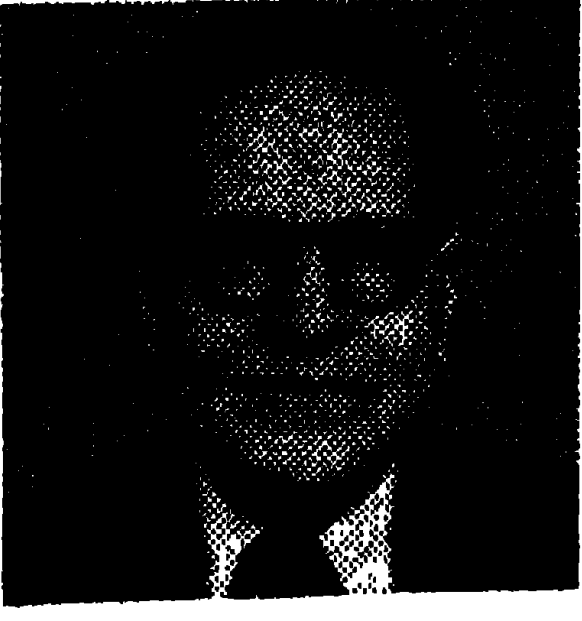
স্মরণে

আমরা দুঃখের সংগে জানাই যে আমাদের সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-দের অন্যতম ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি সন্তোষ কুমার নাগ চৌধুরী গত ১৯ শে নভেম্বর ১৯৭৩এ পরলোকগমণ করেছেন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি-প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে, এক শুভলগ্নে জন্ম নিয়েছিল ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্বল্প ব্যয়ে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের ভ্রমণের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে।

এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তার সেই লক্ষ্য ছিল স্থির প্রত্যয়, বরং আজ নানা অভিজ্ঞতায় এক বাস্তব বোধ নিয়ে, সে এসে দাঁড়িয়েছে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে।

গত বছরেও তার জন্মলগ্ন পূর্ত্তি হিসাবে কপালে এঁকে দিয়েছিলাম শ্বেত চন্দনের তিলক— কামনা করেছিলাম তার শততম আয়ু। আজ বর্ষান্তের এই পরমলগ্নে তাকে আবার নতুন করে অভিষেক করি—আয়ুষ্মান হোক সে।

কালের ক্লান্তিহীন প্রবাহের মধ্যে, একটি বছর বস্তুত সামান্য একটা বুদ্‌বুদ্-তবুও আমাদের মন, বৎসর বলে অভিহিত, এই খণ্ডকালের কাছে আশা করে প্রসন্নতা, প্রশান্তি আর প্রতিশ্রুতির।

গৃহ নির্মানের যে প্রতিশ্রুতি আমরা দীর্ঘদিন ধরে দিয়েছিলাম, আমাদের স্বপ্ন ছিল নিজস্ব সমিতি ভবন-যার শুভ সূচনা হ'য়েছিল ১৯৭২ সালের জুন মাসে জমি ক্রয়ের মাধ্যমে, ভিত্তি স্থাপন হ'য়েছিল ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, আজ আমরা আনন্দিত যে, সে স্বপ্ন আজ সার্থক, বাস্তবে রূপায়িত।

৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৭৩, সেই শুভদিন যে দিন আমাদের নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচনা হ'য়েছিল—সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু মহাশয় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদীপ জ্বালিয়ে দ্বার খুলে দিয়েছিলেন— কামনা করেছিলেন পুত পাবকের এই শিখা যেন অনির্ব্বাণ থাকে—থাকে অচঞ্চল।

উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ—ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রসূত অনেক কথা পরিবেশন করেছিলেন-আমাদের ভ্রমণ পথিকদের ভ্রমণে আরও উৎসাহিত করেছিলেন। আয়োজন ছিল সাংস্কৃতিক আসর আর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর। উৎসব শেষ হয় ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪এ সমিতির সভ্যদের বাৎসরিক বনভোজনের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গতঃ জানাই যে আমাদের সমিতি ভবন পরিদর্শন করেন হিমালয় পরিব্রাজক শ্রীউমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-শুভ কামনা আর আশীষ জানান।

ভ্রমণের জন্য চাই বিশেষ এক মানসিক প্রস্তুতি, যার অভাবে ভ্রমণে পাওয়া যায় না আনন্দ—আনে না প্রশান্তি—প্রসন্নতা। এর জন্য চাই সেই বিষয়ে বৈরাগী মন—ভ্রমণে যাঁরা থাকা খাওয়া তুচ্ছ জ্ঞান করবেন। সেই বিবাগী মন নিয়ে যাঁরা আমাদের নির্দ্ধারিত ভ্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ছিল আন্তরিক সহানুভূতি—তার প্রমাণ হিমালয়ের সেই উত্তরখণ্ডের কেদার বদরী ভ্রমণ সহ আরও চারটি ভ্রমণ—সবকয়টি সার্থকতায় ভরা—বিশদ বিবরণ যার রয়েছে এই পত্রিকায়।

এবারেও "যাত্রী" স্বল্প কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখক ছাড়া, তাদেরই রচনা প্রকাশ করেছে, যাঁরা সাহিত্যিক নন—কিন্তু রচনাগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা আর অনুরাগে রাঙানো। আজ অভিনন্দিত করি আমাদের শুভানুধ্যায়ী সব সভ্যদের, আহ্বান করি তাঁদের অকৃপণ সহযোগিতা। বর্ত্তমান বৎসর পরিক্রমায় তাঁদের মুক্ত হস্ত যেন প্রসারিত থাকে প্রতিটি কল্যানের মাঝে—আবার প্রতিটি অনটনের মাঝে। কামনা করি তাঁদের প্রীতি আর শুভেচ্ছা—আমাদের যাত্রা যেন চলমান থাকে, গতি থাকে আবেগ চঞ্চল—বিরাম, ক্লান্তি আর ক্ষান্তিহীন।

—ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্‌ এ্যাসোসিয়েশন—

।। ১৯৭৩–'৭৪ সালের কর্মপরিষদের সদস্যবৃন্দ ।।

বাঁদিক থেকে বসে—সর্বশ্রী সমরেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), কুমার মুখোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি), শম্ভুনাথ মুন্সী (সভাপতি), নিরঞ্জন বোস (সহঃ সভাপতি), প্রসুন দেব (সহঃ সম্পাদক) স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ)।

বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—সর্বশ্রী দেবদাস লাহিড়ী, অনিল ঘোষাল, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার দত্ত, দেবকুমার বন্দোপাধ্যায়, লাল গোপাল চক্রবর্ত্তী, অজয় চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ পাঁজী (সহঃ কোষাধ্যক্ষ)

চণ্ডীগড় থেকে কাজা

সুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডীগড় যখন এসে পৌঁছুই তখন চারদিকের জমাট আঁধার ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। পূবের আকাশে ভোরের স্পর্শ-প্রভাতী সুরে পাখীর কুজন শুরু হয়েছে।

চণ্ডীগড় একটি সুপরিকল্পিত নতুন শহর। সর্দার প্রতাপ সিং কৈরণের মানস কন্যা এই চণ্ডীগড়, আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন। ছবির মতন সবই সাজানো। পৌরসভার নিয়ম অনুযায়ী বাড়িগুলি তৈরী। আপন ইচ্ছা বা পছন্দমত কোন বাড়ি এ শহরে তৈরী হয় না। মোট ২৩টি সেক্টরে চণ্ডীগড় বিভক্ত। ১৩ সংখ্যা অশুভ, তাই এ নম্বরে কোন সেক্টর নেই। এখানকার সরকারী কার্য্যালয় ভবন, পঞ্চায়েত ভবন, রাজ্যপালদের (পাঞ্জাব ও হরিয়ানা) ভবন, রবীন্দ্রভবন, গোলাপবাগান ইত্যাদি দর্শনীয়। গোলাপের বাগানটি এশিয়ার মধ্যে অন্যতম। ১৭ আর ২২ নম্বর সেক্টরের বাজার দুটি প্রত্যেক চণ্ডীগডবাসীর কাছেই আকর্ষনীয়।

চণ্ডীগড় থেকে বেলা প্রায় ১টার সময় রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৭টার সময় মাণ্ডি পৌঁছুই। মাণ্ডি একটি ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। এখানকার সরকারী ট্যুরিষ্ট লজ প্রায় সবসময়েই ভর্ত্তি থাকে, আসার আগে রিজার্ভ করে আসাই বাঞ্ছনীয়। বাজারে অনেকগুলি হোটেল আছে –ভাড়াও বেশ কম। সেখানেও বহু যাত্রীর সমাগম দেখলাম। চণ্ডীগড় থেকে মাণ্ডির দূরত্ব ১৩৫ মাইল, রাস্তাও বেশ ভাল। মাণ্ডি বাজারেই বাস ষ্টেশন। হিমাচল প্রদেশের সবদিকের বাস মাণ্ডি থেকে যাতায়াত করে। সেইজন্য যাত্রীর ভিড় প্রায় সবসময়েই। মাণ্ডির দর্শনীয় স্থান কালীমন্দিরটি।

একরাত্রি মাণ্ডিতে কাটিয়ে পরদিন সকালে মানালীর উদ্দেশ্যে সকাল ৮টায় রওনা হলাম, ৬৮ মাইল পথ। পথে দু' তিন জায়গায় ধ্বস নেমেছে, বুলডোজার দিয়ে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। দু'দিকের সমস্ত বাস যাত্রী নিয়ে ধ্বসের দু'দিকে অপেক্ষা করছে। পথ যাতায়াতের উপযোগী হলেই আবার চলা শুরু হবে। আমার নিজস্ব জীপ থাকায়, পথ তৈরী হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পার হয়ে যাবার অনুমতি পাই।

কুলুভ্যালিতে প্রবেশ করার সঙ্গেই চোখে পড়ে অসংখ্য আপেলের বাগান, অগণিত আপেল ঝুলে রয়েছে প্রতিটি গাছে।

এবার আমার কর্মকেন্দ্র স্পিটি। লাহুল ও স্পিটি জেলা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। লাহুল ও স্পিটি যাবার একমাত্র পথ রোটাং পাস—উচ্চতা প্রায় ১৩৫০০ ফুট। পাঁচ মাস ঐ রাস্তা প্রচণ্ড

বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। মে থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত ঐ পথে যাত্রী চলাচল করে। এখন মানালী থেকে কেলাং পর্য্যন্ত বাস যাতায়াত করে। আমার এই ভ্রমণ ১৯৬৯ সালের ২৮শে আগষ্ট শুরু হয় চণ্ডীগড় থেকে, সে সময় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অধীনে রোটাং গিরিবর্ত্ম। মোটরে যেতে হ'লে সামরিক বাহিনী থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হতো।

গত বছর এই পথে কেলাং গিয়েছিলাম, লাহুলীদের জীবনীচিত্র করার জন্য। সে সময় রোটাং শীর্ষে পৌছতে প্রায় আট ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সে বারেও জীপে ভ্রমণ করি। এবারে লাগলো মাত্র আড়াই ঘণ্টা, পথ মাত্র ৪৩ কি: মি:। আগের তুলনায় পথ অনেক উন্নত।

রোটাং শীর্ষের কিছু নিচে প্রায় ১২০০০ ফুটে, মাড়ী নামক জায়গায় কয়েকটি চায়ের দোকান আছে। নেপালীরা এই দোকানগুলির মালিক। পথশ্রান্ত পথিকের কাছে এই দোকানগুলি যেন অপরিহার্য্য। এই সব দোকানে পরিশ্রান্ত যাত্রীরা বিশ্রাম নেয়, কিছু খেয়ে নিয়ে আবার শুরু করে পথ চলা। রোটাংএর তুষারঝঞ্ঝা অতি ভয়ঙ্কর এবং কুখ্যাত। তুষার ঝঞ্ঝার সময় মাড়ীর কাছাকাছি যে সব যাত্রী থাকে তারা ছুটে আসে এই সব চায়ের দোকানগুলিতে আশ্রয়ের আশায়।

প্রচণ্ড শীত আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া রোটাংএর বৈশিষ্ট্য—লোকে বলে খুনে হাওয়া। রোটাং অর্থে মৃতদেহের স্তূপ। বহু ভারবাহী পশু ও মানুষ রোটাংএর অনিশ্চিত আবহাওয়ায় পড়ে প্রাণ হারায়।

রোটাং শীর্ষের আশে পাশে বিরাট আকারের হিমবাহ পড়ে আছে। অনেক সময় এই বিরাট হিমবাহগুলি সরে এসে রোটাংএর পথকে সম্পূর্ণ অবরোধ করে দেয়। সামরিক বাহিনীর একটি দল কুলি মজুরসহ সব সময়ে তৈরী থাকে, পথকে আবার চলাচলের উপযোগী করার জন্য।

রোটাং শীর্ষ থেকে কোকসার আসতে সময় লাগলো প্রায় দু ঘণ্টা, দূরত্ব মাত্র ৪৫ কি: মি:। সমস্ত পথটাই উৎরাই পথ এবং কাঁচা রাস্তা, পথে প্রচণ্ড ধূলো। কারণ এদিকে বৃষ্টি একেবারেই হয় না বলা চলে। যে মেঘ বৃষ্টি দেয়, সে মেঘ রোটাং পেরিয়ে এপারে আসতে পারে না। রোটাংএর শীর্ষে এবং দক্ষিণে যতো বৃষ্টি। রোটাংএর উত্তরে লাহুল ও স্পিটি জেলায় ঠিক তার বিপরীত—শুষ্ক, রুক্ষ ও বর্ষা বিরল।

কোকসারকে লাহুল ও স্পিটির জংশন ষ্টেশন বলা যায়। কোকসার থেকে একটি পথ গেছে কেলাং (লাহুল) এর দিকে ও একটি পথ গেছে কাজার (স্পিটির) দিকে। কোকসার থেকে কেলাংএর দূরত্ব ৫০ কি: মি: এবং কাজার দূরত্ব ১৪৫ কি: মি:। বর্তমানে হিমাচল সরকার দুই দিকেই মিনি-বাস চালু করেছেন।

লাহুল ও স্পিটিতে যারা গাড়ী নিয়ে আসে, তারা পেট্রলের ব্যবস্থা করে আসে। সারা লাহুল ও স্পিটিতে পয়সা দিয়ে এক ফোঁটাও পেট্রল পাওয়া যায় না। মাণ্ডি কুলু রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেসন

যে মিনিবাস চালু করেছে তার অফিস এবং পেট্রল সরবরাহ কেন্দ্র কোকসারে। এই অফিস জুন থেকে অক্টোবর—মাত্র পাঁচ মাস চালু থাকে, সময়মতো পেট্রল না এসে পৌঁছলে ঐ মিনিবাস বন্ধ থাকে। পেট্রল আসে কুলু থেকে গাধার পিঠে। প্রত্যেক গাধার পিঠে ৪টি করে জেরিক্যান বেঁধে দেওয়া হয়। প্রত্যেক জেরিক্যানে ২০ লিটার করে পেট্রল থাকে। কুলু থেকে রোটাং পাস অতিক্রম করে কোকসার পৌঁছুতে ভারবাহী গাধার সময় লাগে ৫ দিন।

৩১শে আগস্ট কোকসার থেকে স্পিটির প্রধান কার্যালয় কাজার উদ্দেশ্যে রওনা হই। চন্দ্রনদীর কুল ধরেই পথ। বেলা প্রায় ৪টার সময় ছোটাদারায় পৌঁছুই। ছোটাদারা পি, ডবলু, ডির একটি ক্যাম্পিং ষ্টেশন—কোন জনবসতি নেই। সুন্দর একটি রেষ্ট হাউস আছে। পি. ডবলু. ডির কিছু কুলি, সবাই তিব্বতী, তাঁবু খাটিয়ে থাকে। এখানকার উচ্চতা ১৪০০০ ফুটের কিছু বেশী। অসহনীয় ঠাণ্ডা এখানে।

কোকসার থেকে কুনযাস গিরিবর্ত্ম পর্যান্ত কোন জনবসতি নেই। কোথাও সবুজের স্পর্শ নেই। কেবলমাত্র শুষ্ক, নীরস প্রান্তর। গিরিশ্রেণীর শীর্ষভাগ বরফে ঢাকা। জায়গায় জায়গায় দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিরাট খাদের উপর বরফের সেতু তৈরী হয়ে আছে। গাদ্দিরা তাদের ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে অনায়াসে এই বরফের সেতুর উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। চম্বা থেকে গাদ্দিরা তাদের ভেড়া ছাগল নিয়ে লাহুল ও স্পিটিতে আসে জুন মাসের মাঝামাঝি। এই উচ্চ চারণভূমিতে প্রায় ৩।৪ মাস মেষ পালকেরা চরিয়ে বেড়ায় তাদের ভেড়াছাগল। কুলু, কাংড়া থেকেও মেষ পালকের দল আসে লাহুল ও স্পিটিতে এই একই উদ্দেশ্যে।

চন্দ্রনদীর পাশ ধরে পথ চলে গেছে কুনযাস পাস পর্য্যন্ত। এখানে আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। এর উচ্চতা প্রায় ১৬২০০ ফুট। ১৯৬৮ সালে কুনযাস পাসের মধ্য দিয়ে মটরগাড়ি চলাচলের পথ তৈরী হয়েছে, সারা বিশ্বে এতো উঁচু গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে মটরগাড়ি যাতায়াতের পথ আর কোথাও নেই। মাত্র তিন মাস জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর কুনযাস গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা যায়, বাকি নয় মাস থাকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকেই বরফ জমতে থাকে কুনযাস গিরিবর্ত্মে। অত্যন্ত অনিশ্চিত এখানকার আবহাওয়া। এই নয় মাস সারা স্পিটি উপত্যকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সারা বিশ্ব থেকে।

চন্দ্রনদীকে ছেড়ে কুনযাস পাস অতিক্রম করার পর স্পিটি নদীর কুল ধরে এগুতে থাকি। এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। স্পিটি নদীকে দেখলে মনে হয় সমতলেরই কোন নদী। বিস্তৃত এলাকা নিয়ে ধীর মন্থর গতিতে স্পিটি নদী চলেছে সমতলের দিকে। কোন গর্জন নেই, তাণ্ডব নৃত্য নেই, অশান্ত রূপও নেই।

কুনযাস পাস অতিক্রম করে প্রথমেই নজরে পড়ে এখানকার পাহাড়ে ঘেরা বিস্তৃত ভূখণ্ড। এতো

উচ্চে এমন বিস্তৃত সমতল প্রান্তর আর কোথাও দেখিনি। তবে কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। প্রচণ্ড ধুলো চোখমুখ ভরিয়ে দিয়ে যায়, পাহাড়ী দমকা হাওয়ায়। পাহাড়ী রাস্তার ভয়ঙ্কর রূপ এদিকে কিছুটা বিরল। যদিও এদিক, কুনযাম পাসের অপর দিক থেকে আরও অধিক নীরস, শুষ্ক ও রুক্ষ, তবুও এদিককার একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট আছে আর এটাই স্পিটি উপত্যকার বৈশিষ্ট।

কাজা যাবার পথে প্রথম স্পিটিয়ালি গ্রাম লোসার। স্পিটি নদীর পাশেই গ্রামটি। পর পর আরও কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করার পর রংরিক গ্রামে পৌঁছুই। এই রংরিক পর্য্যন্ত মিনিবাস আসে কোকসার থেকে। পথের দূরত্ব ৯০ মাইল। ভাড়া ২৯ টাকা। রংরিক থেকে কাজার দূরত্ব মাত্র ৩ মাইল। জীপ যাবার পথ নতুন হয়েছে, তবে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। রংরিকে স্পিটি নদীর উপর পুল তৈরী হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হয়েছে। দূরকে আরও কাছে এনেছে।

রংরিকের পুল পার হবার পরই দুইদিকে দুটি রাস্তা চলে গেছে। ডানদিকের রাস্তা গেছে কাজা হয়ে সুমদো পর্য্যন্ত। পায়ে হাঁটা কষ্টসাধ্য, প্রায় ৫৫ মাইল পথ। ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত, এই পথেই কিন্নর জেলার মধ্য দিয়ে সিমলা যাওয়া যায়। বাম দিকের রাস্তাটি গেছে কিব্বর গ্রাম পর্য্যন্ত। প্রায় ১০ মাইল পথ। কিব্বর যাবার পথে পড়ে স্পিটীর বিখ্যাত 'কী' গুম্ফাটী।

প্রায় ১১০০০ হাজার ফুট উচ্চে কাজার অবস্থান খুব সুন্দর। পূর্বদিকের সুউচ্চ এক পাহাড়ের কোলে কাজা গ্রামটী। গ্রামের পরেই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে চাষের ক্ষেত। আরও দূরে স্পিটি নদী, শতদ্রু নদীতে গিয়ে মিশেছে কিন্নর জেলায়। কাজায় মোট ৩৩টী ঘর। অধিবাসীর সংখ্যা ২৫৫। স্পিটি সাব-ডিভিসনে মোট ৫২টী গ্রাম ও অধিবাসীর সংখ্যা কমবেশী ৫৪০০। সবাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

কাজাতে সরকারী রেষ্ট হাউস বা টুরিষ্ট লজ নেই। থাকার খুবই অসুবিধা। প্রথম দশদিন আমাকে একটি তাঁবুতে থাকতে হয়েছিল। পরে স্থানীয় এক অধিবাসীর বাড়িতে আশ্রয় পাই। তাঁবুতে থাকাকালীন হিমশীতল প্রচণ্ড শীতে সারা রাত সবকয়টী শীতবস্ত্র পরে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকেও মনে হতো যেন বরফের উপর শুয়ে আছি। অতো উচ্চে শীতের প্রকোপ ত আছেই, সেইসঙ্গে ছিল সেই খুনে হাওয়া, তুষার শীতল কনকনে বাতাস।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে স্পিটি ভ্যালি এক অপরূপ রূপ নেয়। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর নজরে পড়ে জনমানবশূন্য রুক্ষ প্রান্তর, সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী। সবুজের স্পর্শ কোথাও নেই। তবু ঐ রুক্ষ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে আছে এক অপূর্ব আকর্ষণ। বার বার দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ হয়। পর্ব্বতের প্রতিটী স্তর বিভিন্ন রঙে রঙীন। মনোমুগ্ধকর সে রঙের আভা। সরলোন্নত শিখরে আছে চিরস্থায়ী তুষার। তার পিছনে আছে গভীর নীল আকাশ ও খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের সমাবেশ। সবার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে সে এক অপরূপ পরিবেশ।

বনের যাত্রী

শক্তিপদ রাজগুরু

বেতলা ন্যাশান্যাল পার্কে ক'দিন রয়েছি। সুন্দর বাংলো—ফরেস্টের লোকজনএর ব্যবহারও অমায়িক। গেম ওয়ার্ডেন মিঃ রায়, বিট অফিসার তেওয়ারীজী, সাধারণ কর্মচারীরাও আপন করে নিয়েছেন। সন্ধ্যার পর আড্ডা জমাই এখানে ওখানে। আর জঙ্গলে ঢুকি সকালে বিকালে বা সন্ধ্যায়। অরণ্যের রূপ প্রতি সময়েই স্বতন্ত্র। হাতি বাঘ বাইসন সম্বর হরিণ লিওপার্ড সব রকম জন্তুই আছে, আর দেখা যায় তাদের। কয়েকদিন ধরে এই পালামৌর অঞ্চলের বিভিন্ন ফরেষ্ট বাংলোয় ঘুরছি। বড়ষাউ-সাত-আকাশী প্রভৃতি সীমান্তের দিকের গহণ অরণ্যে যাতায়াত করি। ক্রমশঃ বনের কর্মীদের সঙ্গে ওই হাতি বাঘের জঙ্গলে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত সুরু করলাম। ওরা অবশ্য অনেক বাজিয়ে নিয়ে তবে আমাকে ওইভাবে বনে নিয়ে যেতেন।

ওরা বলেন—আমাদের বিপদ বীর-ট্যুরিষ্টদের নিয়ে। হুট করে আসেন সব জানার ভাণ করে, তাচ্ছিল্য ভরে জঙ্গলে যান. গোল বাঁধান তারাই।

এক সন্ধ্যায় ফরেষ্ট গেটে বসে আড্ডা দিচ্ছি। অনেক যাত্রীই আসেন। হঠাৎ একটা গাড়ি থেকে বারটি তরুন নামল বেশ মেজাজ নিয়ে। ফরেস্ট যাবে, ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে। একজন বলেন স্পট লাইট নিয়ে বনেটের উপর বসে আমরাই স্পট করবো। গাইডের দরকার হবে না।

মিঃ রায় বলেন—কানুন নেই। গাইড নিতেই হবে। আর গাড়ীর বাইরে থাকবেন না কেউ।

অগত্যা গাইড নিলেন। অন্য একটি তরুন আমাকে বনবিভাগের কর্মী মনে করে শুধায়—দু'চারটে বাঘ দেখতে পাবো তো?

অর্থাৎ বাঘ যেন বনে তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্য বসে থাকবেন। বন সম্বন্ধে যাদের এতটুকু ধারণা আছে তাঁরা জানেন বাঘ কত সাবধানী। তাই শুধালাম—এর আগে কোন জঙ্গলে গেছেন? ভদ্রলোক জানান—সুন্দরবনে গেছি। ওখানেই দেখেছি বেশ কয়েকটা।

সুন্দরবনে বাঘ দেখা সেটা ভাগ্যের ব্যাপার, তাই বেশ কয়েকটি বাঘ দেখার কথা শুনে শুধোই—

—কোথায় গেছেন সুন্দরবনে।

—কেন বকখালি ফ্রেজারগঞ্জ।

অবাক হই, ওদিকে বন কোথায়?

ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে যায়, পালামৌএর জঙ্গলে সুন্দরবনের এত খবর কারো জানার কথা নয়। ভদ্রলোক বলে,

—ওই দিক হ'য়ে বনে গেছি।

—কিসে গেলেন ? জেরা করি।

ভদ্রলোক সামলে নিয়ে জানায়,—জিপে।

এবার অবাক হবার পালা আমার—ওই দিকে জিপ যাবার কোন পথ নেই। বড় নদী পার হলে তবে এই দিকে বন রয়েছে।

—জিপের রাস্তা আছে নাকি ?

আমার কথায় বলে—নোতুন হয়েছে।

সঙ্গীরাই তাকে বাঁচালো, ওদের ডাকে গিয়ে গাড়ীতে উঠে যেন কোন মতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওদের গাড়ী বনের ভিতর চলে গেল।

মিঃ রায়ও শুনেছেন ওর কথাগুলো।

সুন্দরবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই। তবু বলেন—

—ক্যা দাদাজী ঝুট বোলতা যা, না ? ওইসাই লম্বা চওড়া বাত করনেবালা আদমী।

খবর আছে ফরেষ্টের লোকেদের মুখে, ছয় নম্বর রোডের ওপর টাস্কার হাতিটা রয়েছে। মিঃ রায় কি ভেবে বলেন—

—একবার ভেতরে যাচ্ছি, যাবেন তো চলুন।

স্পষ্ট করে বনের মধ্যে চলেছি আমরা। হঠাৎ স্তব্ধ বনের গভীরে চীৎকার আর্তনাদ ভেসে ওঠে। একটা স্পট লাইটের রেখা উপরের দিকে বারবার ঘুরছে। কোন বিপদের সঙ্কেতই হবে। মিঃ রায় বলেন তাঁর ড্রাইভারকে—রাশ করো জী উধার। ক্যা কুছ খতরা হোগা।

কিছুটা যেতেই দেখা যায় সেই গাড়ীটাকে। ওর ভিতর থেকে আর্তনাদ বিকট চীৎকার উঠছে, গাড়িটা প্রায় পাহাড়ের একটা খাদের ধারে ঝুলছে একটু এগোলেই অতলে ছিটকে পড়বে। আর সামনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাফ ঝাঁপ করছে একটা তরুন দাঁতালো হাতী।

পা ঠুকছে, দেখাচ্ছে যেন এখুনি দৌড়ে এসে চার্জ করবে ওদের। আমাদের জীপের আলোয় ওটাকে দেখে চিনতে পারি, এর আগেও দু' একবার দেখেছি ওটাকে।

আমাদের জীপের ড্রাইভার এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে একসিলেটার দাবিয়ে জীপটার ইঞ্জিনে গর্জন তুলে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হাতিটা জীপটাকে এগোতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। বিজ্ঞের মত দেখছে ওটাকে, তবুও জীপটাকে এগিয়ে যেতে দেখে সটান পিছু ফিরে দৌড় মারলো। ওর স্বভাবই অমনি পাঁয়তারা কসে পথ আগলাবে—এগিয়ে গেলেই সে ব্যাটা দৌড়বে।

এতক্ষণে গাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি সেই বাঘ দেখা ভদ্রলোক একেবারে দাঁতে দাঁত লেগে চিৎপাত হয়ে আছে, আর সেই বনেটে বসে স্পট করার মতলবদার ছোকরাভো বাক্যহারা হ'য়ে গেছে।

কোন রকমে রাতের অন্ধকারে ঝর্ণার জল গাছের পাতায় তুলে এনে মুখে চোখে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পর এই গাড়িটাকে এঁদের ড্রাইভার দিয়ে চালিয়ে বনের বাইরে আনা হ'ল। কারণ তাদের ড্রাইভার এত কাঁপছে যে তার গাড়ি চালাবার ক্ষমতাও নেই।

কোনরকমে বাকী রাতটুকু জনতা লজে কাটিয়ে ভোরের অন্ধকারেই তারা ফিরে গেছেন, সকালে আর তাদের দেখিনি।

মি: রায় বলেন—গেছে ভাল হ'য়েছে, আবার সত্যি সত্যি বাঘের পাল্লায় পড়ে কি ফ্যাসাদ বাধাতো কে জানে?

'জোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয়, এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্ত-ব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয় রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।"

—বিভুতি ভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়াংবোচির পথে

দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয়ের বুকে যাদু আছে। তাই বার বার মানুষ হিমালয়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রণাম জানিয়েছে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে—দেখেছে তার তুষার মৌলি শৃঙ্গ—তার রুক্ষ পাথরের খাঁজে তার রূপ—এক অনৈসর্গিক রূপ। যুগ যুগ থেকে ঝড় ঝঞ্ঝা সব সহ্য করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—উন্নতশির—তার ক্ষয় নেই অক্ষয়। অজেয়।

হিমালয়ের সেই যাদুর টানে, এবার (১৯৭৩) অক্টোবর মাসে আমাদের ছয়জনার একটা ছোট দল বেরিয়ে পড়লাম থিয়াংবোচি যাব বলে। তুষার ঘেরা এই রাজ্য—এভারেষ্টের পাদদেশে—বসতি শেরপাদের। সমস্ত অঞ্চলটার নাম খুম্বু—বরফের পাহাড়ের রাজ্য আর এখানেই রয়েছে নামচে, থিয়াংবোচি আরও কত নাম। থিয়াংবোচির সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১২৭১৫ ফুট। এখান থেকে এভারেষ্ট (২৯০২৮ ফুট), নুপৎসে (২৫৮৬০ ফুট), লোৎসে (২৭৮৯০ ফুট) এই তিন গিরিশৃঙ্গকে মনে হয় যেন হাতের নাগালে। থিয়াংবোচির চারিদিকে ঘিরে রয়েছে আরও কত হিমালয়ের শৃঙ্গ—দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে তাম্‌শেরকু (২১৭৩০ ফুট) আর কাংটেগা (২২৩৪০ ফুট), উত্তর পূর্বে রয়েছে আমাডাব্‌লাম (২২৪৯৪ ফুট), উত্তরে তাওয়াচে (২১৩৮৮ ফুট) আর উত্তর পশ্চিমে রয়েছে কুম্বিলা (১৯৩০০ ফুট)। পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে ছোট্ট একটি বিন্দুর মত রয়েছে বৌদ্ধদেব সুন্দর এক মনাষ্ট্রী। দূরে দেখা যায় বার্চ আর রডোড্রেন্‌ডন্‌ আর তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গ।

পর্বত অভিযানের সাক্ষী এই থিয়াংবোচি। ১৯৫৩ সালের সেই বিশ্ববিখ্যাত দুইনাম হিলারি আর তেনজিং আজ যুক্ত হয়ে গেছে এখানকার অঞ্চলে। অবশ্য সেবার বেসক্যাম্প আরও উপরে ছিল—এখান থেকে আরও তিন দিনের পথ। খুম্বু হিমবাহের উপর।

আমাদের যাত্রার আয়োজন ছিল কাটমুণ্ডু থেকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে এখানে দশেরা উৎসব চলেছে—তারজন্য কুলি পাওয়া গেল না—বাসও বন্ধ। আমাদের বাসে যেতে হবে লামসুঙ্গা—আর সেখান থেকেই সুরু হবে হাঁটা পথ। কদিন অপেক্ষা করার পর বাসে আমরা চীনের তৈরী কোডারিরোডএর উপর দিয়ে প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ পথ পার্ক্কী দিয়ে পৌঁছালাম লামসুঙ্গা। এখান থেকে চীন কবলিত তিব্বতের সীমানা মাত্র ৪০ কিঃ মি. ছোটগ্রাম—থাকা খাওয়ার কোন ভাল সুবিধা নেই। তবে এই গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা চলছে—জল বিদ্যুৎ তৈরীর জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে চীনের সহযোগিতায়, নাম সানকোসী প্রজেক্ট। আশ্রয় মিলল পুলিস

চৌকিতে—পাওয়া গেল প্রয়োজনীয় কুলি। অনেক রাত পর্য্যন্ত চললো আমাদের পরের দিনের যাত্রার প্রস্তুতি। ভোরের আকাশে আলোর দিশা। ঝকঝকে সকাল। আমাদের হাঁটা পথের হল সুরু। কষ্টকর চড়াই ভেঙে আমরা পৌঁছালাম পেরকুগ্রামে। ক্ষণিক বিশ্রাম আর কিছু খাওয়া সেরে আবার সেই চড়াই রাস্তা হাঁটা। এত কষ্টেও মন ভরে যায় চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে। বৃষ্টির মধ্যে পিচ্ছিল পথ বেয়ে এসে পৌঁছালাম সিলডুঙ্গা গ্রামে। ছোট গ্রাম ৮।১০ ঘর লোকের বাস। পাহাড়ের মাথায় পাওয়া গেল সেদিন রাতের আশ্রয়—গ্রামের ছোট একটি কুঠরী। আজকে আমাদের লামসুঙ্গা থেকে সিলডুঙ্গা আসতে আট ঘণ্টা সময় লেগেছে।

কিছুটা চড়াই ভেঙে, কিছু সমতল জায়গা পার হয়ে আমাদের খাড়া উৎরাই পথে চলতে হল। এই উৎরাই পথের মাঝেই জয়সওরা গ্রাম। তারপর নদীর গতি পথ ধরে হেঁটে পৌঁছালাম সেরা গ্রামে। ১৫।২০ ঘর বসতি, বাজার আছে। থাকার জায়গাও পাওয়া গেল। এখানে পরিচয় হল দুজন জার্মান মহিলার সঙ্গে—মা ও মেয়ে—তাঁরাও বেরিয়েছেন থিয়াংবোচে যাবার জন্য। সেরা থেকে আবার দুরন্ত উৎরাই পথে পৌঁছুই মাটিগ্রামে—পাস দিয়ে বয়ে চলেছে তামাকোশী নদী উছল চটুল। এই জল থেকেই চলছে সেচের কাজ ৪।৫ ঘর মাত্র বাসিন্দা—উপজীবিকা তাঁদের চাষবাস। রাতে থাকার ব্যবস্থা এখানেই করা গেল।

সকাল বেলা চড়াই রাস্তা ভেঙে আমরা প্রথমে পৌঁছালাম ইয়ারসা (৬০০০ ফুট) এখানেই সেদিনের মত যাত্রা বিরতি। পরের দিন ঠিক হল যে আমরা সেদিন থোসে পর্য্যন্ত যাব। কিন্তু পথে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল, পথ এত পিছল যে শেষ পর্য্যন্ত সিকরি (৬০০০ ফুট) গ্রামে এসেই সে দিনের মত রাত কাটাতে হল।

পরের দিন সকালে আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল—মনেই হচ্ছিল না কাল বৃষ্টির কথা—সোনালী রোদ—দুচোখ ভরে আলোর বন্যা দেখে নিই। কখন পৌঁছে যাই থোসে গ্রামে (৫৭০০ ফুট)। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এখানে রয়েছে স্কুল, পোষ্ট অফিস, পুলিস চৌকী, গণেশের মন্দির—এমনকি—বিলাতী কায়দায় হোটেল। হাঁটার পথ শেষ হয় একেবারে খসরুবাগে (৮০০০ ফুট)। রাতে থাকার ব্যবস্থা এখানেই করা হয়।

সকালে কুয়াসা থাকায় পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছিল। খিমটী খোলা নদীর পূব পাড় ধরে এগিয়ে চলি, দেওয়ালি পাশ পার হয়ে সুরু হল খাড়া উৎরাই। নানা ফুলের সমারোহ প্রিমুলা বেশী। পৌঁছাই ভাণ্ডারগ্রামে আর এক নাম যার চিয়াংমা (৭২০০ ফুট), এর পরই সুরু হবে শেরপাদের রাজত্ব। ক্ষণিক বিশ্রাম আবার চলা শেষ খিনজার গ্রামে।

পরের দিন লামজুরা পাশ পৌঁছানোর কথা। অনেকদিনের আশা সফল হতে চলেছে। আজ দিনটাও বড় সুন্দর, মিঠেকড়া রোদ উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলি। সামনে দেখা দেয় দিগন্ত জোড়া

পাহাড় আর ওরই মাথায় লাম্‌জুরা পাশ (১১৫৮০ ফুট) খাড়া চড়াই পথ। চারিদিকে রডোডেনড্রন, এসার্স আর অনেক গাছের জঙ্গল—নানা ফুলের বাহার পোটেটীলাস, প্রিমুলাস। রাস্তা খুব খারাপ, শুধু নুড়ি পাথরে ভর্ত্তি তার ওপর কনকনে হাওয়া আর কুয়াসা। সেদিনের মত থাকা গেল লাম্‌জুরা পাশের তলার গ্রামে। গ্রামটার নাম টাকটোর।

জুনবেশি (৮৮০০ ফুট) পৌঁছালাম পরের দিন সকালেই। এখান থেকে দেখা যায় নুম্‌বুর শিখর (২২৮১৭ ফুট) তুষারে ঢাকা, এখানে রয়েছে বৌদ্ধ মনাষ্ট্রি, রয়েছে বৌদ্ধদের দেবদেবির নানাচিত্র। ছোট কিন্তু খুব সাজান গোছান গ্রাম। ক্ষণিক বিশ্রাম, আবার চলা—আবার চড়াই। দূরে দেখা যায় পার হয়ে আসা লাম্‌জুরা পাশ। পাহাড়ের অন্যদিকে নেমে পৌঁছাই রিংমো গ্রামে।

পরের দিন আবার হাঁটা সুরু, আবার চড়াই—পৌঁছুতে হবে তাকসিন্ধু পাশ (১০৫০০ ফুট), পাশ পার হয়ে নামতে হবে উপত্যকায়। এ অঞ্চল জঙ্গলে ভরা। এক সময়ে পৌঁছে যাই খারিখোলা গ্রামে (৬৮০০ ফুট)। এখান থেকে ওনজন পাশ পার হয়ে—সুরখে গ্রাম। গ্রামে ঢোকার কিছুটা আগে পড়ে এক শাখা পথ—পাহাড়ের পথে উঠে গেছে। এই পথেই গেলে লুকলা এয়ার পোর্ট পৌঁছান যাবে। ফেরার সময় এখান থেকেই প্লেন ধরতে হবে—পৌঁছে যাব আবার কাঠমুণ্ডু মাত্র ৩৫ মিনিটে।

সামনে সেই চটুল পাহাড়ে নদী, আর এই নদীর পাড় দিয়ে পথ চলে গেছে ফাক্‌ডিং গ্রাম—পরে একবারে জোরসেল গ্রামে। চলার পথে এমন সুন্দর পরিবেশ খুব কম দেখেছি। দু-পাশে পাহাড়ের খাড়া চড়াই মাঝে মাঝে রয়েছে চীড়গাছের সারি—বয়ে চলেছে দুধকোশী নদী। জলের রং দুধের মত সাদা।

পথ চলার হিসাব করি—রিংমো থেকে এখানে আসা পর্য্যন্ত রাত কাটাতে হয়েছে জুবিং, খারতে আর চৌরিখারকায়। আর আজ রাতে থাকবো এই জোরসেল গ্রামে। কাল পৌঁছাব নামচেবাজার। জোরসেলের উচ্চতা ৯২০০ ফুট।

জোরসেল থেকে দুধকোশীর গা দিয়েই পথ চলে গেছে নামচে পর্য্যন্ত। দুধকোশী এখানে সৃষ্টি করেছে গভীর গিরিখাদ। নদীর উপর কাঠের পুল তৈরী করে দেন এড্‌মণ্ড হিলারী ১৯৬৪ সালে। পুল পার হয়ে প্রচণ্ড চড়াই ভেঙ্গে পৌঁছাই নামচেবাজার (১১৩০০ ফুট)।

নামচে বাজার পর্বতপ্রেমীদের কাছে এক অতিপরিচিত নাম। সমস্ত অঞ্চলে শুধু শেরপাদের বাস—এককথায় শেরপাদেরই রাজত্ব। এখান থেকেই পর্বতপ্রেমীরা অভিজ্ঞ আর কুশলী শেরপা সংগ্রহ করেন, অভিযান চালানোর জন্য তাদের সাহায্য অপরিহার্য্য। আরও একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে এভারেষ্ট আর তার আরও কত শৃঙ্গ। নামচের পিছনে রয়েছে কোয়াংডে শিখর (২০৩০০ ফুট)।

চেক পোষ্টে আমাদের অনুমতি পত্র পরীক্ষা করে যাবার অনুমতি দেওয়া হল—থিয়াংবোচি। দুধকোশীর পশ্চিম পাড় দিয়ে রাস্তা, পথটা খুব সুন্দর—চিড় আর পাইন গাছের সারি আর তার ফাঁকে দেখা যায় তুষারমৌলী শৃঙ্গ—সূর্য্যের আলো পড়ে প্রতি মুহূর্তে তার রং বদলাচ্ছে- সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন রং আবার পালটাচ্ছে আবার আর এক রূপ। এসে পৌঁছাই থিয়াংবোচি—স্বপ্ন সার্থক। কঠিন পথশ্রমের ক্লান্তি যেন এক নিমেষে দূর হয়ে যায়। প্রাণভরে দেখে নিই সেই সব অতুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট, নুপৎসে, লোৎসে, আমাডাব্লাম আরও কত।

এখান থেকেই আমাদের ফিরতে হবে। পাহাড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমাদের কিছুই নেই। এমন কি সামান্য স্লীপিং ব্যাগ পর্য্যন্ত নয়। এখান থেকেই রাস্তা চলে গেছে, পাংবোচে (১৩৯২১ ফুট) আর ডিংবোচে (১৪১৭৩ ফুট) আর এই সব গ্রাম পেরিয়ে ফেরিচে (১৩৯২১ ফুট)। এইটাই এ অঞ্চলের শেষ গ্রাম। তারপর সেই অতুঙ্গ হিমালয়ের পথ—শুধু তুষার আর তুষার।

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বত শৃঙ্গের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। এই মহান পর্বতের কাছে মাথা আপনি নত হয়ে আসে—একটা প্রাণের প্রণাম নিবেদন করি।

সবশেষে শুধু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে এ লেখা শুধু একটা ছোট ভূমিকা, পথের বিবরণ কিছু কিছু বাদ দিতে হয়েছে তা না হলে স্বল্প পরিসরে সব কিছুর বৃত্তান্ত আর বিশদ তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। তবুও যদি কোন পাহাড়প্রেমিক এ পথে যান তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

> "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
> দেশে দেশে কতনা নগর রাজধানী
> মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
> কত না অজানা জীব, কতনা অপরিচিত তরু
> রয়ে গেল অগোচরে।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হলেন এ ভূমি থেকে বিতাড়িত। লাউসেন ছিলেন কর্ণসেনের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র। কালক্রমে কুশলী যোদ্ধা হয়ে উঠলেন। পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আক্রমণ করলেন ইছাইকে। দেবী চণ্ডী ইছাইকে যুদ্ধে যেতে বারণ করলেন—শনিবার সপ্তমি / সম্মুখে বারবেলা / আজি রণে যেওনা ইছাই গোয়ালা। ইছাই ঘোষ শুনলেন না দেবীর সে আদেশ। যুদ্ধে লাউসেনের হ'ল জয়—ইছাই হলেন পরাজিত। সেটা ১৩ই বৈশাখ।

এই দেউল হয়ত সেদিনের ইছাইএর সেই দুর্গ—আর সমস্ত অঞ্চল ঘিরে ছিল গড়, পরিখা—১৩ই বৈশাখের যুদ্ধের স্বাক্ষর। কিন্তু সে কোন্ সালের ১৩ই বৈশাখ ?

ইতিহাস সেখানে নীরব।

"এই ভাল, এই বর্ব্বর রুক্ষ বন্যপ্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শাল পলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোনও সম্পদ বিনিময় করিতে চাই না।"

—বিভুতি ভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টারে ফিরি খুঁজিয়া।

মহিষাসুর মর্দিনী

হ্যালেবিট

নিরঞ্জন বোস

॥ **ধবল চূড়া হেম কলেবর**

মুক্তিনাথের পথে

—অন্নপূর্ণা সাউথ

সুখেন্দু রায় চৌধুরী
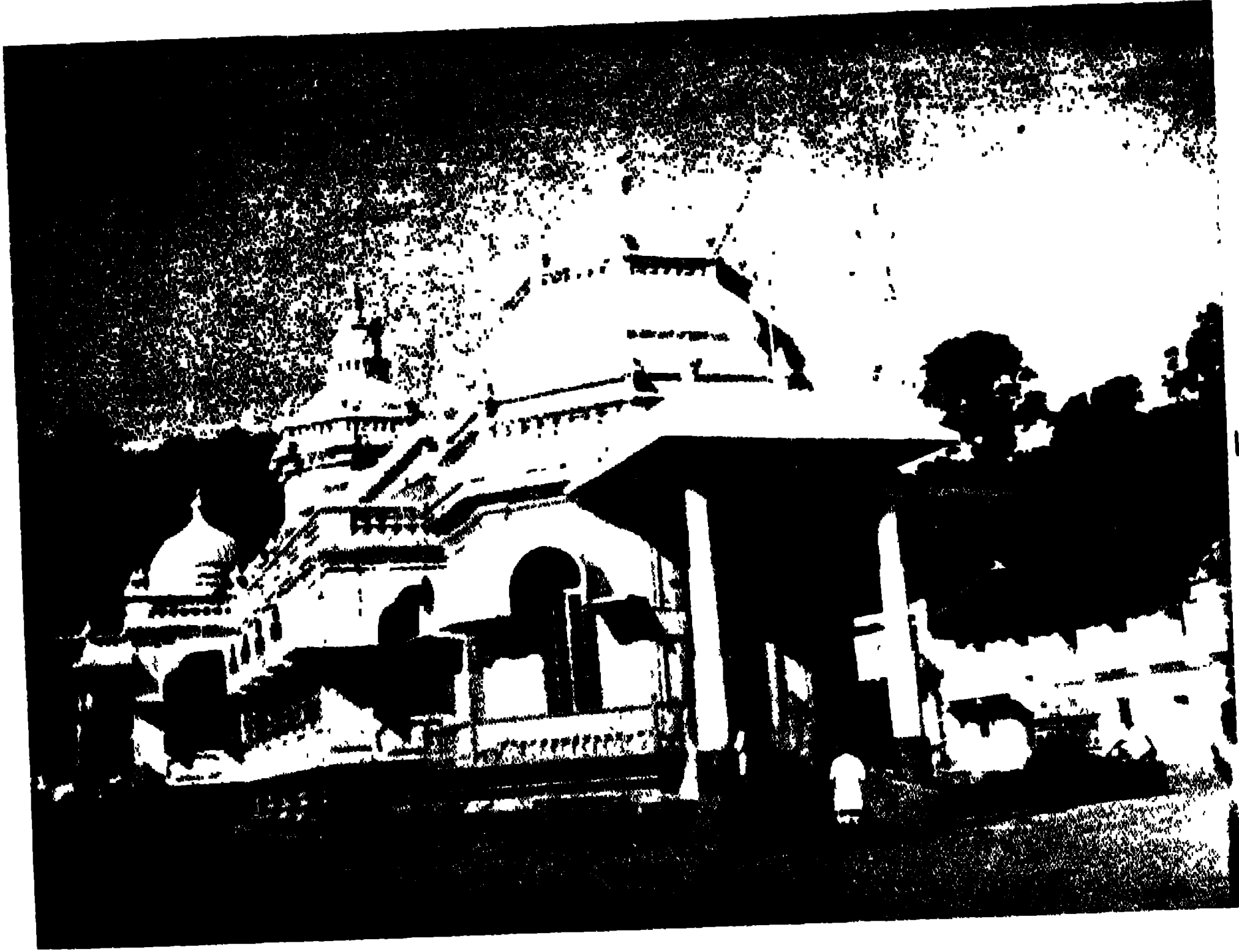
॥ বিশ্বজনের অর্ঘ্য হেথা
নিত্য জমে ভক্তি ভরে
শ্রীমংগেস মন্দির
— গোয়া
দিলীপ পাল

॥ ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর ॥
· নন্দাকোট
অনিল ঘোষাল

বিপাশার কূলে কুলু-মানালী

নারায়ণ দাস পালিত

২৩শে ডিসেম্বর '৭৩, রবিবার

আজ আমাদের যেতে হবে বিলাসপুর থেকে মাণ্ডি কুলু, কাতরাইন হয়ে মানালী—দূরত্ব ১১৩ মাইল। মাণ্ডি (২৫০০´ ফুট) বিপাশা নদীর তীরে। এই বিপাশাই এবার আমাদের মানালী পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মাণ্ডি ছাড়তেই রাস্তা পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলো এই রাস্তা চলবে আউট পর্যান্ত (২৫) মাইল। এইখানে বিপাশা বিরাট গিরিখাদ সৃষ্টি করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেশ উঁচুতে উঠে এলাম। বিপাশাও অনেক নীচে নেমে গেল। পাহাড়ের তলদেশে নরম শিলা থাকায় বিপাশা তাকে কেটে কেটে গভীরে নেমে গেছে। তাই এখানের দুদিকের পাহাড়ই অত্যন্ত খাড়াই। বর্ষায় যখন বিপাশার জল বাড়ে, তখন বিপাশা পাহাড়ের অনেকখানি ওপরে উঠে আসে। শীতে আবার জল যায় নেমে। বহুকাল ধরে জল ওঠা-নামা করায় শক্ত পাথরে আঁচড় পড়ে পড়ে অপূর্ব কারুকার্যের সৃষ্টি করেছে। এখানে শিল্পী মানুষ নয়—প্রকৃতি। প্রকৃতির এই মন-মাতানো সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলেছি। এখানে বিপাশা অনেক নীচে। গাড়ীতে বসেই নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। বিপাশার জলেরই বা কী রূপ! কখনও সমুদ্রের মতন নীল, কখনও সবুজ, কখনও বা কালো।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা পোন্‌ডহ্‌ পৌঁছে গেলাম। এখানে আমাদের থামতে হলো রাস্তা বন্ধ। এখানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে নূতন রাস্তা করা হচ্ছে। এই ভাঙ্গা রাস্তাটি প্রায় পাঁচ কিঃ মিঃ। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫।১৫ মিঃ পর্যন্ত এ রাস্তা থাকে বন্ধ। মজুররা তখন কাজ করে। দুপুরে ১২-১৫ মিঃ থেকে এক ঘণ্টা মজুরদের খাওয়ার জন্যে রাস্তা খোলা থাকে। তবে প্রতি শুক্রবার সারাদিনই রাস্তা খোলা থাকে।

ঠিক বেলা ৫।১৫ মিঃ গেট খুলে গেল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। রাস্তা শুধু ভাঙ্গা নয়—ছোট মাঝারি বড় পাথরে পূর্ণ। মাঝে মাঝে আবার গর্ত। মাঝে মাঝে গাড়ী থেকে নেমে পাথর সরিয়ে, কখনও বা গর্ত বুজিয়ে, অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলাম। রাস্তা এখানে বেশ সরু, পাশেই গভীর খাদ। আর এই খাদের মধ্যে দিয়ে বিপাশা মৃদু কলতান তুলে চলেছে।

আউট আসতেই রাস্তা সমতলে এসে গেল। এখান থেকেই কুলু উপত্যকা সুরু হলো। কুলুর উচ্চতা ৪০০০´ ফুট। কুলু উপত্যকাটি বিপাশার গতি পথে ৫০ মাইল (৮০ কিঃ মিঃ) লম্বা

আর এক মাইল চওড়া। ভ্রমণের পক্ষে তাই অতি মনোরম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়,—পাহাড়ের গায়ে কখনও শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কখনও বা দেবদারু-পাইন গাছের সমারোহ।

কুলু বললেই প্রথমে মনে পড়ে এর দশেরা উৎসবের কথা। (দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর দিন) বিভিন্ন গ্রাম থেকে শোভাযাত্রা করে দেবতাদের নিয়ে আসা হয় দেওদার বৃক্ষ শোভিত ঢোলপুর ময়দানে। এত বিচিত্র বর্ণের শোভাযাত্রা খুব কম উৎসবেই দেখা যায়। এক গভীর উন্মাদনায় মেতে ওঠে তখন সারা কুলু উপত্যকাটি।

২৪শে ডিসেম্বর, '৭৩, সোমবার

মানালী! সুন্দরী মানালী (৬০০০´ ফুট)!! মানালী সহর বাজার থেকে একটা পাহাড় সামনে উঠে গেছে। এই পাহাড়ের গায়ে খানিকটা জমি সমতল করে তিনটি সুন্দর লগ্-হাট তৈরী হয়েছে, ট্যুরিষ্টদের জন্যে। লগ্-হাটগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জগ্‌তি, মনু ও বশিষ্ট। আমরা দখল করেছি জগ্‌তি ও মনুকে। এ লগ্-হাটগুলি ছাড়াও পাহাড়ের গায়ে আরো ৫টি থাকবার জায়গা রয়েছে। লগ্-হাটগুলির নীচে সার্কিট হাউস, গণ্যমান্য ভি. আই. পিরা থাকেন এখানে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি—পাহাড়ের গায়ে, মাথায়, পাহাড়ের ঢালু জমিতে—সর্বত্রই বরফ। লগ্-হাটের তলা দিয়ে বিপাশা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে। পাইন বনের ভেতর দিয়ে বাতাস তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। রোদে দাঁড়িয়ে সুন্দরী মানালীর হিম-শীতল স্পর্শ বেশ আরামই লাগছিল। বশিষ্টদেবের আঙিনায় বসে মানালীর রূপ দেখ্‌ছি। এদেখার আশা মেটে না। বিপাশার কোলে ছোট্ট একটি উপত্যকা—ধীরে ধীরে উঠে গেছে পাইন ঘেরা পাহাড়ের দিকে। উপত্যকায় একটি আপেল বাগান। শীতে গাছগুলি পত্রহীন।

২৫শে ডিসেম্বর, '৭৩, মঙ্গলবার

আজ কিছুটা হেঁটে, কিছুটা মোটরে মানালীর আশ-পাশটা দেখার কথা। কোন নির্দিষ্ট ভ্রমণ তালিকা নেই। বেলা ১১টার সময় প্রাতরাশ সেরে ও দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই এলাম বাজারে। যাওয়া স্থির হলো রোটাং পাশের পথে। মানালী বাজার থেকে রোটাং পাশ ৪৫ কিঃ মিঃ। এই ৪৫ কিঃ মিঃ পথেই উঠে যাবো সাত-আট হাজার ফিট। (রোটাং পাশ ১৩৪০০´ ফুট) পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু দিয়ে মোটর চলাচল পথ আর নেই। রোটাং পাশের রাস্তায় পড়ে বশিষ্ট উষ্ণ প্রস্রবন। দূরত্ব—মানালী বাজার থেকে মাত্র দু মাইল। বিপাশা এখন আমাদের বাঁদিক দিয়ে বয়ে চলেছে। সুন্দর মানালীতে আছে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রকৃতি ও হিমালয়কে অনুভব করা। যে কোন হোটেল বা থাকবার জায়গা থেকেই চিরতুষার হিমালয়ের দৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে যদি পূর্ণিমার রাত্রি হয় তো আর কথাই নেই। চন্দ্রালোক

এক মোহিনী মায়ায় সমগ্র উপত্যকাকে ছেয়ে ফেলে। পর্ব্বত দুহিতা বিপাশা নূপুরের ধ্বনি তুলে তাকে আরো সুন্দর, আরো স্বপ্নময় করে তোলে।

বশিষ্ট আশ্রমকে বাঁয়ে রেখে আমরা রোটাং পাশের দিকে চললাম। রাস্তা এবার বেশ খাড়াই। আমরা বিপাশার কূলে কূলে চলেছি। বিপাশা, নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে, কখনও বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। ক্রমশঃ চারিদিকে বরফ বাড়তে লাগল। আমরা আর না এগিয়ে কাছেই "কোটি বিশ্রাম ভবনে" (৮০০০ ফুট) আশ্রয় নিলাম। সঙ্গে আনা খাবার ও গরম গরম কফি খেয়ে চারিদিকের সৌন্দর্য দেখছি। বিপাশা অনেকখানি দূরে সরে গেছে। দূরে তুষারাবৃত রোটাং পাশের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। রেষ্ট হাউসটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের মাথায় বরফ, গায়ে বরফ, বরফ নেমে আসছে আমাদের পায়ের তলায়। চারিদিকে রোদ ঝল্‌মল্ করছে। আলো ঝল্‌মল্ আকাশ ঢেকে ফেল্‌লো মেঘে। দেখতে দেখতে তুষারপাত সুরু হয়ে গেল দূর পাহাড়ে। তুষার ঝড় ক্রমশঃ পাহাড় থেকে নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আমরা আর বিলম্ব না করে গাড়ী ছেড়ে দিলাম।

"জলন্ত ধূপ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি সুগন্ধ রেখে যায় তার পরিবেশ। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা যেখানে বীজমন্ত্র জপ করে গেছেন, সেই আসনের আশে পাশে এসে দাঁড়াও তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবে।"

—প্রবোধ কুমার সান্যাল

হিমালয় ঃ অভিযাত্রীদল ঃ চার চিকিৎসক

অমিয় কুমার হাটি

যোশীমঠ।

ডাক্তার সুবীর ভট্টাচার্য রোগীটিকে যত তাড়াতাড়ি হিন্দী বলতে যাচ্ছেন, তত বেশি ভুল করছেন, বাঙলা বেরিয়ে আসছে, দু'চারটে 'আপ', 'তুম', 'খাইয়ে', 'যাইয়ে' ছাড়া। অদূরে গুরুতর একটি রোগী পরীক্ষা করছিলেন ডাঃ অমিত চৌধুরী। তিনি না হেসে পারলেন না। হাসছিল 'সুনীল, যে ডিসপেনসারীতে ওষুধ বিলি বন্দোবস্ত করছিল। এমনকি, হাসি চাপতে গিয়ে খুকখুক করে কাশতে আরম্ভ করলেন রোগীটির স্ত্রীও—মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। ভ্রূক্ষেপ নেই ডাঃ ভট্টাচার্যের, হিন্দী বললে রোগীদের অন্তরঙ্গ হতে পারবেন বেশি,—"তুম কালসে দিনে রাতে চার ট্যাবলেট খায়েগা। এইসা মত পাঁচ রোজ। আপ বুঝা হ্যায় ?"

জ্বর ছাড়ছেনা ৭।৮ দিন থেকে। ডাঃ ভট্টাচার্য পরীক্ষা করেই ধরেছিলেন, টাইফয়েড। আবার একবার ঐ অপূর্ব হিন্দীতে বোঝাতে যাচ্ছিলেন। এইবার সুনীল রেহাই দিল। সে চোস্ত হিন্দী আর গাড়োয়ালী ভাষা মিশিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করল। ওষুধ দিয়ে দিল আমাদের ডিসপেনসারী থেকে।

এর দু'দিন পর ডাঃ ভট্টাচার্যের আটটি ক্যাপসুল খেয়েই রোগীর জ্বর ছেড়ে গেছে। স্ত্রীর সঙ্গে আবার এসেছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। তা জানাক। ডাঃ ভট্টাচার্যের মুখে পরিতৃপ্তির অমল হাসি। কিন্তু হঠাৎ একী হল ? ডাঃ ভট্টাচার্য দারুণ ধমকাতে শুরু করলেন লোকটিকে—"কাহে তুম ফেরৎ দিতে আয়া ? হাম বোলা নেই, ওষুধ পাঁচ রোজ খায়েগা ? আজ তো মাত্র দো রোজ হুয়া। কাহে ওষুধ খানা বন্ধ কর দিয়া ?"

জ্বর ছেড়ে গেছে। তাই বাকি ওষুধ ফেরৎ দিতে এসেছে। পাহাড়ীদের এই গুণ। অপচয় তারা কিছু করতে চায় না। কিন্তু ডাঃ ভট্টাচার্যও নাচার। এটা অপচয় নয়। টাইফয়েডে জ্বর ছাড়লেও ২।৩ দিন ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। তাই ডাঃ ভট্টাচার্যের এই ধমক। এবার ডাঃ চৌধুরী লোকটীকে আবার বোঝালেন ভাল করে। ভদ্র মহিলার সে কী উচ্ছ্বসিত হাসি !

অসাধ্য সাধন করেছে সুনীল। বালবালা হিমবাহে যাবে তার ক্লাবের পর্বতারোহী সদস্যরা—উঠবে অনামা, অবিজিত পর্বতশিখরে। দলের সঙ্গে মামুলী এক ডাক্তার রাখতেই হয়—কিন্তু সেটুকু পদ-পূরণই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। অভিযানের সঙ্গে তাই যুক্ত হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় নানা গবেষণা প্রকল্প। লেখকের ঘাড়ে পড়েছিল উপযুক্ত চিকিৎসক খোঁজার দায়িত্ব।

এ অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর। অনেক চিকিৎসকবন্ধুই লেখককে অনেক সময় জানিয়েছেন, তাঁরা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে উদগ্রীব! লেখক এবার একে একে তাঁদের দোরে ধর্ণা দিতে আরম্ভ করল। কারুর ছুটি নিতে অসুবিধা, কেউ এবার পারবেনা, কারুর বাড়ীতে পূজা, কারুর স্ত্রীর অমত— বলেছেন অভিযানে গেলে আত্মঘাতিনী হবেন! হতাশায় যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেবার কথা, তখন ট্রপিক্যাল স্কুলের তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার ও হাউস ফিজিসিয়ান যথাক্রমে ডাঃ ভট্টাচার্য ও ডাঃ চৌধুরীকে কথায় কথায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজি হন।

ডাক্তার তিনজন বাদে অভিযাত্রী দলে আরও ছিল দশজন সদস্য। কিন্তু শুধু কি এই তেরজন? যোশীমঠ ও বদ্রীনাথে কতযাত্রী ও পর্বতাভিযাত্রী যে আমাদের দলের সঙ্গে, কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন! এর কারণ বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তীর্থযাত্রী, অভিযাত্রী, পার্বত্য গ্রামবাসী এমন কি, আমাদের মালবাহকদের মধ্যে। কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শ্যামল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 'উজ্জাত্রিচ' অভিযাত্রীদল ও গুজরাট মাউন্টেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের উদ্যোগে নন্দলাল পুরোহিতের নেতৃত্বে 'মানা' অভিযাত্রীদলের কথাই ধরা যাক। সুখ দুঃখ, বিপদ আপদে আমরা পরস্পরের সহযোগিতা করেছি।

জাল পেতেই ছিলাম। যোশীমঠে যে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে, ভীষণ ভীড় হচ্ছে তাতে। ডাঃ চৌধুরী, ডাঃ ভট্টাচার্য দলের তরুণ সদস্য বিমলকে নিয়ে দূর দূরান্তরে গ্রামেও যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। অদ্ভুত একটা নেশা ধরে গেছে ওঁদের। কাজের চাপে খাওয়া দাওয়াও অনিয়মিত। বদ্রীনাথ, মানাগ্রাম, বামনীগ্রামে স্বাস্থ্য সমীক্ষা চালানো এখনো বাকি। জালে, অর্থাৎ ভদ্রভাষায় বলতে গেলে আমাদের কর্মকাণ্ডে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে ফেললাম প্রৌঢ় এক চিকিৎসককে।

ডাঃ হীরালাল রাথোড। গুজরাট অভিযাত্রী দলের চিকিৎসক। আমাদের সঙ্গে কথা বলে এতই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়লেন (তাঁরই ভাষায় বলছি) যে, আমাদের সবরকম সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

বয়স ৪৭। শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা। সুস্বাস্থ্য। আমেদাবাদের কাছে 'দীসা'য় বাড়ী। দারুণ পসার। স্ত্রীও চিকিৎসক। নার্সিং হোম আছে নিজেদের। গুজরাট দলকে একাই দশহাজার টাকা দান করেছেন।

এই অভিজ্ঞ চিকিৎসককে পেয়ে আমাদের আনন্দের অবধি নেই। মিলিটারী অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উভয় দলকেই কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ডাক্তাররা এতে খুশি। তাঁদের কাজকর্ম ভালভাবেই চলবে। ডাঃ রাথোড আমাদের অভিভাবক হয়ে উঠলেন অচিরেই। তাঁকে আমরা 'রাথোড ভাই' ডাকতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে পাহাড়ে চড়ার সব সদস্যই বদ্রীনাথে পৌঁছে গেছে। ডাঃ রাথোডকে নিয়ে বদ্রীনাথ এলাম। পুরোদমে চিকিৎসার কাজ শুরু হল, ডিসপেনসারী চালু হল। সুন্দর ফটোও তোলেন। অদ্ভুত কর্মক্ষম

লোক। ভোর থেকে তাড়া লাগাতেন। বেরিয়ে পড়তাম চার চিকিৎসক—দু'দলে ভাগ হয়ে বামনীগ্রাম ও মানাগ্রামের দিকে। একদলের সঙ্গে থাকত সুনীল, বিকাশ, বরুণ, ধ্রুব, আশিস; অন্যদলে প্রভাত, শিশির, বিমল, সুব্রাহ্মনিয়াম ও বৈদ্যনাথ। আশিসকে ডাঃ রাথোড সব সময়ই নিজের দলে রাখতেন। ডাঃ রাথোড বদ্রীনাথ এসে পৌঁছুলে তাঁকে যে অপরূপ অভ্যর্থনা দেওয়া হয়, তাঁর সম্মানে বিজয়া দশমীতে যে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়, আশিসই তার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল। ডাঃ রাথোড বহুদিন সেসব মনে রাখবেন।

কত বিচিত্র চরিত্রের সমারোহ!
বদ্রীনাথের সরকারী বিশ্রামশালা। পাশের ঘরে এক ওড়িয়া দম্পতি, সঙ্গে এক বছরের ছেলে। রাত ১১টা। ছেলেটা কাঁদতে শুরু করল। একঘণ্টা ধরে কেঁদেই চলল। ওড়িয়া দম্পতির কোন সাড়া নেই। ব্যাপার কী? ডাঃ রাথোড ওদের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। ১৫ মিনিট পর দরজা খুলল ওরা। ঘুমঘুম চোখ। নজরে পড়ল, ডাঃ রাথোডের, ছেলেটা একা অসহায় ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দারুণ শীতে, বিছানাটার চারপাশে। আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে বলে ওরা দুঃখ প্রকাশ করল। আমরা তো জেগেই ছিলাম, জেগেই থাকি রোজ ১২টা-১টা পর্যন্ত। বরং ওদেরই সুখের ঘুম নষ্ট করে দিল ছেলেটা! ডাঃ রাথোডএর কাছে জানতে চাইল—"কী ভাবে ছেলের কান্না থামাবো ডাক্তার সাহেব?" ধমকের সুরে বললেন,—"কম্বলের তলায় নিয়ে যাও। দেখছ না, ঠাণ্ডায় কাঁপছে? নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি।"

ডাঃ রাথোড মন্তব্য করলেন, দম্পতিটিকে তৈরি করা শিশু দিলেই ভাল হত। শিশুপালন করা ওদের কর্ম নয়। হাসির রোল উঠল। ডাঃ রাথোড চমৎকার রসিক লোক।

আর এক ওড়িয়া দম্পতি। বুড়োবুড়ি। সবে বিকালে বাস থেকে নেমে উঠেছে বিশ্রামশালায়। হঠাৎ বুড়োর বুকে দারুণ যন্ত্রণা—সারা শরীর ঘামছে, নাড়ীর গতি ক্ষীণ, রক্তচাপ নিম্নমুখী। সঙ্গে সঙ্গে পেথিডিন দেওয়া হল তাঁকে। অক্‌সিজেন্ সিলিণ্ডার তৈরি করে রাখা হল, যদি দরকারে লাগে। সঙ্গে আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ওঁর আশেপাশে ব্যগ্রভাবে বসে। বুড়ীর কিন্তু বদ্রীনাথ দর্শন না করলেই নয়, ঐ অবস্থায় যেখানে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, যেখানে সেবা শুশ্রূষার দরকার, সেখানে বুড়ী ছুটলেন বদ্রীনাথের চরণতলে। দিব্যি ধীরে সুস্থে মন্দির সংলগ্ন উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান সারলেন, রাত ৭-৭॥০টা পর্যন্ত আরতি দর্শন করলেন ভক্তিভরে, তারপর ফিরলেন হেলতে দুলতে।

তা কারুর কারুর ধারণা, বুড়ীর ঐ বিষম প্রার্থনার গুণেই বুড়ো এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল। এদিকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিচে পাঠাতে পারছি বুড়োকে, আমাদের হৃৎকম্প থামবে না। তাঁদের দলনেতা আমাদের নির্দেশে পরদিন সকাল ১০টাতেই দলটাকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন, বাসে! হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

বদ্রীনাথে পাগলও আসে। স্ত্রীর সঙ্গে নিদারুণ ঝগড়া ক'রে এক প্রায় প্রৌঢ় এসে উঠলেন এখানকার বালানন্দ আশ্রমে। ইচ্ছা, সংসার ত্যাগ করবেন। আশ্রম অধ্যক্ষ ভবানীদা; নানারকম ভাবে বোঝাচ্ছিলেন তাঁকে সংসার সম্পর্কে। অত্যন্ত সরল বিনয়ী ও সদালাপী এই ভবানীদা। হঠাৎই ভদ্রলোক লম্ফঝম্ফ আর চীৎকার শুরু করলেন, তাঁর নাকি হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে, হার্ট ফেল করে আর কী! ভয় পেলেন খুব ভবানীদা। ছুটে এলেন। আমরাও পড়িমরি করে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, দিব্যি শুয়ে আছেন কম্বলের ভেতর! বিড়বিড় করে বলছেন,—"আমি কালই ওর কাছে ফিরে যাব।"

—"তা না হলে আপনার হৃৎকম্প সারবে না।"

ভবানীদার মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

এ হৃৎকম্প সে হৃৎকম্প নয়!

এবার দলটাকে, বদ্রীনাথ পিছনে ফেলে, উপরে এগিয়ে যেতে হবে, সরস্বতী নদী ধরে—ঘাসতলী, চানতুমকা পেরিয়ে, বালবালা হিমবাহের অপরূপ তুষার অঙ্গনে। কিন্তু এগিয়ে যাবার দিনও বুঝতে পারছিলাম, কারা যেন সবলে আমাদের মনকে পিছনে টানছে। এরা সেই শতশত রোগী, যাদের চিকিৎসা করেছি, এরা সেই সব তীর্থযাত্রী, যারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছে। সেই চার বোনের কথা কী করে ভুলি? কয়েক হাজার টাকার ওষুধ বিলিয়ে দিয়েছি এবার পার্বত্য গ্রামগুলিতে। সঙ্গে অঢেল ওষুধ নিয়ে চলেছি উপরে। তবু বাঙালী চার বোন বদ্রীনাথ থেকে উপরে যাবার দিন তাঁদের সঙ্গের সব ওষুধ ঢেলে দিলেন আমাদের। একদল শিক্ষক। এঁদের মধ্যে সুগায়কও ছিলেন। এক দুপুরে রজতদ্যুতি নীলকণ্ঠের সামনে বিশ্রামশালার অঙ্গনে গানের পর গান গেয়ে শোনালেন। নিচে নামার আগে তাঁরাও তাঁদের লজেন্স, টফি, চিড়েভাজা সব বিলিয়ে দিলেন। অথচ বিকাশের ব্যবস্থাপনায় আমাদের খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ। মেদিনীপুরের সেই পরিবার। যাঁদের দৌলতে বদ্রীনাথে বসেও চালভাজা, ছোলাভাজা, নারকেল সন্দেশ খেয়েছি পেটপুরে। কিম্বা যোশীমঠের বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতি—সুধীন্দ্র ও দীপ্তি—সুধীন্দ্র তরুণ অধ্যাপক আশুতোষ কলেজের—ডাঃ ভট্টাচার্যকে, ওঁরা দুজনেই স্বেচ্ছায় সাহায্য করেছেন নর্দমার ধার আর পথের জঞ্জাল থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে। এঁরা একদিন আমাদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। উপেক্ষাও তো দেখিয়েছিল কেউ কেউ। আমাদের আমল না দিয়ে হুশহুশ করে মোটরগাড়ী নিয়ে যোশীমঠ হয়ে উপরে গেল বিরাট একটা বাঙালী পরিবারের দল। ফেরার সময় খুঁজছে কিন্তু আমাদের ডিসপেনসারী। দলের এক ভদ্রমহিলা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তিনি বদ্রীনাথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাঃ ভট্টাচার্য ও ডাঃ চৌধুরী পরীক্ষা করলেন, ওষুধপত্র দিলেন, অভয় দিলেন। মনে পড়ছে, জ্যোতির্মঠের সকলানন্দ শাস্ত্রীর কথা, দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, ৪০ বছর

বয়স, লক্ষ্ণৌএর এক কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে, এখানে প্রায় সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়েছেন যদিও, মুখে চোখে কীসের যেন একটা অপ্রাপ্তির ক্লান্ত, হতাশাব্যঞ্জক ছায়া! আর, সবশেষে, সবথেকে বেশি করে মনে পড়ছে, সেই আশ্চর্যসুন্দর সন্ধ্যার কথা. যেদিন যোশীমঠে সরকার মশাইএর নতুন খোলা হাড় জিরজিরে অন্নপূর্ণা হোটেলে হঠাৎই বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ সান্নিধ্যলাভের। তাঁর উষ্ণ হৃদয়ের অপরিমেয় আশীর্বাদে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন সকলকে। অভিযানের শুরুতেই মনে হয়েছিল, অভিযান সার্থক।

এত সব স্মৃতির আলপনা আঁকতে গিয়ে, ক্ষমা করবেন, হিমালয়ের অনির্বচনীয় রূপসুধা বর্ণনা করার সময় পেলাম না। নেইবা হ'ল! লেখকের ক্ষোভ নেই। হিমালয়ে মানুষকে দেখাও, হিমালয়কে দেখা!

"শতাধিক বছর ধরে শ্রান্তিহীন পরিশ্রম করে শতশত স্থপতি আর ভাস্কর যে অক্ষয় সৃষ্টি করে গেছে,—মাত্র একদিনে তা দেখা যায় না। কিন্তু পর্যটকের হাতে সময় নেই। ঐ একদিনই,—বড়জোর না হয় আর দু-তিন দিন। সময় যদি থাকত তাহলে খাজুরাহো মন্দিরের যে-কোন একটি মূর্তির দিকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারতাম।"

—নির্মল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মরণবন সুন্দরবন

বিশ্বনাথ বসু

বাঘ, গুনীনের বাঁ কাঁধে থাবা বসিয়ে, দেহটা কাছে টেনে এনে ঘাড় কামড়ে ধরে একটা ঝাড়া দিল। ঐ একটি মাত্র ঝাড়াই যথেষ্ট। গুনীনের প্রাণহীন দেহটি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিংড়ি মাছের মত কুঁকড়ে গেল। দলের সঙ্গীদের হৈ হল্লা, কাদা ছোড়াছুড়ি কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে বাঘ তার দুই চোয়ালের কব্জায় শিকার ঝুলিয়ে নিয়ে খাল পাড়ের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডাইরেক্টরের মোটর লঞ্চে বসে আছি। আলোচ্য ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে একটি জেলে। নৌকো তাদের লঞ্চের গায়ে বাঁধা। বলার ভঙ্গী ও হাব-ভাবে আমার মনে হচ্ছিল মরণবন এই সুন্দরবনের জলে জঙ্গলে জীবিকা সন্ধানী এই লোকগুলোর কাছে জীবন-মৃত্যুর এই রক্তক্ষয়ী ভবিতব্য যেন স্রেফ গা-সওয়া হয়ে গেছে। ডোরাকাটাদের দৌরাত্ম্যে দলের লোক মরে।—নেহাৎই আপন জন যদি সঙ্গে থাকে, দু' একদিন কান্নাকাটি করে—গ্রামে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেয়, মা বোনের কানে। তারপর গামছার খুঁটে চোখের জল মুছে, আবারও সে ফিরে যায় সেই জঙ্গলে সঙ্গী দলের খোঁজে। কুঞ্জ গুনীনের ছেলে, পাঁচকড়িও গ্রামে গেছে ঐ একই খবর নিয়ে। দু' চারদিনের মধ্যে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে আবার মিলবে এসে দলের সঙ্গে। বলছিল সেই লোকটি।

২৪-পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ নিবাসী কুঞ্জ গুনীন। পুরো নাম কুঞ্জ বিহারী হালদার। আদি নিবাস ছিল খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কালিগঞ্জে। ভারত বিভাগের প্রথম বলি এরা। উদ্বাস্তু হয়ে এবঙ্গে এসে আস্তানা গেড়েছিল। মাছ ধরার আদি পেশা ছাড়তে পারেনি। সারা বছর মাছ ধরে বেড়ায় তাই আজও এ বঙ্গের সুন্দরবনে। ছেলে পাঁচকড়িকেও সঙ্গে রাখে। কাজ শেখাচ্ছে আর সুন্দরবনের হাল চাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করছে। তাতে ঝুঁকি থাকলেও পেটের অন্ন জোগাবার অন্য কোন বিকল্প নেই ওদের।

এবারের দল গড়েছিল কুঞ্জবিহারী বারো জনকে নিয়ে। চারখানা নৌকোর বহর ওদের।

বসিরহাট রেঞ্জের বাগমারা ব্লক। খাড়ি খালগুলো পর্যবেক্ষণ করতে করতে হরেক রকম মাছের এলোপাতাড়ি পাখালি দেখে সাত তাড়াতাড়ি জাল নামিয়ে ঘের দিল ওরা বকুলতলা খালে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল তখন পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হবে। জোয়ার ভাটায় জলের ওঠা নামা দেখে জালের

মাথা তুলে দিল ওরা মাঝ রাতে। জাল টানা সুরু হোল পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ। মার্চের ২৮ তারিখ সেদিন, ১৯৭৪ সাল।

খালে ঘের দেবার আগে কুঞ্জগুনীন বাঘ খেদানো মন্ত্র আউড়ে বন্ধনী দিতে ভোলেনি। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় বাদাই বাঘের তেজ কুঞ্জর বিলক্ষণ জানা আছে। জানা আছে দুই বাংলার জলে জঙ্গলেই। তাই বন্ধনী মন্ত্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গীদের খালে নামাতে সাহস হয় না। হয় না, তার কারণ গরীব নিরস্ত্র এই সুন্দরবনচারী মানুষদের ঐ মন্ত্রই ভরসা। কিন্তু কুঞ্জ গুনীনের অভিজ্ঞতায় মন্ত্রের ভরসায় বাওয়ালী দলের সবার পক্ষে যে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় এমনও নয়। সম্ভব না হলেও সংস্কারন্ধ মনে সেই মন্ত্রশক্তিকে তাচ্ছিল্য করতেও সাহস হয় না। আঁটসাঁট বন্ধনী এলাকার মধ্যে কুঞ্জর দলের লোকও ডোরাকাটাদের হাতে দু'একবার ঘায়েল হয়েছে। তখন মন্ত্র ভুলে স্বীয় দাপটে কুঞ্জকে পরিস্থিতির সামাল দিতে হয়েছে। আজ কুঞ্জর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। শারীরিক দাপটের শক্তি না থাকলেও এই বৃদ্ধ বয়সে মন্ত্রশক্তির ওপর আস্থা তার বেড়েছে বই কমেনি।

বকুলতলা খালে জাল টানতে নেমেছিল মোট সাতজন। কুঞ্জর ছেলে পাঁচকড়িও ছিল তাদের মধ্যে। জালের কানি টেনে এগুচ্ছিল ডান দিকে অনিল মণ্ডল, বাঁদিকে কুঞ্জগুনীন নিজে। খালের দু' দিকে ঠাসা ঝাঁটি জঙ্গল। কাঁকড়ার গর্তে জল ঢোকার ফট্‌ফট্ শব্দ ছাড়া অন্য কোনো সাড়া নেই জঙ্গলে। না থাকলেও চোখ কান সজাগ রাখে বৃদ্ধ গুনীন কুঞ্জবিহারী। বলা যায় না— কাঁচা বাদা।

জাল টেনে জেলেরা পাঁচ সাত হাত মাত্র এগিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ বাঁ দিকের ঝাঁটি জঙ্গলে কি যেন 'সড়' সড়' 'দুড়াৎ' 'দুড়াৎ' শব্দ হোল। সামনে ঝুঁকে থাকা দড়িটানা দেহটাকে একটু সোজা করে কুঞ্জ পাড়ের দিকে চোখ ঘোরালো। কিন্তু কোন কিছু দৃষ্টিতে পড়ার পূর্বেই কুঞ্জর সামনে কাদার মধ্যে বিরাটাকায় একটা বাঘ এসে ধপাস করে লাফিয়ে পড়ল। স্বীয় ভারে বাঘের দেহ প্রায় বুক সমান কাদার মধ্যে সিঁধিয়ে গেল। ছত্রাকারে কাদা ছিটকে প্রায় সবার গা মাথা মাখামাখি।

সামনে যম। উপায়ন্তর না দেখে একটু ঝুঁকে গুনীন ডান হাতের তেলোয় জল তুলে মন্ত্র পড়তে উদ্যত হোল। কিন্তু বাঘ আর সে সুযোগ দিল না। মুহূর্তমধ্যে কুঞ্জর বাঁ কাঁধে থাবা বসিয়ে দিয়ে দেহটাকে তার নিকটে টেনে এনে ঘাড় কামড়ে ধরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিল।

মুহূর্তের জন্য বিহ্বল সঙ্গীরা হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়েই তাল তাল কাদা ছুঁড়ে মারতে সুরু করলো বাঘেরমুখে। প্রচণ্ড হৈ হল্লায় বাঘকে ভয় দেখাতে থাকে। বাপকে বাঘে ধরেছে। কুঞ্জর ছেলে

প্রাণফাটা আর্ত্তনাদ করছে। কিন্তু সবই বৃথা। গলায় গরগর আওয়াজে বিরক্তির জানান দিয়ে শিকার মুখে নিয়ে কাদা ভেঙ্গে বাঘ গিয়ে উঠলো খালপাড়ে। কুঞ্জর নিষ্প্রাণ দেহ ততক্ষণে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিংড়ি মাছের মত কুঁকড়ে অসাড় হয়ে গেছে।

গুনীনের পাশে ছিল যোগীন্দ্র মণ্ডল। তারপাশে পাঁচকড়ি। তারপর নির্ম্মল মণ্ডল, ফকির মণ্ডল ও অন্যান্যরা। সবাই কাদা ছুড়ে বাঘের মুখ চোখ ভরিয়ে দিয়েছে। উচ্চৈস্বরে হৈ হুল্লোড়ও কমতি ছিল না। দুর্ধর্ষ সুন্দরবনী বাঘ তা গ্রাহ্য করে না। ঘাড় ঘুরিয়ে হল্লাবাজদের দিকে একবার রোষ কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, গুনীনের দেহটা টেনে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো।

এইবার জেলের দলের মনে আতঙ্ক জেঁকে বসলো। কাদা ভেঙ্গে ছুটলো তারা খাল মুখে বাঁধা নৌকোর দিকে। পিতৃহারা পাঁচকড়ির মন বাগ মানে না। পেছন ফিরে বারবার আর্ত্তস্বরে সে তার বাপকে ডাকে। অবুঝ মনে বাঘের বাপান্ত করে। ছুটে যেতে চায় জঙ্গলে বাঘের পেছনে। অতিকষ্টে সঙ্গীরা সামলে আনে তাকে।

জাল, দড়াদড়ি পড়ে আছে খালে। গুনীনের মৃতদেহের সঙ্গে সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছেনা।

অন্য দুটো নৌকোর আর একটি জেলের দল ছিল অন্য খালে। তাদের ডাকা হোল। সলা পরামর্শ চললো কিছু সময়। তারপর চৌদ্দ জনের এক দল দা কুড়োল লাঠি সোঁটা নিয়ে এগুলো উদ্ধারকার্যে।

প্রথমে ঝাঁটি জঙ্গল লম্বালম্বিভাবে খালের দুই কিনার বরাবর। তারপর গরাণ ও গর্জন গাছের জঙ্গল। খোঁজারু দল সাবধানে এগোয় বাঘের পায়ের খোঁজ ধরে। ভেতরের দিকে বাঘ লাস টেনে নিয়ে গেছে। গর্জনের জঙ্গল ছাড়িয়ে গিয়ে সামনে গভীর হেঁতাল বন। মাঝে একটু ফাঁকা। মুখের শিকার এখানে নামিয়ে বাঘ একটু পায়চারী করেছে। সন্ত্রস্ত সেও। হয়ত পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় সে জানে দ্বিপদীরা ফিরে আসবে লাসের খোঁজে। তাই পদচারণায় তার চঞ্চলতার চিহ্ন মেলে। কি না কি ভেবে, শিকার নিয়ে বাঘ হেঁতাল বনের অলি গলির পথ ধরে গভীরে ঢুকে গিয়েছে। খোঁজারু দলের নেতৃত্বে ছিল যোগীন্দির। পরিস্থিতি আঁচ করে সবাইকে হুঁসিয়ার করে সে।

ফিস ফিস করে সলা পরামর্শ চলে আবার। হেঁতাল বন বড় বিপজ্জনক স্থান। কিন্তু বাঘের আরামদায়ক আশ্রয়স্থলও বটে। ভোজ্য নিয়ে যখন এই বনে ঘাঁটি নিয়েছে বাঘ—তখন মৃতদেহ উদ্ধারের আশা সুদূর পরাহত। সে চেষ্টায় আত্মঘাতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। অলি গলির গোলোক ধাঁধাঁর বেড়াজালে ঘেরা হেঁতাল বনের অভ্যন্তর। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় এই বন বাঘের পক্ষে খুবই অনুকূল। অন্য দিকে বাঘের পিছু লাগা মানুষের পক্ষে এই জঙ্গলে ঢুকে নিরাপদে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন।

যোগীন্দির বলে—"গতিক ভালো না। হেঁতাল বনে ঢোকার ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তার চাইতে বরং দু'দলে ভাগ হয়ে গলি ঘুজির মুখগুলো খুঁজে পেতে দেখ, লাসের কোন হদিস মেলে কিনা। তবে ভোঁদড়ের পো লাস থুয়ে পেছবার বান্দা নয়।"

তল্লাসী চললো, যে গলি দিয়ে শিকার টেনে নিয়ে বাঘ ভেতরে ঢুকেছে, সেখান থেকে সুরু করে গোটা হেঁতাল বনের চৌহদ্দি বরাবর। বাঘ হেঁতাল বন ছেড়ে গেছে এমন কোন চিহ্ন মেলে না। তা'হলে সে এতক্ষণ ঘাপটি মেরে ভোজে মশগুল আছে। এ অবস্থায় যে-কোন প্ররোচনায় প্রতি আক্রমণ অনিবার্য।

আর কোন আশা নেই মৃতদেহ উদ্ধারের। খোঁজারু দলের আবার সলা পরামর্শ হোল এবং তল্লাসীর কাজ অগত্যা পরিত্যাগ করাই সাব্যস্ত হোল। ফিরতি পথে জাল দড়ি গুটিয়ে নিয়ে নৌকো ভাসালো জেলেরা জোয়ারের প্রথম টানে। নোনা জলের টানে নৌকো বাঁক ঘোরে,—দৃষ্টিপথ থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় রাক্ষসী অরণ্যের সেই অভিশপ্ত বকুলতলার খাল। হেলেন মাঝি নৌকো সামলায়, দাঁড়ি-মাঝি দাঁড় টানে—আর দখনে হাওয়ায় বন থেকে বনান্তরে ভেসে যায় একটি পিতৃহারা পুত্রের অশ্রুঝরা ক্রন্দন ধ্বনি—'বাবাগো, তুমি কৈ গেলে? ফিরে আসো বাবা...... মাকে আমি কি উত্তর দেবো গো......তুমি ফিরে আসো।'

এ বনে যে হারিয়ে যায় সে আর ফেরেনা জানি। কত সন্তান পিতৃহারা হয়েছে, কত পিতা পুত্রহারা হয়েছে, কত নারী স্বামীহারা হয়েছে, কত রক্তাক্ত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই নোনা মাটির জলে জঙ্গলে—বান গরাণের অন্তরালে কে তার খোঁজ রাখে?

তবুও দুঃসাহসী রোমাঞ্চ পিয়াসী অভিযাত্রী, পর্যটকদের নিকট এই অরণ্যের প্রতি আছে একটি স্বতন্ত্র আকর্ষণ। যে একে চেনে জানে সে এর হাতছানিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যায় তাকে এর দুর্গমতায়, বিভোর করে রাখে তাকে শ্যামল বরণ আঁচল ঘেরা জীবন-মৃত্যুর আঙ্গিনায়, এই একটি মাত্র অরণ্য যেখানে গেলে সত্যই উপলব্ধি আসে কবি-উক্তির যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়—

যৌবনরে, তুই কি কাঙ্গাল আয়ুর ভিখারী?
মরণ বনের অন্ধকারের গহণ কাঁটা পথে
তুই যে শিকারী।

॥ ওম্ মণিপদ্মে হুঁম ॥
থিয়াং বোচি গুম্ফা
দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দিরে কি মসজিদে ভাই
প্রভেদ কিছুই নাই
একটি মসজিদ
-লক্ষ্মৌ
শম্ভুনাথ মুন্সী

॥ প্রথম প্রণয় ভীরু লাজুক ললনা ॥
জলপরী উটি
ত্রিদিব ঘোষ
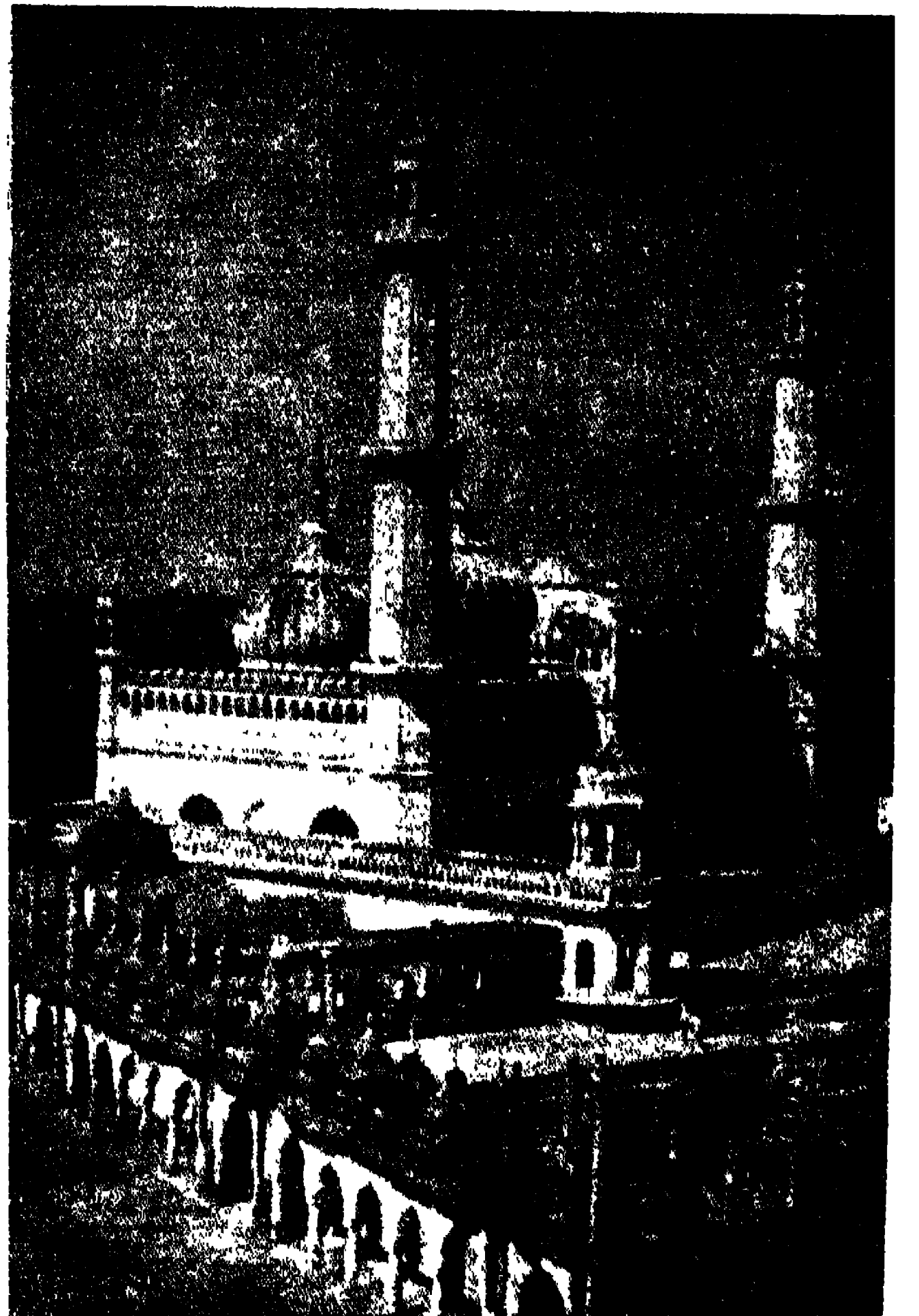
কালের কপোল তলে
শুভ্র সমুজ্জ্বল ॥
হায়দার আলি ও
সুলতানের সমাধি।
শ্রীরঙ্গপত্তম
দেবদাস লাহিড়ী
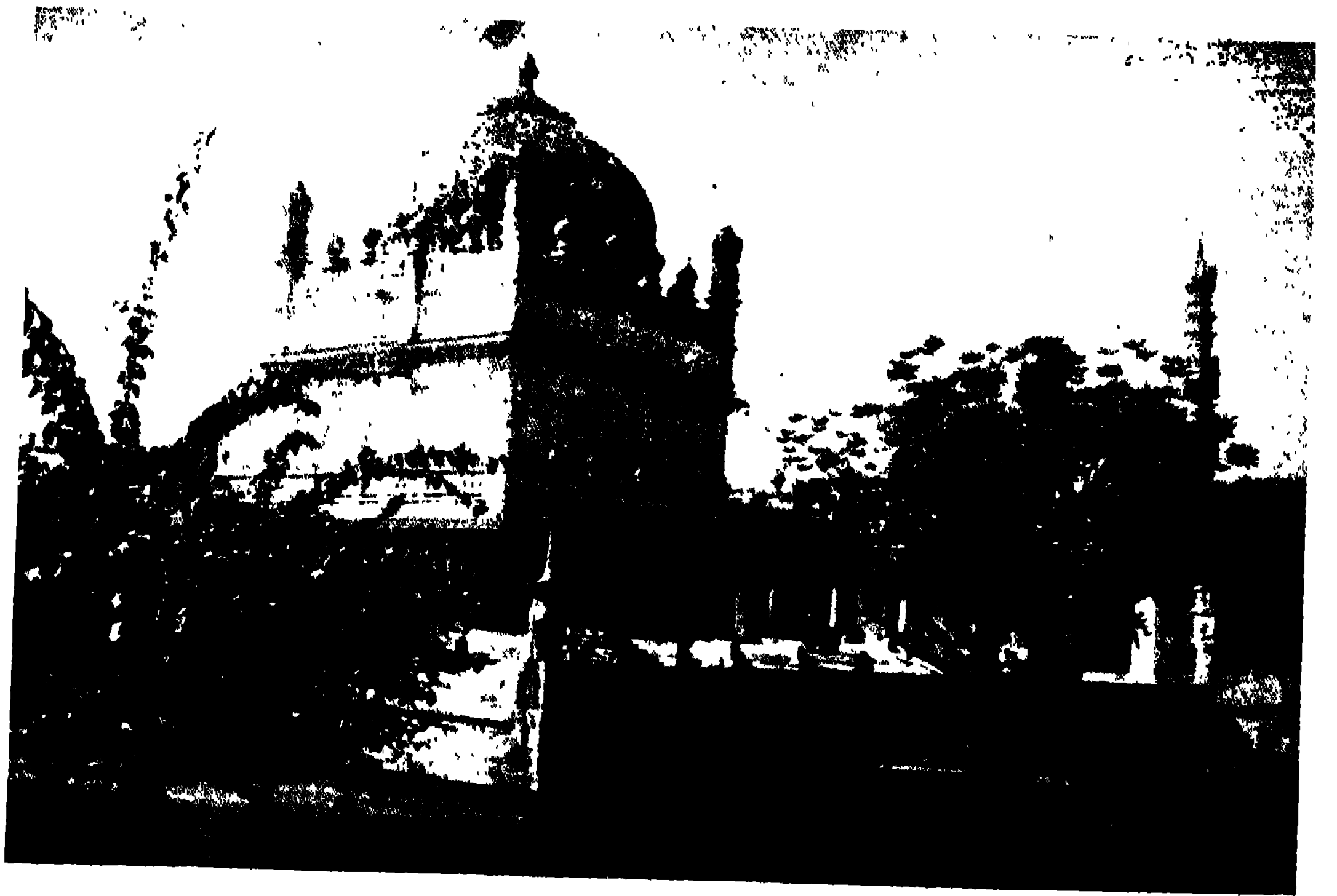
শ্রীশ্রীতিরুপতি দর্শনে

কুমারেশ ঘোষ

মাদ্রাজ থেকে রিজার্ভ বাসে রওনা হলাম তিরুপতির দিকে, শ্রীভেংকেটেশ্বর দর্শনে। পঞ্চাশ জনের লাক্সারি বাস, নরম গদীর সীট, পাশে শ্যাওলা রংয়ের কাঁচের জানলা, দুধারে নানা শস্যের গাঢ় সবুজ ক্ষেত, সামনে পীচ ঢালা অসীম রাস্তা বুক পেতে শুয়ে আছে। হুহু করে বাস চলেছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের আমরা সভ্য, সভ্যা ও কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে পঁয়তাল্লিশ জনের অনেকেই, বাসের মধ্যে ঢুলতে শুরু করেছি। আরাম-গদীর সীটে মাথা রেখে শরীরটাকে এলিয়ে মেলিয়ে বসেছি, কাজেই চোখের পাতা বুজে আসবে আশ্চর্যের কি?

হঠাৎ একটা ধাক্কায় ঘুমটা গেল চটকে. বাসটা ব্রেক কসেছে, এতক্ষণ ঘুম ঘোরে পাশের জনের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছিলাম, হঠাৎ বাসের ঝটকায় সোজা হয়ে বসলাম সবাই। জায়গার নাম পুত্তুর এবং ছোট গঞ্জটা অন্ধ্রপ্রদেশে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখন যেন মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ু পার হয়ে গেছি। অন্ধ্রর দোকানগুলোর সাইনবোর্ডে তেলেগুভাষার সঙ্গে তবু একটু ইংরাজী ভাষার লেজুর জোড়া থাকে, তাই দেখে কোথায় এসেছি বোঝা যায়। সেদিক দিয়ে তামিলনাড়ু কঠিন কঠোর, অন্য কোন ভাষার আবদার বা হুকুম তামিল করতে চায় না।

বাসটা থেমে যাওয়ার কারণ, সামনে লেবেল ক্রসিং। ট্রেন পার না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কাছেই একটা রেষ্টুরেন্টে পকৌড়ি খেলাম আর এক গেলাস কফি।

আবার চলা শুরু।

এবং বেলা চারটের সময় তিরুপতিতে এসে হাজির হলাম প্রায় একশো মাইল পথ পার হয়ে।

বাইরের বাস তিরুপতির ভেংকাটাচলম পাহাড়ে ওঠাবার নিয়ম নেই। এ ব্যাপারে দেবস্থান বাস কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার, তার কারণ পরে বোঝা গেল। পাহাড়ে বাসের রাস্তাটা বেশ সরু আর খুবই আঁকাবাঁকা। কাজেই বড় বাস নিয়ে সাধারণ ড্রাইভারের পক্ষে ঐ পাহাড়ী রাস্তায় যাওয়া বিপজ্জনক। অতএব বাসের মাথা থেকে মালপত্তর নামিয়ে কাছেই বালাজী বোর্ডিং হাউসে একটা ঘর ভাড়া করে সেগুলি গুদামজাত করা হলো, তারপর হাল্কা বিছানা পত্র, গরম জামা নিয়ে, বেলা ৫টায় একটা দেবস্থানী বাসে রওনা হলাম পাহাড়ের উপর শ্রীভেংকেটেশ্বর দর্শনে।

যাত্রী আটাশ

তিরুপতি সহরটা মাঝারি, রেলষ্টেশন আছে, বড় বড় বাড়ি হোটেল ধর্মশালা কোন কিছুরই অভাব নেই। অন্ধ্রবাসীরা লোক হিসাবে ভালই। সহরে মোটর আর বাস চলাচল খুবই। তবে গরুর গাড়ীও আছে অনেক। গরুগুলির শিং দেখবার মতো, নিটোল, ছুঁচোলো। তবে মোষগুলো সাইজে ছোট, গায়ের রং ধূসর। কালো নয়।

আমাদের ছোট বাসটা কিছুটা সমতল ভূমিতে চলে ক্রমে ভেংকটাচলম পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো। সরু আঁকাবাঁকা পথ, পথের দুধারে সাইন বোর্ডে হরেক রকম নির্দেশ—সাবধানে চলো, ইত্যাদি। বাস সগর্জনে উঠতে লাগলো পাহাড়ে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি নতুন নতুন বাড়ির মেলা বসে গেছে। বহু কলোনী তৈরী হয়েছে। বাসেতেই শীত-শীত ভাব বোধ করেছি। পাহাড়ের মাথাতে আরো ঠাণ্ডা। মনে হলো, অন্ধ্র সরকার জায়গাটাকে হিল রিসর্ট করবার চেষ্টায় আছেন। একঘণ্টা পরে সন্ধ্যের মুখে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে বাস থেকে নামলাম। জায়গাটার নাম তিরুমালা। চারিদিকে আলো, নামগান, স্তোত্রপাঠ ভেসে আসছে মাইকের মাধ্যমে। অভিনব পবিত্র পরিবেশ।

তবে ধাক্কা খেলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডে বড় একটা সাইন বোর্ড দেখে। তাতে শ্রীভেংকেটেশ্বরের পূজা ও দর্শনের সময় নির্দেশ আছে, তিরুমালার ম্যাপ আছে, কিন্তু আর যা আছে লেখা, সেটা নিয়েই মনে জাগলো সন্দেহ, ব্রাহ্মণ-বৈশ্যে বিবাহ এখানে ধর্মসম্মত, তাতে দক্ষিণা ১৭ টাকা দেয়। আর তিন মাইল দূরে আছে পাপ-বিনাশন' পুষ্করিণী, সেখানে ডুব দিলেই সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এতই সোজা ?

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সামনেই বিরাট ধর্মশালা, চমৎকার ব্যবস্থা।

জিনিষ পত্র রেখে আমরা কয়েকজন মন্দিরের দিকে এগোলাম। মন্দিরের সামনে যথারীতি দোকানের সারি। তবে প্রায় সব দোকানেই দেখি টুপি ঝোলানো, দেখলেই, বোঝা যায় ওগুলি স্থানীয় কুটীর শিল্পের নিদর্শন নয়, বাইরে থেকে আমদানী করা। কী ব্যাপার ? এতটুপি কেন ? পরে টুপি রহস্য ভেদ করলাম। বাবা ভেংকেটেশ্বরের কাছে মাথা মুড়ানো নিয়ম, তাই নেড়া মাথা ঢাকবার ব্যবস্থা।

মন্দিরের সামনে যথারীতি বিরাট সুসজ্জিত গোপুরম। আর পাশে বিরাট লাইন। অন্ততঃ দুশো লোক দাঁড়িয়ে। আমাদের আঁতকে উঠতে দেখে একজন ভাঙা ইংরাজীতে বললো, এতো ছোট লাইন। এক-এক সময় দর্শন করতে চার পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়। মেলার সময় দুদিনও লাগে। যান আর দেরি করবেন না। জুতো-ডিপোতে জুতো রেখে লাইন লাগান গিয়ে। তাই হোক, জুতো-ডিপোতে জুতো রেখে ছুটলাম মন্দিরের পেছনে লাইনের শেষে। তবে পথের ধারে বেঞ্চি পাতা

সারিসারি, আর মাথার উপরে বিজলী পাখা. আর মাথার উপরটা ঢাকা। বুঝলাম বসে বসে লাইন লাগাতেও হয়। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে গোপুরমে ভিতর দিয়ে মন্দিরের চাতালে ঢুকলাম। আলো জ্বলছে। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অয়েলপেন্টিং। তাতে শ্রীভেংকেটেশ্বরের কীর্তি-কাহিনীর চিত্ররূপ। তলায় তেলেগু ভাষায় বিবরণ লেখা. আমাদের অবোধ্য, আমরা ছবিগুলোই দেখতে লাগলাম। মন্দিরের ভেতরেই তিনচার পাক লাইন ঘুরে আসল মন্দির নজরে পড়লো। অপূর্ব! মন্দিরের বিরাট চুড়ো থেকে সর্বাঙ্গ সোনালী পাত দিয়ে মোড়া। তাতে অবর্ণনীয় কারুকার্য। দূর থেকে ফ্লাড লাইট পড়ায় সারা মন্দিরটা চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। বিশ্বের রাজা যিনি, তাঁরই উপযুক্ত মন্দির বটে।

জয় বাবা ভেংকেটেশ্বরের জয়।

দর্শন পেলাম সেই নয়নাভিরাম বিষ্ণুমূর্তির। কালো পাথরের বোধ করি কোষ্ঠি পাথরের। স্বর্ণালংকার আর রত্নাভরণে সুসজ্জিত। আমাদের সকলের কোষ্ঠি বিচারক, তাই তিনি নিজে কোষ্ঠি পাথরে আবির্ভূত। দণ্ডায়মান, দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তাতো. কপালে শ্বেতচন্দন মাথায় সোনার মুকুট। দুধারে স্বর্ণময় কারুকার্যে দুটি স্তম্ভ বিরাজমান। মাথায় স্বর্ণচ্ছত্র, পদতলে স্বর্ণপদ্ম, সুগন্ধি পুষ্পমাল্য সুশোভিত। চারিদিক সৌরভে আমোদিত।

আমরা মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলাম।

ক্ষণেকের জন্যে, পেছনের লোকেদের সুযোগ দিতে হবে। মন্দিরের বাইরে শ্রীভেংকেটেশ্বরের ছবি বিক্রী হচ্ছে। তাঁর কীর্তিকথার বই, হাতে ছবি আর বই নিয়ে চেঁচাচ্ছে ত্রিপতি, ত্রিপতি—

ঠিকই তো। তিরুপতি মানে ত্রিপতি। স্বর্গ, মর্ত, পাতালের পতি। বইতে লেখা এই শ্রীভেংকেটেশ্বর ত্রেতা যুগে হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আর এই কলিযুগে শ্রীভেংকেটেশ্বর।
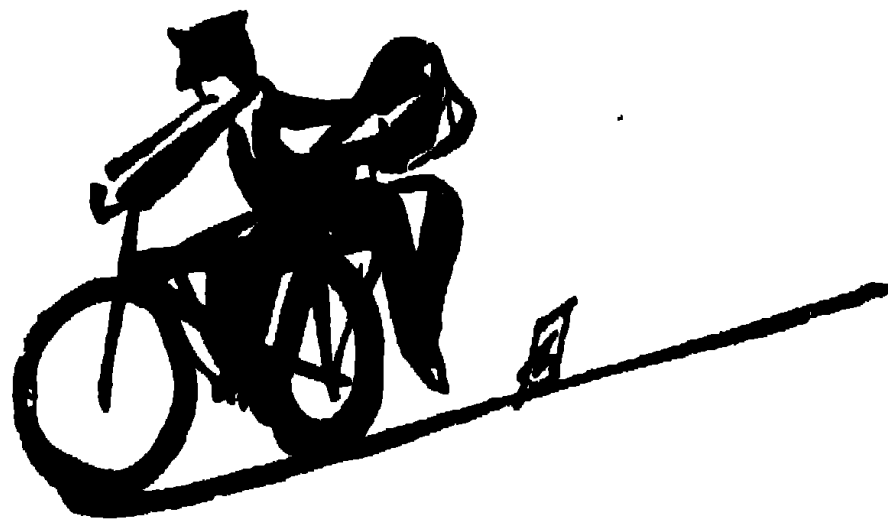
রাঙা মাটির পথে পথে

সুশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের আলো তখন সবে ফুটেছে।

ট্রেন এসে থামে বাঁকুড়া।

কোন রকম ঠিক না করেই বেরিয়ে পড়া একেবারেই হঠাৎ। অবশ্য ট্রেনে বসেই ঠিক করেছিলাম যাব ঝিলিমিলি, বাঁকুড়ার কংসাবতী অঞ্চলে—সুবিধামত বিষ্ণুপুরও ঘুরে নেব—ঘুরব রাঙামাটির পথে পথে।

বাঁকুড়ায় নেমে, ঝিলিমিলির বাসের খবর নিয়ে জানলাম, ইতিমধ্যেই বাস ছেড়ে গেছে—পরের বাস ছাড়বে, কিছুক্ষণ পরে। বাঁকুড়ার তামলীবাঁধ অঞ্চল থেকেই সব বাস ছাড়ে, ব্যবস্থা খুবই ভাল।

বাস ছাড়ে ঝিলিমিলির, রানীবাঁধ পেরিয়ে গিয়ে, কাঁসাই নদী পার হওয়া বেশ উত্তেজনায় ভরা। নদীতেই বাস নেমে যায়—ধীরে ধীরে নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছায়—এটাই যাতায়াতের নির্দ্দিষ্ট করা পথ। নদীতে পাথর ফেলে বাস চলাচলের উপযোগী রাস্তা করা হয়েছে।

কাঁসাই পার হয়ে কিছুটা যাবার পর শুরু হয় জঙ্গল--নাম বারমাইলের জঙ্গল—শাল, সেগুন, মহুয়া আর পিয়াল গাছে ভরা। নানা রকম জন্তুদেরও দেখা পাওয়া যায় এ জঙ্গলে—ছোটখাট বাঘের সংগেও মোলাকাত হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ইন্দ্রপুর, মালিয়ান, খাতড়া পার হয়ে পৌঁছে যাই ঝিলিমিলিতে। সময় লাগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। এটা ঘুর পথের বাস, তা না হলে তিন ঘণ্টায় পৌঁছান যায়। মনে হয় ঘুর পথে এসে ভালই করেছি, তা না হলে ফাউ হিসাবে রাঙামাটির পথের এইসব ছোটখাট অনেক গ্রামের সংগেই পরিচয় হ'ত না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কল্যাণ নিকেতনের যুবনিবাসে থাকার জায়গা পেলাম। সুন্দর ব্যবস্থা—প্রতিষ্ঠানটিও বেশ বড়। স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যেই রয়েছে যুবনিবাস, অতিথি নিবাস, পঞ্চায়েত, পাঠাগার, ডাকঘর এ ছাড়াও চাষের জমি—নিজেরাই চাষ করছেন। সকলের চেয়ে ভাল লাগল এখানকার বিজ্ঞান প্রদর্শনী মন্দির।

ঝিলিমিলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার মত। দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলান সবুজমাঠ—চাষ

হয়েছে। আবার অন্যদিকে জঙ্গল—তার মাঝে মাঝে আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রাম। আদিবাসীদের বাড়িগুলি দেখারমত, চিক্কণ আর মসৃণ মাটির দেওয়াল—মনে হয় সিমেণ্টের তৈরী—গায়ে নানা চিত্রাঙ্কণ—ফ্রেস্কোর এক নতুন সংস্করণ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

পরের দিন ঝিলিমিলি থেকে খাতড়ায় এসে গোরাবাড়ীর বাস ধরে এলাম মুকুটমণিপুর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখার মত। এখানেই রয়েছে প্রসিদ্ধ কংসাবতী ব্যারেজ।

বাস যেখানে থামে সেখানেই টিলার ওপর রয়েছে সেচবিভাগের বাংলো—"কংসাবতী ভবন"—আর একটু দূরে বাঁধের পাশ দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে—তার ধারেই পড়বে ইয়ুথ হোষ্টেল।

ব্যারেজ দেখতে বার হই। কংসাবতী আর কুমারী এই দুই নদীর জল এক হয়ে বয়ে চলেছে—আর তারই উপর গড়ে উঠেছে এই বিরাট পরিকল্পনা—না দেখলে এর বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

কংসাবতীর কাজ শেষ হলে, বাঁধের উপরের রাস্তা দিয়ে সহজেই পৌঁছান যাবে কাছের প্রসিদ্ধ গ্রাম—অম্বিকা নগরে,—অবস্থিতি কংসাবতী আর কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলের কিছুটা দক্ষিণে—গ্রাম বেশ সমৃদ্ধ—রানীবাঁধ থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

অম্বিকা দেবী থেকেই বোধ হয় গ্রামের নাম হয়ে থাকবে—অম্বিকানগর—কেননা, এখানে এখনও ভৈরব শিবের পাথরের মন্দিরের পাশেই অম্বিকা দেবীর মন্দির—কিছুটা ভগ্ন। অনেকের মতে, এখান থেকে মাইল দুই পশ্চিমে পরেশনাথ। জৈন তীর্থ হিসাবে এখানে জৈনদের এক শক্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল, তাঁদেরই উপাস্যদেবী অম্বিকা কালক্রমে কেমন করে এখানে হিন্দুদেবী হিসাবে পূজা পেয়ে আসছেন।

সারা বাঁকুড়া জেলায়, মুরগীর লড়াই আমোদ প্রমোদ হিসাবে খুবই জনপ্রিয়। মুকুটমনিপুর থাকার সময় কাছের গ্রাম দোপাট্টতে এ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সাধারণতঃ দুটো মোরগের পায়েই বাঁধা থাকে ছোট ছুরি। তারপর একটাকে অপর পক্ষের মোরগের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহত হয়ে যে মোরগ রণে ভঙ্গ দেয়, তাকেই বিজিত বলে ধরে নেওয়া হয়। যার মোরগ বিজয়ী হয় সে সেই বিজিত মোরগ পেয়ে যায় আর তার সংগে বাজীর টাকাও বটে। মুরগীর লড়াই দেখার কৌতূহলে বেশ ভীড় জমে যায়। ভীড়ের ভিতর আবার দলাদলি—দু'পক্ষ—নিজ নিজ পক্ষের মোরগকে উৎসাহিত করে চলেছে। উপভোগ করার মত।

এখান থেকেই পৌঁছাই মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে। ইতিহাসের অতীত থেকে সেই সব নাম মনে পড়ে বীর হাম্বীর, মহাবীর, চৈতন্যসিংহ। মল্লরাজাদের অতীত কীর্ত্তির অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে এখানে। এত পুরাকীর্ত্তিবহুল স্থান বাংলাদেশে বোধ হয় আর কোথাও নেই। পুরাকীর্ত্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যারা, তাদেরই সংখ্যা হয়ত দাঁড়াবে পঞ্চাশের কাছাকাছি।

প্রথমেই এর বাঁধ বা দীঘি। সাধারণতঃ বাঁধ বলেই স্থানীয় অঞ্চলে পরিচিত—লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ—সাবেক নাম যার বীর বাঁধ। আরও হয়ত আছে কয়েকটা। মল্লরাজারা সাধারণতঃ রাজধানী সুদৃঢ় করার জন্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে এসব তৈরী করেছিলেন, সাধারণ মানুষের জলকষ্ট দূর করার জন্যও বটে। যতদূর জানা যায় সবগুলি বাঁধই তৈরী করান মল্লরাজ দ্বিতীয় বীরসিংহ।

শহরের দক্ষিণ দিকে রয়েছে দলমাদল কামান। মারাঠাদের সংগে যুদ্ধের ইতিহাস মনে পড়ে—মনে পড়ে এই যুদ্ধে ভাস্কররাও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যান।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায়, বাংলাদেশে এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই এই সময়েই তৈরী হয়েছিল বহু ইটের মন্দির—নানা অলংকরণের সংযোজন হয়েছিল সেইসব মন্দিরে, আর বিষ্ণুপুরের এই সব মন্দির যার অলঙ্করণ দক্ষতা কালক্রমে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

টেরাকোটার সেই সব শিল্পীরা মন্দির অলঙ্করণে নানা পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন, এঁকেছেন সামাজিক জীবনের নানা চিত্র। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে বিষ্ণুপুরের শাঁখারীপাড়ায় অবস্থিত মদন মোহনের মন্দিরে। সমস্ত বিষ্ণুপুরের মধ্যে বোধ হয় এই একটিমাত্র মন্দির, যেখানে বিগ্রহ রয়েছে—ব্যবস্থা রয়েছে নিত্য পূজার। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষনীয় বলে মনে হয়েছে মৃণ্ময়ী মন্দির, শ্যামরায় মন্দির, জোড়বাংলা আর লালজী মন্দির। আর ভিন্ন গঠন শৈলী হিসাবে রাসমঞ্চ।

আমার রাঙামাটির পথে পথে এই ভ্রমণ একেবারেই হঠাৎ এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে এই ভ্রমণ বিবরণ দীর্ঘ হবে। তবুও দু'একদিন ছুটিতে কাছাকাছি যে এত সুন্দর বেড়াবার জায়গা রয়েছে তার পূর্ণ পরিচিতি আমার কাছে অজানা ছিল।

—)●(—

পায়ের সঙ্গে মন হাঁটে

কুমার মুখোপাধ্যায়

তারপর ?

তারপর আর কি ! বেরিয়ে পড়লেম পথে, পদযাত্রায়। পরণে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পায়জামা, কাঁধের ঝোলাতে দৈনন্দিন ব্যবহারের কিছু জিনিষপত্র কিছু রসদ। কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না যে জিনিষটা, সেটা হোল, গ্রাম বাংলাকে দেখার উদগ্র বাসনা। শুধু ভৌগলিক দেশ নয়, চিণ্ময়ী দেশ—গ্রামের মানুষ। সুখে, দুঃখে, আনন্দ বেদনাভরা জীবনকে দেখবো বলেই পথে নেমেছি—পথকে ঘর করেছি।

হাওড়া জেলার মাজুগ্রামের শিক্ষিকা সুনীতি মান্না পথ থেকে ডেকে এনেছিলেন। পরিপাটি অন্ন-ব্যঞ্জনের আয়োজনের সামনে বসে তিনি অপরিচিত এক ভ্রাম্যমানকে আপ্যায়িত করছিলেন। মৃদু হেঁসে বললেন—'গল্পে পড়েছি এই ধরণের মানুষের কথা। আজ স্বচক্ষে এই রকম একজনকে দেখলাম। সত্যিই খুব আশ্চর্য্য লাগছে, যখন সারা বাংলাদেশ পূজোর আনন্দে মেতে উঠেছে, আপনি কিনা তখনই পুরো পথ পায়ে হেঁটে হাওড়া-হুগলীর গ্রামে গ্রামে অপরিচিত পরিবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? আর একেবারে নিঃসঙ্গ ?' কৈ নিঃসঙ্গ নয় তো ! এইতো এত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে, কত দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ঘটছে, কত সুখ দুঃখের কাহিনী, ইতিহাস, কত স্মৃতি আমার নিত্য সঙ্গী। একা কৈ ?

শিক্ষিকা সুনীতিদি বাড়ীর বাইরে এসে পদযাত্রার শুভ কামনা জানালেন। পরিত্যক্ত মার্টিন রেল পথের মাজু ষ্টেশনের ধারে হাটতলা পেরিয়ে ভাঙ্গা খোয়ার অমসৃণ পথ—যতদূর দৃষ্টি চলে দুপুরের রোদে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই পথে কেটে গেছে দুদিন। পুজোর ঠিক আগেই কদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণে গ্রামের পথ ঘাটের অবস্থা সঙ্গীন। রওনা হয়েছি হাওড়া ময়দান থেকে পুরানো মার্টিন রেলপথের নিশানা ধরে। এক সময় চিমনীর ধোঁয়া, ধূলো পার হয়ে সবুজ বনলক্ষ্মীর আঁচলে ঢাকা পড়ে গেলেম। পায়ে পায়ে পার হয়ে গেলাম বালটিকুরী, শলপ্, কাটলিয়া। বর্ষণ শেষে শরৎ প্রকৃতি আরও ঘন সবুজ হয়ে রয়েছে। কোলাহলের রাজ্য থেকে একেবারে নির্জ্জনতার গভীরে চলেছি। শুধু কোথাও একটু আধটু তাঁত বোনার শব্দ, একটানা বসন্তবৌরী পাখীর ডাক অথবা ডোবার পাটপচার কালো জলে হাঁসের ডাক।

একটানা ন' মাইল চলে সন্ধ্যার মুখে ক্লান্ত চরণে ঢুকলেম মাকড়দহ গ্রামে। আজ হাটবার। হাটুরে দোকানী, সিনেমা দর্শকের কোলাহলে হঠাৎ দেখা শ্রীবাস দলুইএর সঙ্গে। কোঁচড়ের মুড়ি খাওয়া বন্ধ করে নিষ্কর্মা শ্রীবাস একদৃষ্টিতেই বুঝে নিয়েছে—এ মানুষটি ভিনদেশী।

—"আজ্ঞে রাত কাটানোর ভাবনা কেন করেন? ভেবে দেখুন মায়ের স্থানে রয়েছেন যখন। মায়ের আমাদের কত দয়া—শুধু মন-প্রাণ সমপ্পন্ করে চাইলেই হয়।"

সত্যিই মাকড়চণ্ডী দেবীর কত দয়া। নাটমন্দিরে রাতের আশ্রয় মিললো। দেবীপুকুরে হাত মুখ ধুয়ে, মায়ের রাতের আরতি শেষে প্রসাদ জুটলো। পুরোহিত ভবতারণ ঘোষাল হাত পাখা নাড়তে নাড়তে বললেন—"বড় প্রাচীন এই মন্দির। শোনা যায় শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠীত। তখনকার দিনে সরস্বতী নদী এখান দিয়েই বয়ে যেতো। এখন মজে গিয়েছে লোকে বলে খাল। কচুরী পানা আর শ্মশানের পোড়া ছাইতে বোঝাই। শাল্‌তি চলে পাট বোঝাই হয়ে। আমরা এদিকপানে ঐ ছোট নৌকোকে শাল্‌তি বলি। এও শোনা যায়—সপ্তগ্রাম বন্দরে বড় বড় সদাগরী জাহাজ এই পথ দিয়েই যাতায়াত করতো। —এই মশার জ্বালায় দু'দণ্ড কথা বলার সুখ নেই।"

ঘোষালের অনাবৃত পিঠে সশব্দে চপেটাঘাত পড়লো।

আবার পথ চলি। সকালের রোদে মাইল চারেক হাঁটি, দুপুরে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম, আবার সন্ধ্যার মুখে কোন গ্রামে আশ্রয়ের সন্ধানে ফেরা। বারো মাইলের মাথায় আবার সেই মজা সরস্বতী নদীর বাঁকে ডোমজুড় গ্রাম। ছোটবেলায় শিশুপাঠ্য ভূগোলের মুখস্ত করা অংশ মনে পড়ে গেল—"ডোমজুড় গ্রাম পাটের ব্যবসা, হুঁকার খোল, শোলার টুপীর জন্য বিখ্যাত। এইস্থানে বহু পানের বরজ আছে।"—হ্যাঁ, ঠিকই, সব মিলে যাচ্ছে। পুরানো মার্টিন ষ্টেশনের কাছে আবার সেই দোকানীদের কোলাহল। দূর থেকে ভেসে আসছে সিনেমা হাউসের দুপুরের প্রদর্শনীর গান। কোথায় যেন পড়েছিলেম—কোন গ্রামের উন্নতি হোয়েছে বোঝা যায় দুটি ঘটনায়। এক, সেখানে সিনেমা হাউস খোলা হোয়েছে কিনা, আর দুই, প্রেমজ বিবাহ চালু হোয়েছে কি না। এ নিরীখে এরা আর গ্রাম পদবাচ্য নেই।

বড় বড় শিশুগাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল বড়গাছিয়া গ্রামে। পেরিয়ে এলেম থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সব-রেজিষ্ট্রী অফিস, ডাকঘর। আঠার মাইলের মাথায় কমলাপুর গ্রাম। বদ্যিপাড়ার মস্ত মজা দীঘির বাঁধানো ঘাটের রাণায় ঝোলা নামিয়ে শীতল জল মুখে চোখে দিতেই ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে গেল।

—"জ্যাঠা তোমায় ডাকচে"।

ভাঙ্গা চিমনি ঢাকা হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোতে একটি লাজুক কিশোরীর দুটি ডাগর চোখ অবাক করলো।

তোমার শরণ ভিন্ন যে নেই
এই অভাগার অন্য গতি
বৈদ্যনাথ মন্দির
- গরুড়
শিবনাথ পাঁজা
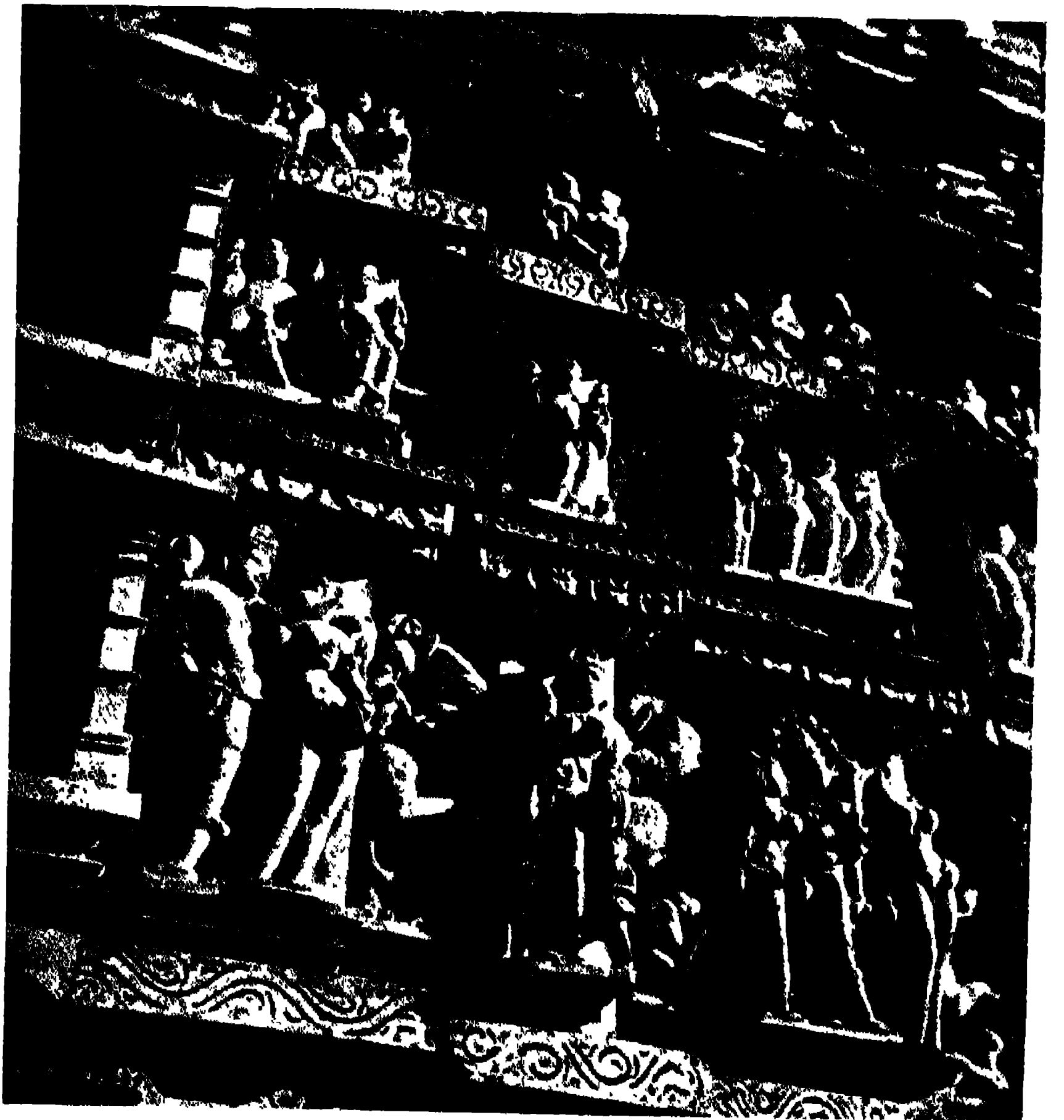
॥ ভাব পেতে চায় রূপের
মাঝারে অঙ্গ ॥
খাজুরাহ
অনুরূপ চট্টোপাধ্যায়
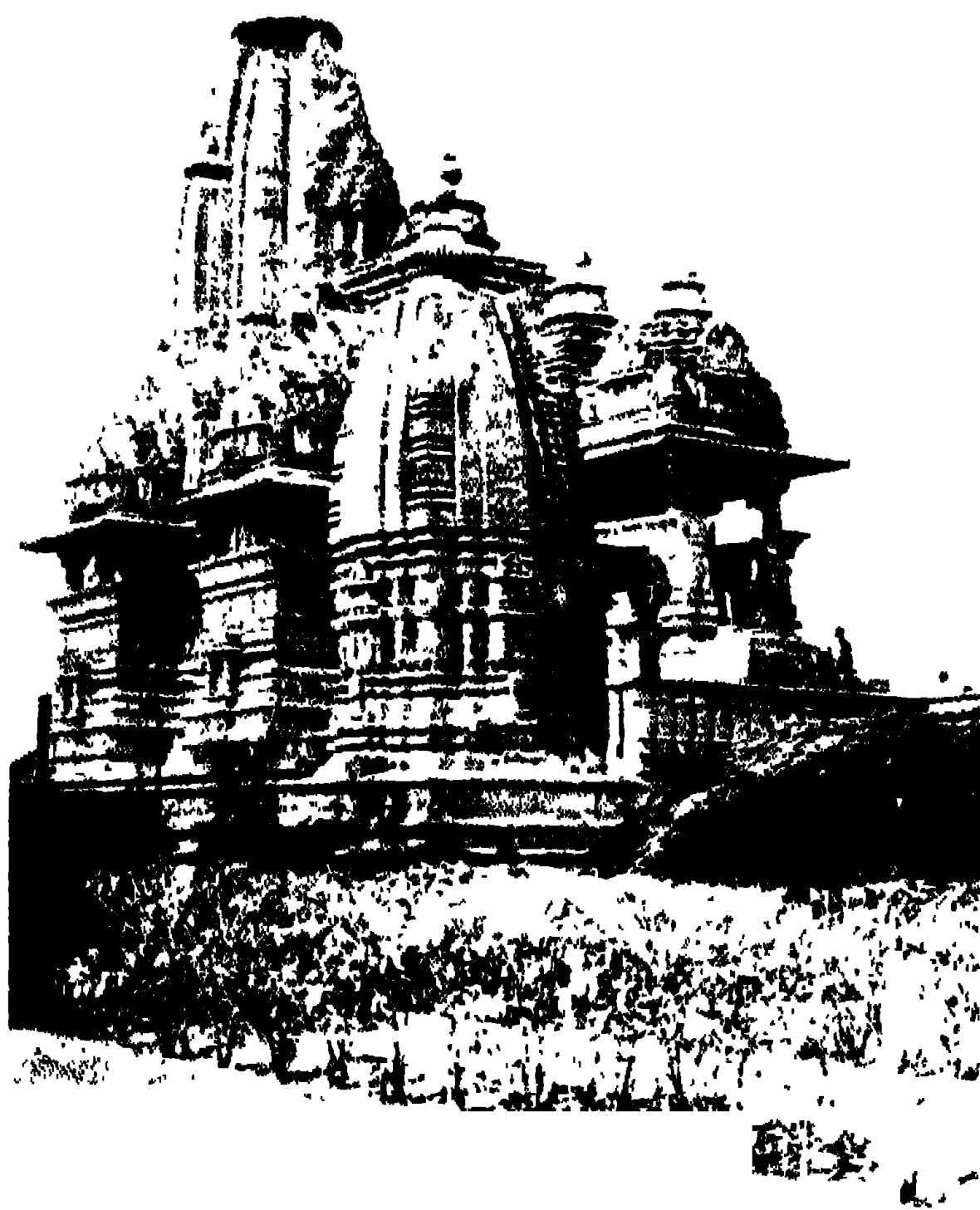
তব মন্দির স্থীর গম্ভীর।

কাণ্ডেরীয় মহাদেও মন্দির

খাজুরাহ

তারানাথ দাস

ভাব হতে রূপে অবিরাম

যাওয়া আসা।।

টেরাকোটা-গণপুর

(বীরভুম)

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। গয়া, কাশী, দিল্লী, আগ্রা, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ছেড়ে এই সব গণ্ডগ্রাম দেখে কি এমন আনন্দ পাবেন ? তাছাড়া রাত বিরেত, সাপ-খোপ, অজানা নিরাশ্রয় আপনি—এ কেমনতর ভ্রমণ আপনার ? তা যাইহোক, কাউকে কিছু অদ্ভুত কাজ করতে দেখলে আজও লোকে বলে 'আত্মারাম সরকারের ভেল্কি' শুনেছেন বোধ করি, এই গ্রাম সেই বাংলার বিখ্যাত যাদুবিদ্যাবিশারদ আত্মারাম সরকারের বাসস্থান। আসুন আমার বাইরের ঘরটাতে, কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে রাতটা কাটিয়ে দিন।" প্রবীন শিক্ষক গদাধর পাড়ুইএর অর্দ্ধভগ্ন একতলা বাড়ীটাকে ঘিরে ক্রমশঃ কমলাপুর গ্রাম নিশুতি হোয়ে আসে।

এবার দৃশ্যপট আরও বদলে গেছে। তৃতীয় দিনের সকাল হোলো একুশ মাইলের মাথায় মুন্সীরহাটে। দুধারে সবুজ ধানের ক্ষেত। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় 'এমন সোনার ধানে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ?'

মাঝখানে একটানা পিচের পথ বিধবার নিরাভরণ সিঁথির মত।

পথ বাঁক নিয়েছে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে। সাঁকোর নিচে আলের ধারে ঘুনী পেতে বসে আছে সতর্ক দৃষ্টিতে মজিদের ছোট ছেলে নছিম। ঘষা শ্লেটের মত আকাশের নিচে বিশাল উন্মুক্ত খোলা মাঠে তার মুখোমুখি দাঁড়ালেম।

—"তুমি কি বড়পূজোতে কুটুমবাড়ী এয়েচো ? এবার বামুনপাড়ার পূজোতে খুব ঘটা নেগেচে। দুদিন যাত্রা, একদিন বাইনাচ, ভাসানের পরদিন মেজিক্। আমার বাপ বলেচে, মাছের ভাল বিক্রী বাটা হলে মাজুর হাট থেকে নতুন ইজের কিনে দেবে।"

ঝুঁকে পড়া বাঁশডাল আর দামে ভরা মজা কানা নদীর ধার দিয়ে মেঠো পথ উঠেছে মাজু পাঠাগারের কাছে। এখানেই পিছনে রেখে এসেছি সুনীতিদিকে। চতুর্থ দিনের পথ সুরু হোলো মাজু হাট পেরিয়ে। কিন্তু সামনে পথ বন্ধ। কেঁদোর বিশাল জলা আশ্বিনের বর্ষণে দুকূল ভাসিয়ে পথ মাঠ-ঘাট সব একাকার করে দিয়েছে।

অতঃপর কেঁদোর জলায় সরু এক পান্সীতে ভেসেছি। দাঁড়ে বসে আসে সন্ন্যাসী সর্দ্দার।

—'আজ্ঞে, বললে আপনি পেত্যয় হবেন না, বলবেন, সন্নিসি, তোর ছোট মুখে বড় কথা। তা আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে এই বুড়ো বয়সেও লাঠি ধরলে বিশ জোয়ানের মওড়া নিতে পারি। আজ্ঞে না, আমার আর ঘরদোর কোথা ? পরিবার গত হয়েছেন। মেয়েটাকে ধান চাল ভরা ঘরেই দিয়েছি। তা' মনে করুন, মাজুহাট থেকে বর্ষাবাদলের দিনে রামচন্দ্রপুর পার করে দিলে জন পিছু আট আনা পাই। কোন রকমে গুরুর চরণ ভরসা করেই"—

বিশাল কেঁদোর জলা। একমুখ ঠেকে আছে তারকেশ্বরের কাছাকাছি। স্বচ্ছ জলে তলভূমি দেখা যায়। মানুষ প্রমাণ ধানগাছ, জলে ডুবে আছে। জলের ওপর মাথা জেগে আছে ছেঁচকো। সাদা শালুকের সমারোহ এদিক ওদিকে। কোমরে হাঁড়ি বেঁধে মাছ ধরছে বাউরী মেয়েরা। হ্যাঁ, সাপ আছে বৈকি! তবে জলের সাপে ভয় নেই। সন্ন্যাসী বলে। শরতের সোনালী রোদে নির্মেঘনীল আকাশ ঝুঁকে পড়েছে রামচন্দ্রপুরের গ্রামের ওপর—কোনাকুনি তিন মাইল পান্‌সী চলে তরতর করে জল কেটে।

দ্রুত পা চালিয়েও বত্রিশ মাইল দূরে আমতাতে পৌঁছান গেল না। রাত হয়ে গেল এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে, শিমলে-বাইনান। আধখানা চাঁদের আলোতে নিশুতি রাতে দোকান-বাজার বাড়ী-ঘর কিছুই নজরে এল না। দূরে মাঠে একপাল শেয়াল হল্লা করে ডেকে উঠলো। একটিও মানুষ পথে চোখে পড়লো না। গ্রামের একদল কুকুর হঠাৎ পিছনে চীৎকার করে ভাবী বিরক্ত করতে সুরু করলো। অনেক দূরে একটা আলো লক্ষ্য করে খালের তীর ধরে পা ফেলে এগিয়ে চললেম। ক্রমশঃ এক বুকফাটা কান্নার শব্দ কানে আসতে লাগলো। আধ ঘণ্টার পথ পৌঁছে দিলো সেই খালধারে শিমলে-বাইনানের শ্মশানে। এক সদ্য বিধবার স্বামীকে দাহের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গ্রামের বিধবা কয়েকজন যুবতী মেয়েটির সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে বড় ব্যস্ত। নোয়া-শাঁখা ভেঙ্গে ফেলে রেখে তারা মেয়েটিকে নিয়ে অন্য পথে চলে গেল। অর্দ্ধজ্বলন্ত চিতাটির দিকে চেয়ে তাদের কথা কানে এল—'আমাদের সঙ্গে যাওয়া তো আর আপনার চলে না। ঐ কোনরকম শ্মশানের একপাশে রক্ষাকালীতলার বেদীর একপাশে গড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দ্যান।"

জীবনে এমন রাত বোধ করি খুব বেশী আসে না। যে রাতে দুঃখ করা চলে না ভয়কে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়। একটু পরেই চাঁদ অস্ত গেল। নির্জ্জন খালধারের নিশুতি অন্ধকারের সেই শিমলে-বাইনানের শ্মশান—জ্বলন্ত ভাঁটার মত চোখ নিয়ে আশেপাশের শেয়ালেরদল অর্দ্ধদগ্ধ শবের সন্ধানে—থমকে দাঁড়ানো একটা বেঁজী—দূরে কোন্ তালগাছের মাথায় শকুনের ছানার বিকৃত কান্না—এদিক ওদিকের কত অস্ফুট শব্দ—কত অদৃশ্য প্রাণীর নিস্তব্ধ চলাফেরা আর সেই রক্ষাকালীর বেদীর পাশে ফণিমনসার ঝোপের ধারে হাত পা গুটিয়ে বসে শুধু নিজের নিশ্বাসের আর হাত-ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজ শোনা।

বেশ ছোটখাটো এক জনসভার আয়োজন হয়েছে মেলাইচণ্ডীর মন্দির প্রাঙ্গণে। আমতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছেন। মালা, ধূপ, ফুল, মাইক সবই প্রস্তুত। সেবাইতদের পক্ষ থেকে একজন সদস্য আমায় হাওড়া জেলায় পরিভ্রমণরত বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন—আবেগকম্পিত স্বরে বললেন—'আমাদের এই বিখ্যাত মেলাইচণ্ডীর ইতিহাস আপনারা জানেন। দামোদরের ওপারে জয়ন্তী গ্রামে মা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। কিন্তু বর্ষার প্লাবনে পূজোর অসুবিধে ঘটায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে

এপারে চলে আসেন। এক বণিকের লবণ বোঝাই নৌকা দামোদরের গর্ভে ডুবে যেতে বণিক লবণশুদ্ধ নৌকা উদ্ধারের আশায় মা'র কাছে মানত্ করেন। মা'র বরে বণিকের প্রার্থনা পূরণ হওয়ায় আজকের এই মন্দির তিনি নির্ম্মাণ করে দেন। এটি হাওড়া জেলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। গায়ের একটি লিপি থেকে জানা যায়, এর নির্ম্মাণ সময় ইংরেজী ১৬৪৯ সাল। আমরা দেশ-বিদেশ ঘুরতে যাই। ঠিক কথা, কিন্তু নিজের জেলাকে কতটুক জানি—কতটুকু জানি এর ইতিহাস—

আবার পথ। আমতা বন্দরে দামোদর পার হয়ে সবুজ সমৃদ্ধ গ্রামীন পথ। কিছুটা শ্রীময়ী গ্রামগুলো। লক্ষ্য গড়-ভবানীপুর গ্রাম। একচল্লিশ মাইলের মাথায় ক্লান্ত পদযুগল বিশ্রাম পাবে। আজ বিজয়া। ঘর ছেড়ে এলেও বিদায়ের উদাসী সুর বাতাসে—ঘরছাড়া পথিকের মনে।

—"এই যে দেখছেন গড়-ভবানীপুর, এ বড় প্রাচীন গেরাম। তা' ধরুন পাঁচশো বছর আগের ব্যাপার। তবে ইলেক্‌টিরি এসে হঠাৎ উন্নতি হয়ে গেল সবে এয়েচে। উই বাজারের পথে মণিনাথ মহাদেবের মন্দির। বাবার আদিথান্। আর হোথা ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে গেলে সেই রাজবাড়ীর ভাঙ্গা এস্তুপ্ পড়ে আছে। তবে সাবধানে সেথায় ঘোরাঘুরি করবেন। ভারী সাপের আড্ডা। একেবারে জাত কেউটে আর গোখরো। দিনমানেই আমরা ভয় পাই। আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজবাড়ীর সে সব অনেক কাহিনী। অতশত মনে রাখা মানে, মুরুক্ষু মানুষ—"

ঠিকই বলেছে চাষী ভৈরব সাঁপুই। সে সব অনেক কথা। প্রায় হাজার বছর আগের কথা। আজকের এই ভুরশুট্ পরগণা সে যুগের ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য। আজকের, হাওড়া, হুগলী আর মেদিনীপুর জেলার বিরাট অংশ নিয়ে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য। ভূরি ভূরি অর্থাৎ প্রচুর ধনী শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের আবাসস্থল, তাই তো নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ। আদিশূর বংশের যামিনীশূর যখন গড় মান্দারণের রাজা, তাঁরই অধীনে সামন্ত নরপতি কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাস ভূরিশ্রেষ্ঠ শাসন করছেন। তাঁরই নামে পাণ্ডুয়া বা আজকের পেঁড়ো। পেঁড়োর গড়ে তাঁর রাজধানী কানা নদীর তীরে, আজ প্রায় কিছুই নেই। খাজুরাহো অঞ্চলের চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা গৌড় জয় করে বন্ধুত্ব করলেন পাণ্ডুদাসের সঙ্গে। এর পরে ব্রাহ্মণসন্তান চতুরানন নিয়োগী এবং তারপরে তাঁর জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা হন। রাজধানী হোলো দামোদরের তীরে গড়-ভবানীপুর। নবাব মুর্শিদকুলীর সাহায্যে বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র গড়-ভবানীপুর দখল করেন। এতো সেদিনের কথা। রায় গুণাকর মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় এই রাজবংশের শেষ সন্তান।

—'এই দেখুন মণিনাথ মহাদেব। হাজার বছরের প্রাচীন শিবলিঙ্গ। মাঝখানে চিড় খেয়ে ফেটে গেছে। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের গৃহদেবতা। কত উত্থানপতনের সাক্ষী।" স্থানীয় পাঠাগারের সম্পাদক দুলাল দত্ত আবার বললেন—"কিন্তু গড়-ভবানীপুরের গৌরব, রানী ভবশঙ্করী। চলুন পনের মাইল দূরে বাসডিঙ্গা গড়ের দেবমন্দিরে।" সে আর এক কাহিনী—

যাত্রী ● আটত্রিশ

রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের বিধবা বত্রিশ বছরের অসামান্যা সুন্দরী রানী ভবশঙ্করী। পাঠান সর্দ্দার ওসমান খাঁ অনুরোধ করলেন—আসুন রানী সাহেবা। আমরা দুজনে একত্র হয়ে মোগলবাদশা আকবরকে অস্বীকার করি। রানী দৃঢ়স্বরে দূতকে বললেন, চিকের আড়াল থেকে—না। মোগল সম্রাটকে আমি শুধু বার্ষিক একটি আশরফি, একটি ছাগল ও একখানি কম্বল রাজকর দিই। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। কার্য্যতঃ ভূরিশ্রেষ্ঠ স্বাধীন রাজ্য।

বাসডিঙ্গা গড়ের মন্দিরে সেই অমাবস্যার রাতে গাঢ় অন্ধকার। রানী এসেছেন উপবাসী হয়ে পূজা দিতে। এমন সময় পাঁচশো মশালের আলোয় 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি তুলে পাঠান সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়লো রানীকে অপহরণ করতে। একলহমায় ভবশঙ্করী কোমরে শাড়ী জড়িয়ে লাফিয়ে উঠলেন ঘোড়ার পিঠে। অন্ধকারে তাঁর দুচোখ জ্বলতে লাগলো। আকাশে খোলা তরবারি উঁচিয়ে রানী চীৎকার করে বললেন 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্'। বল্লম্, ঢাল, তরবারি নিয়ে অমিত বিক্রমে ভূরি শ্রেষ্ঠের বাঙ্গালী দেহরক্ষী সৈন্যেরা পাঠানদের আক্রমণ করলো। বিধ্বস্ত হোলো বিপুল পাঠান-বাহিনী। ওসমান নারীর ছদ্মবেশে শিবিকা নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। উপবাসী ভবশঙ্করী রক্তাক্ত কলেবরে পূজা সাঙ্গ করলেন। গড়-ভবানীপুরে মণিনাথ মন্দিরে জয়ধ্বনি উঠলো 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।'

দিল্লীতে সম্রাট আকবর সোল্লাসে বললেন—সাবাস্ রানী সাহেবা! আজ থেকে তোমার উপাধি 'রায়বাঘিনী'। গড়-ভবানীপুরে জয়ধ্বনি উঠলো—রানী ভবশঙ্করীর জয়।

গড়-ভবানীপুর পার হয়ে পেঁড়ো বসন্তপুরের মেঠো পথ। পথে সেই ধানক্ষেতের মাঝে বিশাল ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজপ্রাসাদের দোতলা পর্য্যন্ত অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র অশথ, বট, পাকুড় গাছে ঢাকা ছোট ইঁটের অর্দ্ধভগ্ন অংশ। দেউড়ির দুপাশে 'টেরাকোটার' কাজ। বুনো ঘাস আর লতাপাতায় ঢাকা ফাটলগুলো। দোতলার কপাটহীন গবাক্ষপথ ধরে নেমে আসছে এক ধূসর রঙের মস্ত সাপ। নামুক, তবুও তো এটা চারশো বছরের রাজপ্রাসাদ। কোথায় রাজা রুদ্রনারায়ণ, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ? কোথায় রানীরা? কোথায় প্রধান অমাত্য শঙ্করপ্রতাপ? কোথায় প্রধান সেনাপতি, সুদর্শন রাজীবলোচন রায়? কোথায় সভাপণ্ডিত নৈয়ায়িক শ্রীধর ভট্ট? কোথায় রাজপুরোহিত শ্রীকান্ত আচার্য্য? কোথায় তোমরা? রাজপ্রাসাদে কোলাহল নেই কেন?

—"একটা বিড়ি দ্যান না বাবু।"—মাঠের কাজ ছেড়ে উঠে এসেছে তিনু নস্কর।

"গেল সনে মাঠের মধ্যে লাঙ্গল দেওয়া কালে চামড়ার তৈরী একটা ঢাল পাওয়া গেল। আঁঠুলে গেরামের নেতাই হাজরা, চারটে সোনার মোহর পেল আগাছা তোলার সময়। পারলি তুই হজম করতে? এসব হোলো বাবা মণিনাথ মহাদেবের সম্পত্তি। দুবছরে নেতাইএর দুটো ছেলে ওলাওঠায় গেল।"

—"দ্যান্‌না বাবুমশায় এট্টা বিড়ি।"

সত্যিই তো, মণিনাথের সম্পত্তি গ্রাস করলে ধর্ম্মে সইবে কেন? তাছাড়া অতীতের সবাই আছে। কেউই হারিয়ে যায় নি। এই তিনু নস্কর, নিতাই হাজরাদের মধ্যেই আছে। শুধু পোষাক বদলে এসেছে। আমি হাঁটছি মেঠো পথ ধরে, তারা হাঁটছে মহাকালের গতিপথ ধরে।

শরতের স্নিগ্ধ বাতাস সেই কথাই কানে কানে বলে গেল।

পীণ পার্বতী নদী উপত্যকার আশেপাশে

কমলা মুখোপাধ্যায়

উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটি বহুদিন ধরেই আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে—প্রধানতঃ রাস্তার দুর্গমতা ও ভৌগলিক অপরিচিতির জন্য।

লাহুল স্পিতি জিলার রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। এখানকার, বিশেষ করে মধ্য লাহুলে, বিভিন্ন শৃঙ্গগুলি—লায়ন, সাকারুবে, প্রভৃতিতে অভিযানও হয়েছে। পর্বত অভিযানের পক্ষে যাইহোক, পদযাত্রীদের কাছে এ অঞ্চল স্বর্গরাজ্য। কুলু, মানালী হ'য়ে, রোটাঙ গিরিপথ (১৩৩২৫ ফুট) পার হয়ে লাহুলের কেলঙ। সেখান থেকে উচ্চ গিরিপথ বড়লাচা-লা (১৬৫৫০ ফুট) বা কুনজুম গিরিপথ (১৪৯০০ ফুট) পার হয়ে স্পিতির লোসার গ্রামে পৌছান যায়। সেখান থেকে পীণ নদীর উপত্যকা পার হ'য়ে, শতদ্রু উপত্যকায় আসা যায় বা মণিকরণ থেকে পার্বতী নদীর উপত্যকা ধরে জিরিতে মালানা নদী পার হয়ে, মালানা গ্রামের অদ্ভুত অধিবাসীদের দেখা ও মালানা হিমবাহে পদার্পণ করা বা লাহুল স্পিতির বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ ও পাটান অঞ্চলের বিখ্যাত ত্রিলোকনাথের মন্দির ও মাহ্‌কুল্লা দেবীর স্থান ও এখানকার লোকেদের বৈচিত্রপুর্ণ সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা, অনুসন্ধিৎসু যাত্রীদের কাছে খুবই তাৎপর্য্যপুর্ণ।

অনেকগুলি গিরিপথ থাকার কারণ হিমালয়ের বেশ কয়েকটি শাখা, যেমন ধওলাধর প্রভৃতি, হিমাচল প্রদেশের কুলু কাঙরা, লাহুল স্পিতি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত। কুলু কাঙরাতে ধর্মশালা বা পাঠানকোট হয়ে যাবার রাস্তা এইসব গিরিপথ ধরেই হয়েছে। ঐ অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী অপেক্ষাকৃত নীচুও বটে। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর, রামপুর ও কাল্‌পা যাবার ভাল রাস্তাও হ'য়েছে। কিন্তু দুর্গম রয়ে গেছে লাহুল ও বিশেষ করে স্পিতি বা স্পিতি থেকে কিন্নর প্রদেশে যাওয়া। সবচেয়ে প্রধান বাধা রোটাঙ গিরিপথ—যা অক্টোবরের শেষ থেকে এপ্রিল অবধি তুষারপাত হয়ে বন্ধ থাকে। স্পিতির গিরিপথ বিশেষ করে কুনজুম, জুনের আগে তো খোলেই না। এই অঞ্চলে তাই জুন থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই দু' তিন মাসই যাবার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময়।

রোটাঙ বন্ধ হলে অবশ্য, কুলু উপত্যকার জগৎসুখনগরের রাস্তা ধরে, পারিণি বা প্রীণি গ্রাম হ'য়ে চিক্কা গ্রাম ও ১৪০২৭ ফুট উঁচু হামতা গিরিপথ পার হয়ে রেণী পর্য্যন্ত গিয়ে চন্দ্রা উপত্যকায় যাওয়া যায়। সেখান থেকে চৈৎরু, ফুটরুণে ও করচা গ্রাম—পরে শিগ্রি হিমবাহ পার হয়ে লোসার

গ্রাম ও স্পিতি। পথে খুব বড় নদী নাই, ছোট ছোট ঝরণা আছে মাত্র। আবার বড়-লাচালা পার হয়েও, চন্দ্রানদীর বাঁ দিক ধরে উঁচু উপত্যকা ও গিরিদ্বার পার হলে স্পিতির পথ শুরু। লিচু নদীর ধার ধরে এখান থেকে লোসার মাত্র ৬ মাইল। উঁচু গিরিপথগুলি জুন থেকে অক্টোবর অবধি খোলা থাকে। অন্যগুলি মে থেকে অক্টোবর। বর্ত্তমানে স্পিতির কাজা থেকে মণিরঙ গিরিপথ (১৮৮৮৯ ফুট) দিয়ে রামপুর বুনাহর হাঁটাপথে পৌঁছান যায়,—মাঝে মাঝে জীপও চলাচল করছে, কিন্তু তেমন নিয়মিত পথ এখনও হয়নি।

এছাড়া অন্য চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হোল এখানকার নদীগুলি ও এখানকার সামাজিক রীতিনীতি। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণের ফলে যে সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্ত্তন এসেছে সেগুলির প্রতিফলন দেখা ও বোঝাও কম কথা নয়।

পঞ্চনদীর দেশ হিসাবে পাঞ্জাব বিখ্যাত। কিন্তু সেই পঞ্চনদীর চারটি নদী—বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর উৎপত্তি এখানে বা এর উত্তরে তিব্বতে হয়েছে ও এখান থেকেই সব প্রবাহিত হয়ে সিন্ধুতে পড়েছে। পর্বতশ্রেণীগুলি এখানকার নদীগুলির প্রধান জলবিভাজিকা—যেমন সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার মধ্যে ভাস্কর পর্ব্বত, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যে পীরপঞ্জিল পর্বত, ধওলাধর পর্বত বিপাশা ও ইরাবতীর জলবিভাজিকা। এর মধ্যে চন্দ্রভাগা এই লাহুল স্পিতির পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম পাকিস্থানে প্রায় মোহনার কাছে গিয়ে সিন্ধুনদে পড়েছে। কাশ্মীরের ঝিলম ও এখানকার ইরাবতী শতদ্রুর সঙ্গে মিলেছে. বিপাশা রোটাঙ গিরিপথের বিয়াস কুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে শতদ্রুতে পড়েছে।

এর মধ্যে বিপাশার একটি উপনদী পার্বতী ও তারও উপনদী মালানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বতী নদীর উৎপত্তি দক্ষিণ পূর্বে পিণ-পার্বতী পর্বতের বাঁ ঢাল থেকে—পিণ পার্বতী গিরিপথএর অন্য দিকে পিণ নদীর উৎপত্তি। এটা স্পিতিতে গিয়ে পড়েছে। পার্বতী নদী বিপাশার সংগে মিলেছে। তার মাঝামাঝি পর্বতের গায়ে মণিকরণের উষ্ণ প্রশ্রবণগুলি। কুলু থেকে বিপাশা নদীর উপর হেঁটে পুল পার হয়ে গেলে, অপর পারে জীপ বাস সবই পাওয়া যায়। এটি শিখেদের তীর্থস্থান—তাদের গুরুদ্বার আছে।

দেওটিব্বা (২১১১৭ ফুট) পর্বত কুলু উপত্যকা ও স্পিতির মধ্যে অবস্থিত। এরই দক্ষিণের পাহাড়ের খাদ বেয়ে এসেছে মালানা নদী। জিরির কাছে পার্বতী নদীর সঙ্গে মিলেছে।

চন্দ্রভাগা নদীও উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রা ও ভাগা নদীর উৎপত্তি বড়-লাচা গিরিপথের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে। এই দুই নদীর মধ্যে পর্বতশ্রেণী প্রকৃতপক্ষে একটি তুষার ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে পাহাড় ভেঙ্গে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন। চন্দ্রার পশ্চিমে ২১৪২৫ ফুট শৃঙ্গ নীচে ১২ মাইল হিমবাহ, আরও

দক্ষিণে শিগ্রী হিমবাহ। চন্দ্রানদীর প্রধান উপনদী স্পিতি, যার নামানুসারে স্পিতি জেলা—উচ্চ পার্বত্যভূমি। শীত এখানে আগেই আসে, অক্টোবরের মধ্যে, জুন অবধি থাকে। আবহাওয়া, চেহারা, পোষাক, পরিচ্ছদে, ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি আচার ব্যবহারে, এখানকার লোকেদের উপর তিব্বতের লাদাকের ছাপ সুস্পষ্ট। নামেই লাহুল স্পিতি বলা হয়, আসলে সবদিক দিয়েই এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য।

এখানকার তিনটি মঠ কাই, ভাঙ্কর ও তারোর। এরমধ্যে কাইয়ের নাম বিখ্যাত। ভাস্কর আগে রাজধানী ছিল। দুর্গ আছে। কিন্তু পথ খুব খারাপ। তারোর মঠ ছোট হলেও ভিতরের দেওয়ালে বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রায় অজন্তার মত সুন্দর। এখানকার সব মঠই তিব্বতের লামারা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্পিতি নদীর মণিগ্রাম, মণিরঙ পাসের উল্টোদিকে রোবুক গ্রাম—কিন্নর জেলার মধ্যে। এখন অবশ্য কাজা থেকে আসা যায়।

কুনজুম গিরিপথের অন্যদিকে ভাগানদী ও তার উপত্যকায় লাহুল জেলা সুরু। জলবায়ু স্পিতির মতো অত দুঃসহ বা কঠোর নয়।

ঘুরতে ঘুরতে অক্টোবরের মাঝামাঝি এসে গেল—মাঝে কিছুদিন অসময়ে বরফ পড়ে রোটাঙ বন্ধ ছিল। নীচে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। এই অঞ্চলের অনেক বিষয় জানাশোনার অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেল।

"চরৈবেতি চরৈবেতি
নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম্
পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ
সখা, চরৈবেতি—"

আমাদের ভ্রমণ

বিগত বছরে সমিতির পরিচালনায় মোট পাঁচটি ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। এইসব ভ্রমণের পরিচালকবৃন্দের কাছ থেকে পাওয়া ভ্রমণ বিবরণী তুলে ধরছি।

● প্রথম ভ্রমণ : কাশ্মীর ॥

—দেবদাস লাহিড়ী

১৫ই এপ্রিল '৭৩ আটজন মহিলা, তিনটি শিশু সমেত মোট চব্বিশ জন শিয়ালদহ থেকে জম্মু এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু করলাম। ১৭ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ন'টায় জম্মু ষ্টেশনে এসে হাজির হলাম। ষ্টেশন থেকে বাসে গেলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডে। ষ্টেশন থেকে বাস ষ্ট্যাণ্ড এগার কিলোমিটার পথ। কাছে অবশ্য একটা ডাক বাংলো আছে। বাস ষ্ট্যাণ্ডে থাকার জন্য প্রচুর ঘর আছে। তিনতলা বাড়ীর দোতলার ঘর ভাড়া নিলাম। বাড়ীর ভেতরেই বাজার, দোকান, রেষ্টুরেন্ট, হোটেল সবই আছে। নীচে ক্যানটিনে আহারাদি সেরে দুপুরের মত বিশ্রাম নিলাম।

বিকালে বেড়াতে বের হলাম, কাছেই রঘুনাথজী মন্দির। পাহাড়ী উঁচুনীচু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা। ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম বাওয়াকিল্লা দেখতে। ধ্বংশাবশেষ কিল্লা ভগ্নাবশেষ কালীমন্দির। কিল্লা ঘুরতে ঘুরতে আমরা বারুদঘরে এসে হাজির হলাম। মাটী খুঁড়ে দেখলাম এখনও বারুদ রয়েছে মাটীর তলে, কামানের নল ও ছোট কামানও রয়েছে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেরিয়ে পড়লাম ধ্বংশ স্তূপ থেকে। রাত্রে গেল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এগজিবিশন দেখতে অনেকে।

পরের দিন ভোরে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা—বাস ছাড়লো সকাল সাড়ে সাতটায়। আনন্দে সবাই উৎফুল্ল, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দিকে এগুচ্ছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পরই শুরু হল পাহাড়ী পথ। বিসর্পিল পথ কখনো চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে বাস এগুতে লাগলো। খাড়া উঁচু পাহাড়, পাশে খাদ। চারিদিকে জঙ্গল। গাড়ী উঠতে থাকে ক্রমশঃ উঁচুতে। উধমপুর, কুঁদ ছেড়ে গাড়ী চলতে থাকে।

জম্মুর সীমানা, চেনার নদী পার হয়ে বাণিহাল পর্য্যন্ত। শুরু হ'ল কাশ্মীর উপত্যকা। অভিজ্ঞ শিখ ড্রাইভার অবলীলাক্রমে রাস্তার বাঁকগুলো পার করে নিয়ে যাচ্ছে। বাসে বসে খাদের দিকে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে। কোথাও চারপাঁচ হাজার ফিট গভীর। বেলা একটায় বাটোডে এসে নামলাম। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বিশ্রাম। এখানেই আহারাদি সেরে নিলাম। বাস ছেড়ে দিলো। পড়লো "জহর ট্যানেল"। বানিহাল পাহাড় ভেদ করে জহর ট্যানেল, আঠার মাইল রাস্তা কমিয়ে দিয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা। বিকাল চারটায় আমরা ভেরীনাগ এসে পৌঁছালাম। ভেরীনাগ ঝিলাম নদীর উৎস। জাহাঙ্গীর বাদশা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। পরিষ্কার জলের ঝরণা, আটকোণাকুণ্ড। সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগান। চারিদিকে বড় বড় চেনার গাছ। সুন্দর বাগান দেখে বাসে উঠে বসলাম। রাত আটটায় আমরা শ্রীনগরের টুরিষ্ট রিসেপশন্ সেণ্টারে এসে হাজির হলাম। রাতের মত আশ্রয় নিলাম।

১৯শে এপ্রিল "বন্‌ধ" এ "জিরো" ব্রীজের কাছে হাউস বোট ভাড়া নিলাম, বেরিয়ে পড়লাম তিন হাজার ফিট উঁচুতে শঙ্করাচার্য্য হিল দেখতে। শঙ্করাচার্য্যের মন্দিরে যেতে পাথর কেটে তৈরী রাস্তা। মন্দিরের সম্মুখেই রয়েছে শঙ্করাচার্য্যের পাথরের মূর্ত্তি। দর্শন সেরে ওপর থেকে দেখলাম শ্রীনগরের সৌন্দর্য্য। বিকালে শিকারায় ভ্রমণ। ডাললেক থেকে শিকারা ভাড়াকরা হল। আধঘণ্টা বাদে আমরা নেহেরু পার্কে এসে হাজির হলাম। জলের মধ্যে দ্বীপ। ফুলগাছ দিয়ে সাজান বাগান। সন্ধ্যায় ফিরে এলাম হাউস বোটে।

পরের দিন বাসে উঠে বসলাম গুলমার্গ দেখতে। বাস ছাড়লো সকাল আটটায়. বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় টানমার্গ এসে গেলাম। এখান থেকে ঘোড়া নিয়ে যাত্রা করতে হবে গুলমার্গে। এখানে ঘোড়া, জুতা, মোজা, গরম কোট, দস্তানা ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা কয়েকজন হাঁটা পথ ধরলাম। ঘণ্টা দেড়েক চলার পর আমরা গুলমার্গে এসে পৌঁছালাম। নির্মল আকাশ। সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে সাদা গুঁড়া বরফের ওপর পড়ায় চোখ ঝলসে যায়। অনেকেই বরফে শুয়ে গড়াগড়ি দিল, কেউ কেউ স্লেজে চড়েছে। ঘণ্টা দুয়েক বরফের ওপর ঘুরে বেড়ালাম। কাছেই খিলেন মার্গ। সময় অভাবে দেখা হ'ল না। ফেরার পথ ধরলাম।

২১শে এপ্রিল আমরা বাসে এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম লেক উলার লেক দেখতে গেলাম। পথে দর্শনীয় ক্ষিরভবন মন্দির, মনসাবল লেক, বন্দিপুর, সুপারগ্রাম, রেষ্টহাউস ওয়ালটার এবং শেষে ভাঙ্গা হিন্দু মন্দির পাটান দেখি। হজরৎবাল মসজিদ নাশিম বাগ থেকে কয়েকশ গজ দূরে। হজরৎ মহম্মদের চুল রক্ষিত আছে।

পরের দিন রবিবার সন্ধ্যায় মোগল গার্ডেন দেখার নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু সিজন শুরু না হওয়ায় বিজলী বাতিতে সাজান মোগল গার্ডেন রাত্রে দেখা সম্ভব হ'ল না। দিনের বেলায় দেখা সারতে হ'ল।

পথে আমরা চশমাশাহী, নিশাতবাগ প্রভৃতি দেখি। চশমাশাহী মানে রাজকীয় ঝরণা। শাহজাহানের তৈরী বাগান। নিশাতবাগ প্রমোদ উদ্যান। নূরজাহানের ভাই আসফ্‌শাহের তৈরী বাগান। এই বাগান দোতলা বাড়ী বার তের ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। শালিমার বাগ 'অ্যাবোট অফ লাভ'' (প্রেমের আবাস) জাহাঙ্গীর বাদশাহ নূরজাহান বেগমের জন্য তৈরী করেন। বাগানের পিছনে পর্বত। পাদদেশে ফুলের বাগান ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। অজস্র ফোয়ারা ঝরণার মত জল নামছে পাথরের গা বেয়ে। পায়ে চলার পথ পাথর দিয়ে বাঁধানো। মোগল গার্ডেন সুন্দর বাগান। অজস্র ফোয়ারার জল ছিটকে উঠছে।

পরের দিন শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত পহেলগাঁও অভিমুখে যাত্রা করি বাসে। পহেল-গাঁওয়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে লীডার নদী। একটি পথ পূর্বমুখে চন্দনবাড়ী হয়ে অমরনাথের পথে অন্যটি উত্তরমুখে কোলহাই গ্লেসিয়ারের দিকে। অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা গ্রাম। দু'পাশে পাহাড়, মধ্যে সমতলভূমি।

আমরা মিউজিয়ম দেখি শ্রীনগরে। অবন্তীপুর স্থাপত্যকলার অপরূপ নিদর্শন। ভিৎ আছে থাম আছে, নেই শুধু উপরের ছাদ। মন্দিরের দেউল কালক্রমে ভেঙ্গে পড়েছে। আমীরাকদল বা লালচক কলকাতার বড় বাজার। এখান থেকে সমস্ত প্রাইভেট কোম্পানীর বাস ভাড়া পাওয়া যায়। কাশ্মীরের দর্শনীয় জায়গা দেখানো শেষ হ'ল। সবাই বেরিয়ে পড়ে সওদা করতে। আমাদের ভ্রমণ সূচী শেষ। ২৯শে এপ্রিল আমরা ফিরে এলাম কলকাতায়। মাথা পিছু খরচ পড়ে তিনশ পঁচিশ টাকা মাত্র।

● দ্বিতীয় ভ্রমণ : জামসেদপুর

— প্রসূন দেব

১৩ই আগষ্ট '৭৩ সোমবার রাত্রি ৯টায় বাসযোগে ২৪ জন জনসভ্য ও ১১ জন অতিথি নিয়ে জামসেদপুরের পথে বাস ছাড়ে।

১৪ই আগষ্ট ভোর ৫টায় ডিম্‌না লেকে গিয়ে বাস থামে, সেখানে প্রাতঃরাশ করে জামসেদপুরে প্রবেশ করলাম।

বিষ্টুপুরে পূর্ববব্যবস্থাকৃত বাঙ্গালী-সমিতি 'মিলনী'র প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে রাত কাটাবার ও আহারাদির জন্য উঠলাম। প্রাতঃরাশ সেরে সকাল ১০ টায় আমাদের বাসযোগে টাটা ইস্পাত কারখানা দেখতে গেলাম। পূর্ববব্যবস্থামত জন সংযোগ অধিকর্তার কাছ থেকে অনুমতি পত্র ও কর্তৃপক্ষের মাদ্রাজী প্রদর্শক নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রবেশ করি। কর্তৃপক্ষ্য পূর্বেই প্রত্যেকের হাতে একটি

করে ভ্রমণকারীর জ্ঞাতব্য বিষয়ক পুস্তক দেন। ইস্পাত তৈরী বিভাগ আমাদের ভ্রমণকারীদের অতি বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ড দেখে সকলে সমিতিকে ধন্যবাদ দেন। যদিও অল্পসময়ে এতবড় কারখানা সম্পূর্ণ দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু তা'হলেও প্রাথমিক দর্শনে ইস্পাত তৈরী কারখানার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হয়। বেলা ১টায় 'মিলনী'তে ফিরে নিজ ব্যবস্থায় দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর বিকাল ৪টায় আমাদের বাসে করে 'দো-মোহানী' দেখতে যাই। এটি একটি সুন্দর বনভোজনের জায়গা, যেখানে আমরা বৈকালিক চা-পান সেরে সন্ধ্যায় আলোকিত জুবলী-পার্ক দেখি। রাত্রে হোটেলে আহার সেরে 'মিলনী'তে রাত্রিবাস।

১৫ই আগষ্ট ভোরে চা পান করে জামসেদপুরকে বিদায় জানিয়ে, পথে গালুডীতে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান সেরে প্রাতঃরাশ করি। সময় স্বল্পতার জন্য ঘাটশীলা দর্শন স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু ঝাড়গ্রাম সেই দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। ঝাড়গ্রামের রাজবাটী দর্শন, সমিতির স্বল্প সময়ের বাস ভ্রমণে একটি ইতিহাস। রাজবাটী দর্শনের পূর্বে ঝাড়গ্রামে হোটেলে দুপুরের আহারাদি হয়। পথে লরী দুর্ঘটনার জন্য কিছু সময় নষ্ট হোয়ে যায়। অভিজ্ঞ চালক আজমীড সিং তার চলমান যন্ত্রদানবটিকে নিয়ে রাত ঠিক ৯টায় সমিতির কার্য্যালয়ের সামনে হাজির করল। এই ভ্রমণে যে সমস্ত যাত্রী অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের সহযোগিতা ও সক্রিয় সাহায্য না হ'লে এই শিক্ষণীয় ভ্রমণ করা যেত না।

এই ভ্রমণে সভ্যদের জন্য ৩৮ টাকা ও অতিথিদের জন্য ৪০ টাকা ধার্য্য ছিল।

তৃতীয় ভ্রমণ : **কেদার বদরি** ॥ — শম্ভুনাথ ঘোষ

অভ্রভেদী চিরতুষার আবৃত তুষার মৌলি কেদার শৃঙ্গ আর তারই কোলে কেদারনাথ—আর বেদময় বদরিনাথ আকাশস্পর্শী চিরতুষারে আচ্ছন্ন নীলকণ্ঠের পাদদেশে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কেদারনাথ উচ্চতায় ১১৭৫০ ফুট আর বদরিনাথ ১০২৪৪ ফুট।

দীর্ঘপথ বেয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিষ্টস্ এসোসিয়েশন আয়োজন করেছিলেন এই উত্তরখণ্ড যাত্রার। হিমালয়ের বুকে আছে যাদু তাই অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন ১৬ জন পুরুষ আর ১৩ জন মহিলা মোট সংখ্যায় ২৯ জন। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল এই দুই মহাতীর্থের পথে পড়বে তাঁদেরও পায়ের চিহ্ন।

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, বদরি বিশাল আর কেদার নাথজীর জয়ের মধ্যে হাওড়া ষ্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়। যাত্রার আয়োজন একদিনে হলেও একসংগে একই গাড়ীর টিকিট না পাওয়ায়, কিছু গেলেন

৯নং আপ ট্রেনে, বাকিরা ৬১নং আপ ট্রেনে—ব্যবধান মাত্র কয়েকঘণ্টার, আর হৃষিকেশে ১১ই সেপ্টেম্বর আবার সবাই একসংগে জমা হলেন বাবা কালিকমলীর ধর্মশালায়। কালিকমলী এই এক নাম সেই হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে—রয়েছে ধর্মশালা। দীন দরিদ্র সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শুধুমাত্র একখানা কালো কম্বল সম্বল করে দোরে দোরে ভিক্ষা করে, প্রতিটি মানুষের দাক্ষিণ্যে গড়ে গিয়েছেন এ জনহিতকর ধর্মশালা।

দুপুরে পরিতৃপ্ত আহার সারা হল কাছের পাঞ্জাবী হোটেলে—বিকালে সবাই ছুটলেন লছমনঝোলায়—গীতাভবন আর আর দর্শনীয় যা কিছুর দেখার জন্য।

এদিকে হৃষিকেশে খবর পাওয়া গেল যে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য পাহাড়ী রাস্তায় ধস নেমেছে ক'দিন বাস চলাচল বন্ধ। রাস্তা সংস্কার না হলে কোন বাস যাবে না। আজকাল শোনপ্রয়াগ পর্য্যন্ত বাস যায়। শেষে বহু ঘোরাঘুরি খোঁজা খুঁজির পর যে বাস ঠিক করা গেল সে শোনপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যাবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না। তখন রাত প্রায় ৯টা।

১২ই সেপ্টেম্বর ভোরে ১৩৯৯নং রিজার্ভ করা বাস আমাদের নিয়ে ছুটে চললো—জয় কেদারজীকী জয় বলে। কয়েকদিন পরে আজ এটাই প্রথম বাস। সকাল খুব পরিস্কার নীল আকাশ আর সোনালী রোদ। ৪৭ মাইল গিয়ে আমাদের বাস ৯-১৫এ থামে অলকানন্দা আর ভাগিরথীর সঙ্গম দেবপ্রয়াগে। চা, জলখাবার খেয়ে ১২টায় পৌঁছান গেল অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম রুদ্রপ্রয়াগে। এখানেই দুপুরের খাবার ব্যবস্থা।

রুদ্রপ্রয়াগ হৃষিকেশ থেকে ৮৮ মাইল—এখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে - মন্দাকিনীর ধার ঘেঁষে চলে গেছে কেদারনাথ আর অলকানন্দার ধার ঘেঁষে বদরিনাথ। বাস ছাড়ে ১টায়। চন্দ্রপুরা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি—পৌঁছাই বাঁশওয়াড়া। এখানে রাস্তা খারাপ থাকায় অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে সকলে বেঁচে যান। বাস খাদের ধারে গিয়ে ঝুলে গিয়েছিল। স্থানীয় কুলিরা কোন রকমে ঠেলে বাস, খারাপ রাস্তা পার করে দেয়—দেয় কেদার যাবার অনুমতি। কিন্তু পেছনে অন্য যাত্রীবাহীবাস কেদার যাবার অনুমতি পেলো না—সেদিন তো বটেই পরের দিনও নয়।

বিকাল ৫টায় মাইলটাক পথ হেঁটে আমরা পৌঁছাই রামপুর—হৃষিকেশ থেকে ১২৭ মাইল। এখানে আজকের মত বিশ্রাম। সকলেই বিশ্রাম নেন চটিতে। বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। রাতে আহারের ব্যবস্থা করতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। পরের দিন এখান থেকেই শুরু হবে ১২ মাইল হাঁটা চড়াই পথ—কেদার পর্য্যন্ত।

১৩ই সেপ্টেম্বর ভোরের আকাশে জাগে আলোর দিশা—যাত্রীদের উত্তেজনা, মোট বইবার কুলিদের তাগাদা। সকাল ৭-৩০টায় যাত্রা সুরু হ'ল। ২ মাইল হাঁটার পর বেলা ৯টায় পৌঁছাই শোনপ্রয়াগ—

বাসুকী নদী মিশেছে এখানে মন্দাকিনীর সংগে। ক্ষণিক বিশ্রাম সেরে ৩ মাইল হাঁটার পর বেলা ১২টায় পৌঁছাই গৌরীকুণ্ডে। পার্বতী বিয়ের আগে গায়ে হলুদের পর এখানকার গরমজলের কুণ্ডে (তপ্ত কুণ্ডে), স্নান করেছিলেন, তাই এই জলের রং হলুদ। এই শীতের দেশে দারুণ পথ চলার কষ্টের পর গরমজলে স্নানে আছে আমেজ—তাঁরাই উপভোগ করেছিলেন যাঁরা স্নান করেছিলেন, যদিও আবহাওয়া ছিল খারাপ, বৃষ্টি পড়ছিল. দুপুরের আহারের পর ১-৩০এ আবার যাত্রা। ৪ মাইল চলার পর বিকাল ৫টায় পৌঁছাই রাময়াড়া, কালিকমলির ধর্মশালায় রাতের থাকার আর খাবার ব্যবস্থা ঠিক করা হয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০এ আবার হাঁটা সুরু। এখান থেকে ৪ মাইল দূরে কেদার। ১২টায় আমরা কেদার পৌঁছাই। পথ যেমন খাড়াই তেমনি খারাপ। জে কে ধর্মশালায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরের পাশেই এই ধর্মশালা খুব পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। সকলে স্নান পূজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন--ব্যস্ত হয়ে পড়েন স্থানীয় লোকেরা—আজ তিনদিন পরে কেদারে এই প্রথম 'তীরথ যাত্রী" পৌঁছেছে। সুন্দর পরিবেশ, মন্দিরের পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফঢাকা পাহাড়। এদিন রাতে আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ আর সেই পূর্ণিমার আলোয় কেদার শৃঙ্গের কোলে কেদারনাথের মন্দিরের দৃশ্য অভূতপূর্ব।

পরের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর, সকাল ৮টায় আমরা কেদারনাথজীকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা ১০-৩০টায় পৌঁছান গেল রাময়াড়ায়, তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে বেলা ২টা গৌরীকুণ্ড। ক্ষণিক বিশ্রাম সেরে ৬টায় শোনপ্রয়াগ পৌঁছাই। এখানে রাতে থাকা। কিছু রইলেন চটিতে বাকিরা ট্যুরিষ্ট বিভাগের তাঁবুতে।

১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০এ আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল ত্রিযুগীনারায়ণ। এখান থেকে ৩ মাইল খাড়া চড়াই। পথে বনফুলের সমারোহ। কষ্টকর চড়াই ভেঙ্গে আমরা ১২টা পৌঁছাই ত্রিযুগীনারায়ণ—এখানেই একদিন শিব আর পার্ব্বতীর বিবাহ হয়েছিল—কন্যার সিঁথিপটে মহাদেব এঁকে দিয়েছিলেন সিঁদুরের রক্তিম রেখা - অয়াতির চিহ্ন। ত্রিকাল যাবৎ জ্বলছে হোমাগ্নি—পবিত্র অনির্ব্বাণ শিখা। দুপুরের আহার সেরে আবার ৪ মাইল রাস্তা হেঁটে, সীতাপুর হয়ে রামপুর পৌঁছান গেল বিকাল ৬টায়। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর বাসে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল বদরিনাথের পথে। সকাল ৯টায় আবার সেই রুদ্রপ্রয়াগ—চা, জলখাবার সেরে ৩টায় পিপুলকোঠি। এখানে গেট খোলে প্রায় ৪-৩০এ। যোশীমঠ পৌঁছাই সন্ধ্যা ৭টায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতের থাকার জায়গা পাওয়া গেল।

১৮ই সেপ্টেম্বর দু'জন রয়ে গেলেন যোশীমঠে—বসুধারা যাবার প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করতে, বাকিরা সকাল ৬-৩০এ যাত্রা করে ৯-৩০এ বদরিনাথ পৌঁছান। বাকি দু'জন প্রয়োজনীয় অনুমতি

সংগ্রহ করে পৌঁছান ২-এ। থাকার খুব ভাল জায়গা পাওয়া গিয়েছিল—বহুদিন বাদে একটু রসনা তৃপ্তি করে খাওয়া গেল দেবলোক হোটেলে।

১৯শে সেপ্টেম্বর ৮ জন সভ্য সকাল ৮ টায় বসুধারা দেখতে যান। বসুধারা এখান থেকে ৪ মাইল। ১১-৩০এ সেখানে পৌঁছাবার পর ১২-৩০এ আবার যাত্রা করে বদরিনাথ পৌঁছুতে প্রায় ২টা বাজে। এদিন বদরিনাথের ধর্মশালায় নিজেরাই রেঁধে দুপুরের খাওয়া তৈরী হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর কয়েকজন হরিদ্বার ফিরে যান। বাকিরা ফেরেন ২১শে সেপ্টেম্বর। পথের মাঝে রাত্রিবাস করা হয় শ্রীনগরে, কাশ্মীর ছাড়া যে শ্রীনগর আছে তা এই জানলাম। পরের দিন ২২শে হরিদ্বার পেঁৗছুতে প্রায় দুপুর ১-৩০ টায় বেজে যায়। কিছু সভ্য ঐ দিনই রাতে কলিকাতায় ফেরার জন্য ট্রেনে চাপেন, বাকিরা ফেরেন ২৬শে সেপ্টেম্বর।

এই ভ্রমণে খরচ ধার্য্য হয়েছিল জনপ্রতি সভ্যদের ৩২৫ আর অতিথিদের ৩৬০। অংশগ্রহণকারী সভ্য ছিলেন ১০ জন, অতিথি ১৯ জন।

● চতুর্থ ভ্রমণ : **রাজগীর—নালন্দা—গয়া ॥** —রামরাঘব মৈত্র

রাজগীর বা রাজগৃহ প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী সমূহের মধ্যে যা অন্যতম—যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইস্‌লাম তীর্থের সমন্বয় ঘটেছিল, তা দেখার উদ্দেশ্যে ৭ই নভেম্বর ১৯৭৩ বুধবার, হাওড়া ষ্টেশন থেকে জনতা এক্সপ্রেসে আমাদের ১২ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে যাত্রা করলাম।

৮ই নভেম্বর পৌঁছালাম বক্তিয়ারপুর—তখন সকাল ১০টা। ইতিমধ্যেই বাঁকা ষ্টেশনে সকাল বেলার জলখাবার আমরা খেয়ে নিয়েছিলাম। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে আমরা স্নান সেরে নিলাম। এখানেই আহার সেরে নিয়ে দুপুর ১টার গাড়ীতে রাজগীর রওনা হলাম—পৌঁছলাম ৩টায়।

৯ই নভেম্বর আমরা টাঙ্গায়, মণিয়ার মঠ, সোনভাণ্ডার, জরাসন্ধের বনভূমি, জীবকবন প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দেখে রোপওয়ে দেখার জন্য পৌঁছলাম। রোপওয়ে সত্যিই সুন্দর। অবশ্য আমাদের দলের দু' একজন প্রথমে রোপওয়েতে উঠতে ভয় পেয়েছিলেন। যাইহোক ওপরে উঠে আমরা শান্তিকুঞ্জ দেখলাম। এখানকার বৌদ্ধ মন্দির জাপানীদের এক অনুপম সৃষ্টি, পিতলের পাতে মোড়া বুদ্ধদেবের শান্ত সৌম মূর্ত্তি—বিমোহিত হতে হয়।

এখান থেকে আমরা নেমে, গরম জলের কুণ্ডে স্নানের জন্য গেলাম। এখানকার এই উষ্ণপ্রস্রবনে স্নান করলে অনেক রোগ নিরাময় হয়, তাই বহুলোকের ভিড়। সপ্তর্ষিকুণ্ড এখানকার এক প্রধান আকর্ষণ। এই কুণ্ডের দক্ষিণ পাশে একটি ছোট ভূগর্ভস্থ মন্দিরে গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ ও পরাশর, এই সাতজন পৌরাণিক ঋষির প্রস্তরমূর্ত্তি রয়েছে। এঁদের এক এক জনের নামানুসারে সপ্তর্ষিকুণ্ডের এক একটি ধারার নাম হয়েছে। দুপুরের আহার সেরে আমরা ভারতের প্রাচীনতম মহাবিদ্যালয় নালন্দা দর্শনের জন্য যাত্রা করলাম।

বহু শতাব্দী ধরে নালন্দার খ্যাতি ছিল বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে। মনে পড়ে এখানেই সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাশিক্ষার জন্য এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনসান্, এখানকার ছাত্র অতীশ দীপঙ্কর পদব্রজে হিমালয় পার হয়ে যান তিব্বতে। এখানে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত চৈত্য, স্তূপ, ছাত্রাবাস, রন্ধনশালা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েন।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি মিউজিয়াম আছে এখানে। সকলে মিউজিয়াম ঘুরে দেখলাম। আবহাওয়া আজ খুব খারাপ ছিল—মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা রাজগীর ফিরে এলাম।

সেদিন শনিবার ১০ই নভেম্বর। সকালবেলায় আমরা নওলাক্ষা মন্দির, জাপানী মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির ও বেণুবন দেখলাম। আবার কুণ্ডের জলে স্নান। এদিন রাস পূর্ণিমা থাকায় কুণ্ডে অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। খাওয়া সেরে আমরা গয়া যাবার জন্য বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছালাম। কিন্তু কোন বাস পেলাম না! আগের দিন বিহার ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট-এর অফিস থেকে যে খবর নিয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাইহোক কোন রকমে দুটো ট্যাক্সীতে করে সোজা গয়া অভিমুখে যাত্রা করলাম।

গয়ায় ভারত সেবাশ্রম সংঘে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা একটি হলঘরে থাকার জায়গাও পেলাম।

পরের দিন রবিবার আমরা সকালে জলখাবার সেরে দু'টি ট্যাক্সী ঠিক করে গেলাম দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার উদ্দেশ্যে। প্রথমে গেলাম ফল্গুনদীর তীরে বিষ্ণুমন্দিরে, অনেকেই এখানে পূজা দিলেন, তারপর আকাশ গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা, মহর্ষি বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম দেখে বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছতে প্রায় দুপুর ১টা হয়ে যায়। আহার সেরে আমরা বুদ্ধ মন্দির, জাপানি মন্দির, মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখে সন্ধ্যা নাগাদ গয়ায় ফিরলাম।

১২ই নভেম্বর সকালে আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছালাম। এই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৪ জন মহিলা সমেত ১২ জন, যার মধ্যে সদস্য ছিলেন ৩ জন এবং অতিথি ৯ জন। এই ভ্রমণে সদস্য প্রতি ভ্রমণ বাবদ খরচ ধার্য্য হয় ১১০ টাকা আর অতিথিদের ১১৫ টাকা।

—)•(—

● পঞ্চম ভ্রমণ : **মধ্য-দক্ষিণ ভারত** ॥ —দেবদাস লাহিড়ী ও ত্রিদিব ঘোষ

কিছুটা অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে এবারের ভ্রমণ সূচী মধ্য - দক্ষিণ ভারত। বুড়োবুড়ী, কাচ্চা বাচ্চা যুবকযুবতী ও ঠাকুর চাকর নিয়ে মোট আমরা আটচল্লিশ জন। ৭ই জানুয়ারী আমি ও দলের অপর ম্যানেজার ত্রিদিব ঘোষকে পাঠানো হলো মাদ্রাজ গিয়ে থাকার ও বাস ঠিক করে রাখার জন্য।

হাওড়া ষ্টেশন—৬-৩০ মিনিট। সংস্থার সভ্যরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালো। ৯ই জানুয়ারী আমরা মাদ্রাজ এসে হাজির হলাম। ষ্টেশনে বাদল ও বিপিনকে (রাঁধুনী) রেখে গেলাম মিঃ দামিজার খোঁজে। সত্যই সহৃদয় ব্যক্তি। তাঁর কাছেই শুনলাম কেরলে "পঙ্গল" উৎসব। বাড়ী ও বাস পাওয়া খুবই শক্ত। যাইহোক, অনেক চেষ্টার পর তিনি শিখ "গুরুদ্বার" ব্যবস্থা করে দিলেন। গুরু দ্বারটি "Sun Theatre Cinema" হলের কাছে। মিঃ দামিজা তাঁর ম্যানেজারকে আদেশ দিলেন "যে করে হোক বাসের ব্যবস্থা করা চাই, এরা হলেন আমার কলকাতার মেহমান"। বিপিন বাদলকে নিয়ে এলাম গুরুদ্বারে। সুন্দর পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। তারপর গেলাম বাসের ব্যবস্থা করতে। বাসও মোটামুটি ঠিক করে ফেললাম বাকীটা কাল প্রসূনের সংগে আলোচনা করে ঠিক করা যাবে।

১০ই জানুয়ারী '৭৪—সংস্থার অন্যান্য সভ্যরা এসে মাদ্রাজ পৌঁছুলো। হৈ হৈ করে মালপত্তর তোলা শুরু হয়ে গেল। ষ্টেশনের বাহিরে LUXURY বাস নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। মালপত্তর ও সবাইকে নিয়ে বাস এলো গুরুদ্বারে। চা ও লুচি খেয়ে সকালের প্রাতঃরাশ সারা হলো। জানিয়ে দিলাম "Go as you like"। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

১১ই জানুয়ারী '৭৪—আজ থেকেই আমাদের ভ্রমণসূচী শুরু হোল। ভোরবেলায় চা জলখাবার খেয়ে আমরা সবাই বাসে উঠলাম। বাস ছুটলো ৩৪ মাইল দূরে মহাবলীপুরমের দিকে। সংগে "ড্রাই মিল" নিয়ে নিলাম। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ মহাবলীপুরম্ পৌঁছালাম। সকলকে নিয়ে মহাবলীপুরমে অর্জ্জুনের তপস্যা প্যানল ছবি পাথরের উপর ; বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, পাণ্ডবদের পঞ্চরথ দেখা হল। শোর টেমপল্ দেখা সেরে প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ পক্ষীতীর্থ এসে হাজির হলাম। মাথা পিছু ২০ পয়সার টিকিট কেটে দিয়ে সকলকে ওপরে পাঠিয়ে দিলুম। প্রায় পাঁচশো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে। চড়া রোদ—যারা ক্লান্ত তারা উপরে গেলেন না। আমি, ত্রিদিব ও প্রসূন ড্রাইমিল প্রস্তুত করে নিলুম, খাওয়া সেরে কাঞ্চীপুরমের দিকে ছুটলাম। একত্রিশ মাইল পথ বেয়ে প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ কাঞ্চীপুরম এসে হাজির হলাম। বিষ্ণুকাঞ্চী দেখতে গেল সবাই- প্রসূন ও আমি চা তৈরী করতে লাগলুম। শিবকাঞ্চী দেখে সন্ধ্যে সাতটায় আমরা মাদ্রাজ শহরের মেরিনা

নীচে এসে হাজির হলাম। আন্নাতুরাই স্মৃতিসৌধ দেখে রাত ন'টায় ফিরে এলাম আমাদের ডেরায়।

১২ই জানুয়ারী '৭৪—হোটেলে খাওয়া সেরে একশ মাইল দূরে তিরুপতির দিকে বাস ছাড়লো। ঘড়ির দিকে চোখ পড়লো, কাঁটা তখন সাড়ে এগারটা। প্রসূন ও ত্রিদিব থেকে গেল। কারণ কাল সকালে ওরা আবার একটা বাস নিয়ে তিরুপতি যাবে এবং সেই বাসটাই আমাদের বাকী সমস্ত ভ্রমণের সংগী হবে। এখানকার বাস তিরুপতি থেকে ফিরে আসবে মাদ্রাজ। বিকাল সাড়ে চারটায় তিরুপতি চোলট্রির সামনে এসে হাজির। ক্লোকরুমে জিনিষপত্র রেখে সংগে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ নিয়ে ছোট বাস ভাড়া করে নিলাম। মাথা পিছু ভাড়া ১'৬০ পয়সা। তিরুপতির বালাজী ভেঙ্কটেশ্বর সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট ওপরে। বাস এঁকে বেঁকে উঠতে লাগলো। প্রতি পদে পদে বাঁক। প্রায় সন্ধ্যে সাতটায় আমরা তিরুপতি মন্দিরের কাছে এলাম। সম্মুখে দেবস্থানম্ ধর্মশালা—প্রতি ঘর ভাড়া '৫০ পয়সা—পাঁচখানা ঘর ভাড়া নিলাম। তিরুপতি বিষ্ণুর আবাসস্থল, স্বর্গের বৈকুণ্ঠ। প্রবাদ আছে "মহর্ষি ভৃগুর মনে সংশয় হয়েছিল,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে বড়? প্রথমে তিনি ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তিনি তখন ধ্যানে মগ্ন। মহর্ষিকে দেখে তিনি রেগে উঠলেন। মহর্ষি গেলেন মহেশ্বরের কাছে। তিনি তখন পার্বতীর সংগে বিশ্রাম্ভালাপে মগ্ন। ভৃগুকে অসময়ে দেখে তেড়ে এলেন। দেবতাদের ব্যবহার দেখে তিনি বিস্মিত। গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তখন অনন্ত শয়নে। দ্বারপালরা ফটকে আটকে দিলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর যখন কিছুই হল না তখন তিনি এক রকম জোর করে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। বিষ্ণুকে এভাবে নিদ্রাভিভূত দেখে রেগে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে তার বুকে মারলেন এক লাথি। লাথির চোটে বিষ্ণুর ঘুম ছুটে যায়। তিনি অনুনয় করে বল্লেন—মহর্ষি লাগেনিতো। ব্যাস! তাঁর উত্তর পেয়ে গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বেঁকে বসলেন, তিনি এ অপরাধ সহ্য করলেন না। তিনি চলে এলেন ধরাধামে—তাই বিষ্ণুকেও ফিরে আসতে হল ধরাধামে।"

তিরুপতিতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। বিশ্বের বিখ্যাত রোজগারের মূর্ত্তি। প্রতিদিন প্রায় এক লাখ বিশ হাজার টাকার মত প্রণামী পড়ে। তাছাড়া মাথা মুড়িয়ে চুল বেচে আমাদের সরকার বিদেশ থেকে কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা আনে। এখানে বিভিন্ন সময়ে লাইনের মূল্য ভিন্ন। আর আমাদের সকলেই ধানদূর্বা দিয়ে দর্শন সারতে চায়। তাই আমি ঠিক করলাম, ভোর সাড়ে তিনটায় আমরা ফ্রি লাইনে লাইন দেবো।

১৩ই জানুয়ারী '৭৪—টাকা ছড়ালে লাখপতি তিরুপতি দর্শন ভালোভাবে হয়। লাইন দিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে কোন রকমে দর্শন সেরে ফেরার পথ ধরলাম। বাসের জন্যেও খাঁচার মধ্যে লাইন দিতে হয়। ভাগে ভাগে আমরা নেমে এলাম। বেলা দুটোর মধ্যে হোটেলে খাওয়া সেরে নিয়ে

বাঙ্গালোর দিকে রওনা হলাম। বিদায়! বালাজী ভেঙ্কটেশ্বর বিদায়। ১৫১ মাইল পথ অতিক্রম করে রাত ৯টায় আমরা বাঙ্গালোর শহরে পৌঁছালাম। সামনে বিরাট দুশ্চিন্তা—পঞ্চাশ জনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা। খাওয়ার ব্যবস্থা যদি বা করা গেল থাকার ব্যবস্থা যে আর হয় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি ও প্রসূন Hotel Tourist ঠিক করলাম বাঙ্গালোরে থাকার জন্য। ব্যবস্থা মোটামুটি। পুরো Hall ঘর দিয়েছেন Hotel Manager, থাকার জন্য। রাতে দিন পঞ্জিকা লিখতে লিখতে ভাবছি আমরা তিনদিনেই দক্ষিণ ভারতের তিনটি প্রদেশের ওপর দিয়ে চলে এলাম, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশুর। রাতের মত বিশ্রাম। কর্ণাটকের রাজধানী বাঙ্গালোর।

১৪ই জানুয়ারী '৭৪—হোটেলে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাঙ্গালোর শহর দেখতে। সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। Planned City বলতে যা বোঝায়। মনে একবার কলকাতা শহরের ছবিটা ভেসে উঠ্‌লো। যাইহোক আমরা বুলটেম্পল লালবাগ, হাইকোর্ট, সিটি পার্ক ও লেক দেখে দুপুর বেলায় হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলেই খেতে হল। আমাদের সংগে ঠাকুর চাকর আছে বটে কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার রান্নার অনুমতি দিলেন না। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম। আমি ও প্রসূন বসলাম বাসের সারথি কৃষ্ণানকে নিয়ে, পরের ভ্রমণের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি কিভাবে সাজানো যায়।

১৫ই জানুয়ারী '৭৪—জনগণ জাগার আগেই ছিয়াশী মাইল দূর মহীশুরের দিকে যাত্রা করলাম। পথে পড়লো শ্রীরঙ্গপত্তম। শ্রীরঙ্গপত্তম টিপু সুলতানের রাজধানী, প্রথমে টিপুর কয়েদখানা দেখতে গেলাম। ইংরেজদের সংগে ন' বার যুদ্ধ করেন ও প্রতিবারই ইংরেজদের হটিয়ে দেন। কিন্তু আমাদের দেশে মীরজাফরের অভাব নেই, তাই কোন এক মীরজাফরের কৃপায় মাত্র ছ মিনিটের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। শ্রীরঙ্গপত্তম মন্দির বিষ্ণুর মন্দির দর্শন করি। টিপু সুলতানের 'সামার প্যালেস ও পরে টিপু ও হায়দার আলীর অসম্পূর্ণ সমাধিস্থল দেখতে যাই। ইরাণ থেকে আনা কালো কষ্টি পাথরের স্তম্ভগুলি অপূর্ব্ব। প্রায় সাড়ে এগারটায় মহীশুর শহরের শ্রীরামপেট রাজা বাহাদুর চোল্‌ট্রিতে (ধর্মশালা) এসে উঠলাম। হোটেলে আহারাদি সেরে নিয়ে Jagmohan Art Gallery দেখতে ঢুকলাম। ছবিগুলি অপূর্ব। বেশীর ভাগ ছবিই ইংরেজদের সংগে টিপুর যুদ্ধের ও টিপুর যুদ্ধে পরাজয়ের ছবিও রয়েছে। গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও দেখলাম। জাহঙ্গীরের আর্ট গ্যালারীও সুন্দর। সেখান থেকে মাইশোর State Emporiumএ গেলাম। অনেকেই বাজার করলেন মহীশুরের তৈরী জিনিষ। পরে আমরা বৃন্দাবন গার্ডেন দেখতে গেলাম, তখন বিকাল পাঁচটা। প্ল্যান করে সাজিয়ে ফুল ও গাছের সমারোহ, ফোয়ারা ও লেক দিয়ে আরও সুন্দর করে তোলা হয়েছে। রাতে বিজলী বাতির রং বেরংয়ের রোশনাই, ক্ষণিকের জন্য মনে হয় যেন কোন স্বপ্নালোকে এসে পৌঁছুলাম। রাত আটটায় ফিরে এলাম চোলট্রিতে।

১৬ই জানুয়ারী '৭৪—ভোর পাঁচটায় একশ মাইল দূরে উটির দিকে রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার

পর বাস আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। পথে মধুমালাই ও বন্দিপুর দুটো সংরক্ষিত জঙ্গল ফেলে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত উঠকামণ্ড পৌঁছালাম, বেলা এগারটায়। বাস মাঝে মাঝে বেশ বিগড়তে লাগল, আর আমাদের চিন্তা বাড়তে লাগল। উটির ব্যোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে গেলাম প্রথম। গার্ডেনের ওপর লুপ্তপ্রায় টোডা পরিবার দেখলাম। সেখান থেকে উটি লেক ও বাজার দেখে ফেরার পথ ধরলাম। রাত ন'টায় আবার চোলট্রিতে ফিরে এলাম।

১৭ই জানুয়ারী '৭৪—সকাল বেলায় সকলে চামুণ্ডা হিলস্ দেখতে গেল। পাহাড়ের মাথায় মন্দির ভিতরে দুর্গামূর্ত্তি। সোনা, হীরা মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো। জাগ্রত দেবতা। আজই আমরা মহীশুর শহরকে বিদায় জানাব। খাওয়া দাওয়া সেরে বাসের ওপর মালতোলা শুরু করলাম। মহীশুরকে বিদায় জানিয়ে আমরা বেলা একটার সময় ছাপ্পান্ন মাইল দূরে শ্রাবণবেলগোলার দিকে ছুটলাম। পথে সাঁইবাবার আশ্রম দেখে প্রায় সাড়ে চারটায় আমরা পৌঁছালাম শ্রাবণবেল গোলায়। প্রায় ছ'শ সিঁড়ি ভেঙ্গে দিগম্বর জৈনদের পূজারী গোমতেশ্বরের পদতলে এসে দাঁড়ালাম। ৫৭ ফুট লম্বা বিরাট মূর্ত্তি। মাথার উপরটা খোলা। একটা পাথর কেটে মূর্ত্তি ও মন্দির। মন্দিরে ঢোকার মুখে দুটো মূর্ত্তিও রয়েছে। উল্টোদিকে আর একটা পাহাড়ের ওপর বিষ্ণু মন্দির। নীচে চারিদিকে ঘেরা পুকুর। সব দেখে চা খেয়ে বেলুরের দিকে রওনা হলাম। বেলুর এখান থেকে ৬৩ মাইল। মাঝে মাঝারী গোছের শহর হাসান। সন্ধ্যা সাতটায় বেলুর পৌঁছালাম। ছোট একটাই চোলট্রি।

১৮ই জানুয়ারী '৭৪—ঘুম ভেঙ্গেই ছুটলাম এগার মাইল দূরে হলাশ্বর রাজাদের কীর্ত্তি হালেবিডের মন্দির দেখতে। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। বিশেষ করে কালো পাথরের মসৃণ স্তম্ভগুলি যেন আধুনিককালের লেদ মেশিনে তৈরী। আমরা গণেশ মূর্ত্তি, নন্দীমূর্ত্তি দেখে ফিরে এলাম বেলুরে। বেলুরের মন্দিরও অপূর্ব্ব। বাইরে ও ভিতরের কাজ দেখে সত্যই মোহিত হতে হয়। শুধু চোখেই দেখা হ'ল, মন ভরল না। সময় বড় অল্প। আজ এখনই বেলুর ছাড়তে হবে। অন্ততঃ দুটো দিন পেলে তবেই দেখা সার্থক হত। বেলা একটায় যোগ্ ফলসে যাত্রা করলুম—দূরত্ব ১৪৯ মাইল। রাত আটটায় যোগ্ ফলস্ ইয়ুথ হোষ্টেলে হাজির হলাম। আজকের মত বিশ্রাম।

১৯শে জানুয়ারী '৭৪ – যোগ্ ফলস্ দেখে ও false খেয়ে আমরা আজ প্রায় ১৯০ মাইল দূরে গোয়ার দিকে রওনা হলাম। মাঝে 'সিরসিতে' ব্রেক ফাষ্ট করলাম বটে কিন্তু বাস বেঁকে বস্ল। সেও বোধ হয় আমাদের মত বিশ্রাম চায়। রোজ ভোর বেলায় উঠে দৌড়তে নারাজ। যাইহোক কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বাস চলতে শুরু করল। মাঝে DRY LUNCH সেরে নিলাম। রাত আটটায় আমরা Pondaতে এসে পৌঁছালাম। এখান থেকে পানাজী ২৭ মাইল। Pondaতেই রামনাথ মন্দিরের ধর্ম্মশালায় থাকার ব্যবস্থা করলাম। সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ধর্মশালা। উপায় না থাকায় হোটেলের অখাদ্য খাবার খেয়ে রাতের মত বিশ্রাম নিতে গেলাম।

২০শে জানুয়ারী '৭৭—সকাল থেকেই সদস্যদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেছে। আজই আমরা বহু আকাঙ্খিত গোয়ার রাজধানী পানাজী দেখতে যাবো। সকাল ন'টায় Shree Mangesh Templeএ এলাম। পরে St. Xaviers গির্জায় হাজির হলাম। বহু প্রাচীন গির্জা। ভিতর যেমন জমকালো তেমনি সাজানো গোছানো। বাহিরে থেকে বোঝা যায় না। প্রতি বারো বছর অন্তর ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত BOM JESUS CHRISTএর দেহ কফিন থেকে বার করা হয়। বেলা প্রায় এগারটায় আমরা পান্‌জিম বা পানাজী এসে হাজির হলাম। পানাজী গোয়ার রাজধানী। প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ গোয়া। Dona-Paula, Gasper বা Mermara Sea Beach ও গোয়ার অন্যান্য দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখে "হোটেল কাপুসিনায়" ঢুকলাম। গোয়ানজী রান্না ভালো লাগলো না। বিশেষ করে নারকেল তেলের জন্য। তাই খেতে হলো। খেয়েদেয়ে Vascoর দিকে রওনা হলাম। বোটে চেপে বাস ও আমরা জোয়ারী নদী পার হলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেভরা Vasco শহর। বাস মাঝে মাঝে থামে আর শুরু হয় ছবি তোলার পালা। Vasco বন্দরে হাজির। অনুমতি ছাড়া ঢুকতে দেবে না। তাই Kolva Beachএর দিকে ছুটলাম। সুন্দর বীচ। ভেলভেটের মত গুঁড়ো কালি। জেলেরা মাছ ধরছে আর হিপিহিপিনিরা স্নান করছে। সী-বীচে দাঁড়িয়ে সাড়ে ছ'টায় সুর্য্যাস্ত দেখলাম। মারগাঁওতে চা খেতে থামলাম। এটাও গোয়ার আর এক শহর। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাত সাড়ে ৮টায় ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

২১শে জানুয়ারী '৭৪—"Go as you like in GOA"—সকালের চা পান সেরে Sant Durga Temple দেখে এলো সবাই। আহারাদি সেরে বাস আমাদের পানাজিতে ছেড়ে দিয়ে এলো। মেয়েরা গেল বাজার করতে। কেউ গেল St. Radium Church দেখতে। Golden Bell এর মিষ্টি আওয়াজ থেকে Church এর নামকরণ। অনেকে গেল মাপুসা শহর ও Calangate Beach দেখতে। এই বীচএ হিপি হিপিনীদের আড্ডা। শহর থেকে কিছু দূরে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া যুক্তিসংগত নয় বলে আমরা গেলাম না। রাত আটটায় Pondaর রামনাথ ধর্মশালায় ফিরে এলাম। গোয়ায় অন্তিম শেষ রজনী।

২২শে জানুয়ারী '৭৪—অন্ধকারের মধ্যে গোয়াকে বিদায় জানিয়ে ১৭১ মাইল দূরে বাদামীর দিকে রওনা হলাম। সংগে Dry Meal নিয়েছি। বিকাল ৪টায় বাদামী পৌঁছালাম। বাসের Tyre leak আমাদের মাথায় হাত। বাদামীর গুহা মন্দির দেখতে গেলাম। সংগে গাইড। বাদামী দেখে Aiholeতে রাতে থাকার ব্যবস্থা হল। মাঝে পাথারডিকল দেখা আর হয়ে উঠল না। কি করব, বাস যে বিগড়েছে। রাতে Aiholeতে মহীশুর স্টেট বাংলোয় বিশ্রাম। এখানকার সব ব্যবস্থাই ভাল, কিন্তু নেই শুধু জল। দু ফার্লং দূরে একটা নালা থেকে পানীয় জল আনতে হয়।

২৩শে জানুয়ারী '৭৪—Aihole দেখতে গেলাম ভোর বেলায়। মাটি খুঁড়ে বার করেছে এই পুরাতন

কীর্ত্তি। Aiholeর ভাস্কর্য্যও সকলকে আকৃষ্ট করলো। সময় অল্প বেশীক্ষণ দেখা যাবে না তাই তাড়াতাড়ি দেখা সেরে বেলা এগারটায় ৯০ মাইল দূরে Hospetএর দিকে রওনা হলাম। উদ্দেশ্য বিজয়নগরের ধ্বংস স্তূপ দেখা। বেলা ৩টায় Hospet ও ৪টায় Hampi এলাম। গাইড জোগাড করে বাস ছুটলো ধ্বংসস্তূপ দেখাতে। আড়াই তিন ঘন্টার মধ্যে বিজয়নগর দেখা সম্ভব নয়, অন্ততঃ একটা দিন দরকার দেখার জন্য। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বসে দরাজ গলায় রবীন্দ্র সংগীত ধরলেন আমাদেরই সহযাত্রীরা। রাতের খাওয়া সেরে সকলে বাসে গিয়ে বসলাম। বাস ছাড়লো রাত ৯টায়, সারা রাত ছুটে ২৩১ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদ যাবে।

২৪শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনের কাছে মিউনিসিপ্যাল চোলট্রিতে আশ্রয় নিলাম। ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদ থাকার কথা। তাই রেলের টিকিটের জন্য ছুটলাম ষ্টেশনে। ১লা তারিখের আগে কোন রিজার্ভেশন নেই। আমি ও প্রসূন ছুটলাম সেকেন্দ্রাবাদের রেলওয়ে অফিসে। কোন এক সহৃদয় প্রবাসী বাঙ্গালীর দয়ায় আমরা ২৪ তারিখেই একটা কোচ্ এর অর্দ্ধেক Reserve করতে পারি কেন না ২৪শের কোচ যদি না নিই তবে ১লা/২রা ফেব্রুয়ারীর আগে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কোচ্ Reserve করে ফিরে এলাম চোলট্রিতে। বাস দাঁড়িয়ে আছে, আজই সালারজং মিউজিয়াম, গোলকুণ্ডা ফোর্ট, নিজাম প্যালেস, চারমিনার দেখে ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। অনেকেই অসন্তুষ্ট হলেন। একদিনে হায়দ্রাবাদ দেখা হয় না জানি কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করারও উপায় ছিল না। রাত ৯-৩০ মিঃ মালপত্তর নিয়ে হায়দ্রাবাদ একসপ্রেসে উঠে এসলাম কলকাতা অভিমুখে। Waltairএ পৌঁছে আবার অনিশ্চয়তা, গাড়ী আর যাবে না, কারণ ধর্মঘট। একমাত্র মাদ্রাজ হাওড়া মেল ও মাদ্রাজ টাটা এক্সপ্রেস যাবে। ছুটলাম সকলে ষ্টেশন Superintendent এর কাছে বোঝালাম পুরো বগিটাই আমরা Reserve করেছি, আর তাড়াতাড়ি আমাদের একটা ব্যবস্থা করুন। বিচক্ষণ লোক আশ্বাস দিলেন কাল ১২টার মাদ্রাজ টাটা এক্সপ্রেসের সংগে আপনাদের বগি লাগানো হবে; আমরা তাতেই রাজী। টাটা পর্য্যন্ততো যাওয়া যাবে। পরের দিন ৯টা নাগাদ টাটায় পৌঁছালাম। বেলা দেড়টায় হাওড়া যাওয়ার গাড়ী। টাটা ষ্টেশনে স্নান ও খাওয়া সারলাম। সন্ধ্যে ৬টায় খড়্গপুর ও রাত ৯টায় হাওড়া পৌঁছালাম। এই ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী সদস্য ছিলেন ২২ জন ও অতিথি সদস্য ছিলেন ২৪ জন। মাথাপিছু খরচ ধার্য্য ছিল ৪২৫ টাকা ও অতিথি সদস্যদের জন্য ৪৩০ টাকা।
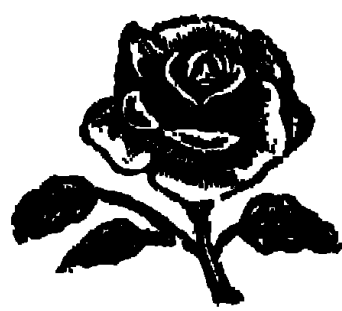
আপনার
ত্বকের
নিরাপত্তার
জন্য...
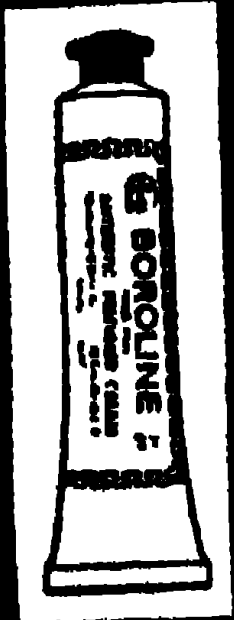
WE HOPE THIS CHILD ISN'T YOURS..